বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব সংখ্যা

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল – জুন ২০১০

প্রকাশকাল
২০ মে ২০১০

সম্পাদক
শওকত হোসেন

নির্বাহী সম্পাদক
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
বাড়ি ৩/সি, রাস্তা ১৩/২, জিগাতলা
পশ্চিম ধানমণ্ডি, ৩য় তলা, ঢাকা ১২০৯
মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫, ০১৭২০৫৮৭৭২৭
ই-মেইল: halkhata1971@gmail.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

পত্রিকার নামলিপি
রবিন আহসান

প্রচ্ছদ
শিল্পী:সুব্রত চৌধুরীর অংকন অবলম্বনে

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৬ $ ডলার

সম্পাদকীয়: এক

হাজার কোটি বছর সময় লেগেছিল উত্তপ্ত পৃথিবীর উপরিভাগ শীতল হয়ে প্রথমে প্রাণীর এবং তারও বহু পরে মানুষের বাসের উপযোগী হতে। মানুষের বসবাসের একমাত্র উপযোগী সেই পৃথিবীর নিজস্ব স্বভাবের প্রতি মানুষের যে নির্মম অত্যাচার চলছে, এই অত্যাচার সহ্য করতে করতে এখন তা সুদ-আসলে ফিরিয়ে দিতে শুরু করেছে প্রকৃতি।

আগামী ৪০/৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় ১৮ শতাংশ এলাকা সমুদ্রের নিচে চলে যাবে; প্রায় দু'কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তু হবে এবং জীবিকা হারাবে আরও চার কোটি মানুষ। উন্নত দেশগুলোর আকাশছোঁয়া উচ্চাভিলাষী অর্থনীতির বলি হচ্ছে আমাদের দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষ। এই হতদরিদ্র দেশের অনেক মানুষই জানে না এই দুর্ভাগ্যের জন্য তারা নিজেরা দায়ী নয়; দায়ী যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাতাশটি দেশ, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত এবং মধ্যপ্রাচ্যের কিছু ধনী দেশ।

যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ২৭টি দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ধনী দেশ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভোগবাদী দেশ হিসেবে চিহ্নিত; এই সব দেশের মোট জনগণের একটি বড় অংশ এতটাই ভোগবাদী জীবন-যাপন করে যা কল্পনা করলেও আমাদের স্তম্ভিত হতে হয়; বল্গাহীন সেই ভোগের রাশি রাশি পণ্যের যোগান দিতে গিয়েই অসংখ্য বাড়তি কারখানা ও শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করতে হয়েছে। ফলে সেই সব দেশে নিঃসরিত হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস বা কার্বন গ্যাস। "২০০৬ সালে মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন (টনের হিসেবে) যুক্তরাষ্ট্র ১৮.৬৭%, কানাডা ১৭.৪৪%, অস্ট্রেলিয়া ১৮.৭৪%, রাশিয়া ১১.০৩%, জাপান ১০.১৪%, বৃটেন ৯.৪%, জার্মানি ৯.৮২%, নেদারল্যান্ড ৯.৭%, ইতালি ৮.১%, ফ্রান্স ৬.২%, এবং ভারত ১.৩% যদিও বাংলাদেশ সেখানে কার্বন গ্যাস নিঃসরণ করে মাত্র ০.২৫%।"

তাপমাত্রা বৃদ্ধিকারী গ্রিনহাউস গ্যাস এভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মেরু অঞ্চলের বিশাল তুষার খণ্ডগুলো অতি মাত্রায় গলে যাচ্ছে। এতে করে সমুদ্রের পানির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। ফলে পৃথিবীর অনেক দেশের মতো বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ প্লাবিত হয়ে লবনাক্ত পানি দেশের ফসলি জমি ও নদ-নদীর পানি লবনাক্ত করে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনছে। অথচ অতি কার্বন নিঃসরণকারী দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা ভোট তথা ক্ষমতা হারাবার ভয়ে মিটিগেশনের শর্ত কোনো দিনও মেনে নেবে না এটা সহজেই অনুমান করা যায়। মিটিগেশন হল গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসের আর্ন্তজাতিক প্রচেষ্টার একটি ধাপ।

কাজেই জলবায়ু নিয়ে কোপেনহেগেনের মতো সম্মেলন হয়তো ভবিষ্যতে আরো হবে কিন্তু কাজের কাজ আদৌ হবে কিনা তাতে সন্দেহ আছে। কেননা এই

সম্মেলনটি ছিল একটি 'মৌখিক সমঝোতা' মাত্র। এখানে মানবজাতির জন্য কল্যাণকর কোনো কার্যকর চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। অথচ জলবায়ু বিপর্যয় এমনই ভয়াবহ একটি বিষয় যার ফলে একটি দুটি অঞ্চল বা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, এটা পুরো পৃথিবী এবং তার সমগ্র মানুষকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু পুঁজিতন্ত্র মানুষকে শেষ পর্যন্ত মুনাফা ও লাভালাভের বাইরে কিছুই শেখায় না; শুধু শেখায় ভোগবাদী হতে ।

এই তন্ত্র থেকে পৃথিবী কি বেরিয়ে আসতে পারবে; এটি পৃথিবীর সামনে জগদ্দল পাথরের ন্যায় এক দার্শনিক প্রশ্ন... ।

শরমিন নিশাত
নির্বাহী সম্পাদক
১৫.০৫.২০১০

সম্পাদকীয়ঃ দুই

সভ্যতার বহু সহস্র বছর পর হলেও মানুষ জলবায়ু বিষয়ে বিশেষজ্ঞান অর্জন করেছে; মানুষ বুঝতে সক্ষম হয়েছে জলবায়ুর ওপর মানুষর হাত রয়েছে; একে মানুষের বেঁচে থাকার উপযোগী করে রাখা না-রাখা অনেকটা মানুষর ওপর নির্ভরশীল। এই বোধ তিনশ বা দু'শ বছর আগেও মানুষের মধ্যে ছিল না। এই অর্জন তার অভিজ্ঞতাবশত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পরিক্রমার একটি ছোট্ট পর্ব ছিল রুশ বিপ্লব এবং সমাজতন্ত্রের জন্য প্রচেষ্টা। সেই পর্বের অবসান হয়ে আওয়াজ উঠেছিল, "সবই ভুল ছিল, লেনিন ভুল ছিল, স্ট্যালিন ভুল ছিল, তত্ত্ব ভুল ছিল।" "পুঁজিবাদই উন্নত পর্যায়ে গিয়ে জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থায় পরিণত হবে।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর আজ প্রায় সতের বছর হতে চলল। আমরা দেখলাম যে-অজুহাত দেখিয়ে আওয়াজ উঠেছিল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিরুদ্ধে তার ঠিক উল্টোটা এখন ঘটছে; সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, যুদ্ধ, হামলা, সন্ত্রাস, শোষণ, লুণ্ঠন আজ বিশ্বকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। বিশ্ব আজ বৈষম্যের চূড়ান্ত পর্ব অতিক্রম করছে; "গত তিন দশকে ধনীতম ২০ শতাংশ মানুষের সঙ্গে দরিদ্রতম ২০ শতাংশ মানুষের আয়-অংশের অনুপাত ৩০ : ১ থেকে বেড়ে ৬১ : ১-এ এসে দাঁড়িয়েছে– যা ৩০ গুণ থেকে ৬১ গুণ বেশি। বিশ্ব আয়ের ৮৩ শতাংশই যায় ধনীতম ২০ শতাংশ মানুষের কাছে; মাত্র ১ শতাংশ পায় দরিদ্রতম ২০ শতাংশ মানুষ"; এই ২০ শতাংশ মানুষই অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক অধিকার, বিবেকের স্বাধীনতা

এমনকি প্রকৃতি ও পরিবেশ তথা জলবায়ুকে এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

দুই.

পৃথিবীর সকল কারখানা, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র ও গাড়ির ধোঁয়ার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোস অক্সাইড ইত্যাদি ক্ষতিকর গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বেড়ে যাচ্ছে। এই কারণে গত একশ বছরে বাতাসের উষ্ণতা এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে। এই ক্ষতিকর গ্যাস বাতাসে এভাবে বাড়তে থাকলে আগামী একশ বছরে বাতাসের উষ্ণতা পাঁচ-ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। বাতাসের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় বাতাসের গতিপথ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও গতিপথ এবং সমুদ্রস্রোতের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে যখন যেখানে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কথা তখন সেখানে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে না; বৃষ্টিপাত হচ্ছে না; সমুদ্র-স্রোত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হচ্ছে না; ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। এতে কৃষিব্যবস্থা ও স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় উত্তর গোলার্ধ, দক্ষিণ গোলার্ধ এবং অন্যান্য আইসলান্ডের বরফ অধিক পরিমাণে গলছে; বরফ-গলা এই পানি সমুদ্রে জমা হওয়ায় সমুদ্রে পানির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে; অন্যদিকে অধিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্রে পানির আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় পানি ফুলে উঠছে। এই সব কারণে সারা পৃথিবীই আজ হুমকির সম্মুখীন তবে বিশেষ করে উপকূলবর্তী দেশগুলোতে প্লাবন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, লবনাক্ততা ইত্যাদি ভীষণভাবে বেড়ে গেছে; এই সমস্যা সারা পৃথিবীরই সমস্যা; তা সত্ত্বেও বাংলাদেশ উপকূলবর্তী বলে প্রকৃতি-নির্ভর কৃষিপ্রধান এই দেশটির ক্ষতির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি।

তিন.

বিশ্বজলবায়ু সমস্যা যেমন প্রকট হচ্ছে, মানুষও এর সমাধানের পথ হন্যে হয়ে খুঁজছে। কিন্তু বিশ্ব যে রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে, সেটিই কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামন্ততন্ত্র মানুষকে দাস বানিয়েছিল; পুঁজিতন্ত্র বানিয়েছে বেহায়া ও ডাকাত। এই দুঃস্বভাব ব্যক্তিগত থেকে শুরু হয়ে দলীয়, রাষ্টীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। মাত্র ৩৪/৩৫টি দেশ এবং পুরো পৃথিবীর মাত্র ২০% মানুষের বেহায়াপনা, চুরি ও ডাকাতি এবং তাদের বল্গাহীন বন্য ভোগবাদিতার কারণে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ এভাবে বাড়ছে। দার্শনিক সমস্যাটি হল, পুঁজিতন্ত্রের ভেতরে কোথাও এই সমস্যা সমাধানের কোনো উপায় নেই; এই মানব-ধ্বংসী তন্ত্র পৃথিবীর হাতেগোণা কয়েকটি দেশ ও তাদের জনগণকে বলতে পারবে না, তোমাদের ভোগের মাত্রা কমাও; সেটা জনগণকে বলা হলেও তাদের জনগণ নিশ্চয়ই সে-কথা শুনবে না।

সুতরাং বিশ্বমন্দা কিংবা গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি– এই ধরনের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে মানুষের সামনে সামন্ততন্ত্র বা পুঁজিতন্ত্রের বাইরের ভিন্ন কোনো তন্ত্রের দিকে অর্থাৎ পুনরায় সমাজতন্ত্রের দিকেই পৃথিবীকে অগ্রসর হতে হবে। তারপরও পুঁজিবাদী বিশ্বের কিছু সংখ্যক মানবতাবাদী মানুষ চেষ্টা করে যাচ্ছে এই সমস্যার সমাধান করতে; এই চেষ্টার আওতায় সম্মেলনের পর সম্মেলন হচ্ছে। সেই সব সম্মেলনে উঠে এসেছে বিভিন্ন প্রসঙ্গ; সেই প্রসঙ্গগুলোর মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য ধাপ হল "মিটিগেশন" ও "অ্যাডাপটেশন"।

চার. মিটিগেশন

১৯৯৩ সালে পৃথিবীর উন্নত ৩৭টি দেশ একসঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, তারাই সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। সে-কারণে এই গ্যাস হ্রাস করার ক্ষেত্রে তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রে তারা একমতও হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই গ্যাস তারা কমাবে; ড. আইনুন নিশাত-এর মতে, "উন্নত প্রতিটি দেশকে নিয়ে যে-পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার সমঝোতা হয়েছে সেই নির্ধারিত পরিমাণের মধ্যে উন্নত ঐ দেশ নিজে কিছু কমাবে এবং যে-অংশটুকু তারা কমাতে পারবে না, সেই অংশটুকু অনুন্নত দেশ কমাবে; অনুন্নত দেশে গ্রিন-হাউস গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে যে খরচটা হবে সেটা ঐ উন্নত দেশ দিয়ে দেবে।" গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর এই কৌশলকেই বলা হচ্ছে মিটিগেশন।

পাঁচ. অ্যাডাপটেশন

গ্রিনহাউস গ্যাসের অতি নিঃসরণের কারণে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হয়ে যাওয়ায় যে প্রতিকূলতাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে, সেই প্রতিকূলতাকে কখনো মোকাবেলা করে কখনো সমন্বিতভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করাই হল অ্যাডাপটেশন। ড. নিশাত-এর মতে, "তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি যেমন অতি গরমে কৃষিক্ষেত্র ব্যাহত হওয়া, বন্যা, খরা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, রোগ-বালাই বেড়ে যাওয়া– এ সমস্ত কারণে আমাদের ধানের ফলন কমে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে অতি তাপমাত্রা, খরা, বন্যা, রোগবালাইর কিংবা লবণাক্ততা এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের মধ্যেও যে-ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের ফলন স্বাভাবিক থাকবে, সেই-ধরনের ধানের বীজ আবিষ্কার করতে হবে। ...একইভাবে আমাদের কৃষি-পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনতে হবে।

...এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ব্যয় হবে। ...কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোতে এই ব্যয়ের টাকা আসবে কোথা থেকে? অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোকে বলল, এই টাকা তোমাদেরকে দিতে হবে। ...সেই অর্থ উন্নত দেশগুলো দিতে রাজিও হল ...এই যে প্রক্রিয়া এটাই হল অ্যাডাপটেশন।"

ছয়.

পুঁজিতন্ত্রের মধ্য থেকেও উদার মানবতাবাদী যে-উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার লক্ষ্যে, তাতে সবচেয়ে বেশি বাগড়া বাঁধাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র; এরপর বাগড়া বাঁধাচ্ছে চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি ধনী দেশ। যুক্তরাষ্ট্র যে মিটিগেশন-এর শর্ত কোনো দিনই মেনে নেবে না সে-কথা হলফ করেই বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্র যেখানে চায় সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক শুধু তারা বেঁচে থাকুক– সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কেরা কোনোভাবেই তাদের জনগণকে বাধ্য করতে পারবে না গাড়ির ব্যবহার কমাতে, অতিবিলাসী জীবন থেকে নেমে আসতে। অন্যদিকে চীন, ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা মিটিগেশনের আওতায় দরিদ্র দেশগুলোতে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর ব্যয়ভার বহন করতে রাজি নয়। মধ্যপ্রাচ্যের ধনী দেশগুলোও কার্বন নিঃসরণ প্রচেষ্টাতে খুব একটা সাড়া দিচ্ছে না।

সুতরাং জলবায়ু নিয়ে বিশ্বব্যাপী যে জটিলতম সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে, তার সমাধানের পথ মোটেও সহজ বা সরল নয়; তারপরও আশার কথা মানুষ থেমে নেই; চেষ্টা চলছে...

শওকত হোসেন
সম্পাদক
২০.০৫.২০১০

সূচি

বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যার প্রতিক্রিয়া
বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রয়াস
প্রশান্ত মৃধা ১০
হালখাতায় বাংলাদেশের উপন্যাস
হাসান অরিন্দম ১৪
উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যায় যে ঘাটতি রয়েছে
মাসুদ রানা ১৭

প্রবন্ধ
জলবায়ু পরিবর্তন : একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা
শেখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯

প্রবন্ধ
জলবায়ুর পরিবর্তন বা দুনিয়া গরম হয়ে যাবার রাজনীতি
ফরহাদ মজহার ৪৭

সাক্ষাৎকার
বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়: মোকাবেলা সহজ নয় তবে অসম্ভবও নয়
আইনুন নিশাত ৫৬

প্রবন্ধ
টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট
কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ৮০
জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশ: আমাদের করণীয়
আতিক রহমান ৯৭
জলবায়ু বিপর্যয়: অভ্যন্তরীণ করণীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
মো. আব্দুল মতিন ১০২

প্রবন্ধ
জলবায়ু পরিবর্তন: গরম আলোচনার পেছনের কথা
ফরীদা আক্তার ১১১

প্রবন্ধ
জলবায়ু পরিবর্তন : একটি মার্কসীয় অনুসন্ধান
নুর মোহাম্মদ ১২৮
জলবায়ু পরিবর্তন: ঝুঁকি এবং ভাঁওতা
ম. ইনামুল হক ১৪৭
জলবায়ু, পুঁজিবাদ: প্রকৃতি ও মানুষের মুক্তির শর্ত একাকার
ফারুক ওয়াসিফ ১৫২

প্রবন্ধ
জলবায়ু পরিবর্তন: জনমত কোন দিকে?
মো. আব্দুল আউয়াল ১৬৭
জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশে এর প্রভাব, প্রস্তুতি ও করণীয়
মো. জয়নাল আবেদীন ১৭১
জলবায়ু সমস্যা ও তার সমাধান
শাহআলম সারওয়ার ১৮০
জলবায়ু পরিবর্তন: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
ফেরদৌসী সুলতানা ১৮৩
জলবায়ু পরিবর্তন : পৃথিবীর ধ্বংস কি অনিবার্য?
আদিত্য চৌধুরী ১৯৩

প্রবন্ধ
বিশ্ব-আবহাওয়া বনাম বাংলাদেশ পরিবেশ
এবি এম মূসা ১৯৬
হারালো কোথায় সেই চেনা পৃথিবী!
আবেদ খান ২০০
জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বুঝছি
মুহাম্মদ ইব্রাহীম ২০৩

জলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশ
মি জা নু র র হ মা ন ২০৬
জলবায়ু-বিপর্যয় মোকাবেলা: বিরোধের মূলে বাণিজ্যস্বার্থ
হো মা য় রা আ হ্ মে দ ২০৯

সাক্ষাৎকার
জলবায়ুর অতি প্রচার দারিদ্র্যের মূলপ্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছে
আ বু ল বা র কা ত ২১২

প্রবন্ধ
পরিবর্তিত পৃথিবী বিপর্যস্ত কৃষি
শা ই খ সি রা জ ২২০
মানুষ কাজ হারাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে জলবায়ু-উদ্বাস্তু
শা র মি ন্দ নি লো র্মি ২২৬
জলবায়ু-ঝুঁকি: মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি
ধ রি ত্রী স র কা র স বু জ ২৩২
জলবায়ু পরিবর্তন: বিপর্যয়ের সরল পাঠ
আ শ রা ফ সি কা ন্দা র মো হ ২৩৫
বিশ্বজলবায়ুর পরিবর্তন: বিপর্যয়ের মুখে কৃষিব্যবস্থা
নূ রু র র হ মা ন ২৩৮

বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রয়াস

প্রশান্ত মৃধা

বাংলাদেশে কোনও-একটি সাময়িকপত্রের নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক প্রকাশ করা বেশ কষ্টকর বটে! এতটাই কষ্টকর যে, এ বিষয়ে কোনও সংখ্যা যিনি কখনও বের করেননি, তিনি যদি একটি সংখ্যার পরিকল্পনা করে কাজে নামার কথা শুধু চিন্তা করেন, তাহলেই বুঝে নিতে পারবেন কতটুকু জলে তিনি নেমেছেন আর কতটুকু ভিজেছে এবং তারপরও গোটা বিষয়ে কোনও কিছুই প্রায় বাগে আনতে পারছেন না। এর প্রধান কারণ, শুধু প্রধান নয়, বলা যায়, প্রায় একমাত্র কারণ ওই নির্দিষ্ট বিষয়ের লেখকের অভাব। এতটাই অভাব, কখনও কখনও কোনও-কোনও বিষয়ে এমন সংখ্যা করার কথা সম্পাদক প্রায় চিন্তাই করতে পারেন না। এই অভাব শুধু কোনও একটি সাময়িকপত্রের একটি সংখ্যার প্রয়োজনে চিন্তাশূন্যতার অভাব নয়, জাতীয় 'অতি' গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও আমাদের চিন্তা ও চর্চার দৈন্যও তো প্রতি মুহূর্তে খুব ধরা পড়ে। এই বিবেচনা মাথায় রেখে, *হালখাতার* ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১০) 'বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যা' সাহসী উদ্যোগ। সাহসী এই জন্যে, এমনিতে মনে হতে পারে, বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত থিসিসের তো অভাব নেই, দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পর্যায়ে বাংলাদেশের উপন্যাস সম্পর্কে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠদান করানো হয় বহুদিন; ফলে, একজন সম্পাদক এমন একটি উদ্যোগ নিলে সেখানে পৃষ্ঠা ভরানোর মানুষজনের খুব অভাব হওয়ার তো কথা নয়। কিন্তু, মূল সমস্যাটা সেখানেই। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীর নোটমাফিক পাঠদান আর একটা বিষয়কে আগাপাশতলা মাথায় রেখে একটি প্রবন্ধ দাঁড় করানোর মতন মানুষের অভাব এদেশে খুব। আর, তারপর যদি দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আলোচনার এমন এক গঁৎ চিন্তায় হাজির থাকে, যেখানে উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা মানে একজন একজন করে লেখক ধরলাম আর তাঁর উপন্যাস সম্পর্কে দুটো-একটা মন্তব্য দিয়ে একটি প্রবন্ধ দাঁড় করিয়ে ফেললাম– তাহলে তো সমস্যা আরও চূড়ান্ত আকার ধারণ করে। আমরা মানি আর না মানি, সেই সমস্যা তো ইতিমধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন সম্পাদক নিজের ইচ্ছা আর আকাঙ্ক্ষার পরিণততম

মূল্য দিতে চাইলে, এই সমস্যা থেকে খুব যে বাইরে যেতে পারেন, তা পেরে যান তা-ও হয়তো সব সময় নয়। *হালখাতা* গঁতের বাইরে যেতে চেয়েছে। সম্পাদককে ধন্যবাদ।

দুই.

হালখাতার উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধগুলো মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। সেটিকেই সম্পাদক প্রবন্ধ ও বড় প্রবন্ধ এমন বিন্যাসে আলাদা আলাদা করে আট জায়গায় বিভক্ত করেছেন। হয়তো বিষয় ও প্রাসঙ্গিকতার মিলের জন্যে এটি করেছেন। প্রায় একই বিষয়ের উপস্থাপনায় ঘুরে এই জন্যে ধন্দ কাটে না যে, তাহলে পরের বার কি এমন কোনও ইঙ্গিত মাথায় রেখে সাজানো হয়েছে, যে জন্যে দুই ভাগে বিভক্ত, অথবা আরও বেশি। তা ঘটেনি। একবারেই শুরুতে যে তিনটি প্রবন্ধ : সৈয়দ আকরম হোসেনের 'বাংলাদেশের উপন্যাস : চেতনাপ্রবাহ, শিল্পজিজ্ঞাসা ও আঙ্গিক বিবেচনা'; মাসুদুজ্জামানের 'জাতিরাষ্ট্র ও উত্তর উপনিবেশবাদ : বাংলাদেশের উপন্যাসপাঠের ভূমিকা'; আর, হামীম কামরুল হকের 'বাংলাদেশের উপন্যাসের ভাষা : আত্মপরিচয়ের ভাষ্য'– এই সংখ্যার সবচেয়ে মূল্যবান অংশ। মূল্যবান এই জন্যে, এই অংশের ভেতরেই মুখ্যত বাংলাদেশের উপন্যাসের বিভিন্ন প্রকরণ ও রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভাষিক উত্তরণের প্রসঙ্গগুলো আলোচিত হয়েছে। এই ধরনের লেখা আরও যুক্ত করতে পারলে ভালো হত, সম্পাদকের তেমন প্রচেষ্টার নিশ্চিত কমতি ছিল না, কিন্তু এই ধরনের লেখার অভাব খুব। রফিকউল্লাহ খানের 'মুক্তিযুদ্ধোত্তর নবচৈতন্য ও উপন্যাসের শিল্পরীতি' আগের অংশে যেতে পারত, কিন্তু উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস আলাদা একটি অংশ হিসেবে পরিকল্পিত হওয়ায় রিষিণ পরিমলের 'প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস' সঙ্গে রেখেছেন। এই দুই অংশের মাঝখানে আছে, যতীনের সরকারের প্রবন্ধ 'পাকিস্তানোত্তর পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা উপন্যাসের ধারা' আর পরে, বিশ্বজিৎ ঘোষ তাঁর 'বাংলাদেশের উপন্যাস'– এই দীর্ঘ প্রবন্ধে ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের উপন্যাসের পরিচয় তুলে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বাদবাকি লেখাগুলো সবই প্রধান ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসের আলোচনা। যেমন : আহমদ ছফা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী, সত্যেন সেন, জাকির তালুকদার, আবুল ফজল, আবু ইসহাক, শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, আবুবকর সিদ্দিক, সেলিনা হোসেন, শহীদুল জহির, হুমায়ূন আহমেদ, মাহমুদুল হক, রশীদ করিম, আকিমুন রহমান ও নাসরীন জাহানের (লেখকদের নাম উপন্যাস আলোচনার ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে) উপন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে।

তিন.

সাধারণত কোনও-একজন নির্দিষ্ট লেখকের কোনও-প্রকার সাহিত্যকর্মের আলোচনায় দুটো তিনটে বিষয় খুব চোখে পড়ে। তা স্বাভাবিকও। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের

ইতিহাস মোটামুটিভাবে এভাবে সাহিত্য-সমালোচনায় অভ্যস্ত, আর সেই গঁতে চলছেও প্রায় শতাব্দীব্যাপী। লেখার ভালোমন্দ গুণাগুণ নিয়ে বেশি কথা। লেখক কি পেরেছেন কি পারেননি, তা নিয়েও দুই প্রস্থ– কিন্তু ওই রচনার (এখানে উপন্যাসের) সঙ্গে, ওই উপন্যাসের সঙ্গে সমালোচক খুব কম সময়ই এক অভিযাত্রায় হাজির হন। বরং তার লেখায় ইঙ্গিতে অথবা সরসরি বুঝিয়ে দেন, লেখকের আরও এই এই দেখানোর ছিল, এই দেখিয়েছেন, এই বলার ছিল, কী বলেছেন কী বলেননি, অথবা, এই যে গন্তব্য লেখকের, বা যে পথে তিনি হেঁটে গেছেন এই পথে আগে হাঁটেনি কেউ, হাঁটলে মনুষ্যচরিতের এই এই জায়গা তাকিয়ে দেখেনি, দেখলেও এই লেখকের মতো করে দেখেনি। যে কোনও কারণে হোক, শ্রীচন্দ্র দাশ মহাশয় যেভাবে উপন্যাসের বিন্যাস দেখান, সেখান থেকে শ্রেণিকক্ষ তো বেরই হয়নি, কোথাও কোথাও আরও যেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। (পাঠক দেখে নিতে পারেন : ভূমিকা, *পদ্মানদীর মাঝি*, বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড অনুমোদিত কলেজ সংস্করণ।) এই ভূমিকাটি পড়লে মনে হয় যেন, উপন্যাস সেই অন্ধের হাতি দেখা। হাতি কুলার মতো, মূলার মতো, থামের মতো ইত্যাদি। উপন্যাসকে ভাগে আর খাপে মিলতেই হবে। সেই মতো মিলিয়ে দিতে না পারলে কিসের উপন্যাস। আর সেই ভাগগুলো এক-এক কেতায় এক এক রকম। যেমন : ইতিহাসের প্রসঙ্গ থাকলেই ঐতিহাসিক উপন্যাস, নিম্নবর্গের মানুষজন থাকলেই সমাজবাস্তব উপন্যাস, যেন উচ্চবর্গের বা মধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে উপন্যাস কোনও মতেই সামাজিকও নয়, আর তা বাস্তবও নয়। আর সেই উপন্যাসে যদি কোনওপ্রকার গদগদ প্রেম পরিণতিও পায়, তা কোনওক্রমেই প্রেমের উপন্যাস নয়, প্রেমের উপন্যাস হতে হবে অমিত-লাবণ্যের ডায়লগে ভরপুর *শেষের কবিতার* মতো– মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের *পদ্মানদীর মাঝি* কি তারাশঙ্করের *কবি* ওই সংজ্ঞার্থে কোনওক্রমেই জায়গা পাওয়ার যোগ্য নয়। এই তো প্রাতিষ্ঠানিক উপন্যাস আলোচনার প্রায় শুরুর অবস্থা। ইস্কুল ফাইনাল পাশ একটি ছেলে বা মেয়ে ওই পড়ে প্রথম শেখে উপন্যাসের আলোচনা কেমন হতে পারে। এরপর, উত্তর লেখা থেকে শেখে আরও কিছু প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ। সেটি অন্যত্র আলোচনা করা যাবে।

কিন্তু যে উপন্যাসের প্রাতিষ্ঠানিকতায় এমন আলোচনার সূত্রপাত– এর জের কত দূর পর্যন্ত চলে তার একপ্রস্থ নমুনা চাইলেই দেখানো যায়। কখনও কখনও বেশি দূর যাওয়ার দরকারই পড়ে না। কোনও সাহিত্য ও সাময়িকপত্রে একটি উপন্যাসের আলোচনা একটু মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাওয়া যায়। আলোচক ধরেই নেন, উপন্যাস লেখকের এক প্রকল্প (হয়তো সব সময় তা বোঝেনও না), আর তাতে কী-কী তিনি দেখাতে গিয়ে পেরেছেন, আর কী-কী ব্যর্থ হয়েছে– সেই কথা বলেন। কিন্তু উপন্যাসের প্রধান অন্বিষ্ট তো ব্যক্তি। ব্যক্তিকে একটি রাষ্ট্র ও সমাজে যে নিরিখে উপন্যাস দেখেন বা বুঝেন, এবং যেখানে রেখে তা পাঠকের সামনে হাজির করেন, সেই জায়গাগুলোর কাছে আলোচকের আর সব সময় যাওয়া হয়ে উঠে না। এর কারণ, উপন্যাসের উপন্যাস্ত ব্যক্তি ও সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পর্কের সংযোগ তিনি হয় বোঝেন না,

বুঝলে তাকে ওই আলোচিত উপন্যাসের কাঠামোর ভিতরে রেখে সময় সময় আলোচনা করে উঠতে পারেন না। কিন্তু, একটি উপন্যাস পড়তে পড়তে কত কিছু নিয়েই তো একে পাঠ করা যায়। চাইলে একবার একটি উপন্যাসের ভূগোল পড়া যায়, চরিত্র পড়া যায়, কাহিনী পড়া যায়, সময় পড়া যায়, প্রকৃতি পড়া যায়, মানুষে মানুষে আন্তঃসম্পর্ক পড়া যায়– যেভাবেই পড়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকে কেন্দ্রে রেখে আর ব্যক্তি এর প্রধান নিরিখ। অন্তত, ব্যক্তিকে ওই উপন্যাসে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে তার ওপর নির্ভর করছে এর সমস্ত কিছু। যেমন, যদি *চিলেকোঠার সেপাই* বা *জীবন আমার বোন* কি *জননী* কি *জীবন ও রাজনৈতিক*-কে বাস্তবতা মাথায় রাখি, উদাহরণ হিসেবে সামনে আনছি– এইসব উপন্যাসের সময়, কাল, রাজনীতি, মানুষ, মানুষে মানুষে আন্তঃসম্পর্কের যে পাঠ আমরা নিই– আমাদের সামনে আসে, তাকে নির্ণীত করে নিতে হয়, ওই উপন্যাসে প্রধান প্রধান চরিত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত করে আর পাঠক হিসেব যে সময়ে পড়া হচ্ছে– সেই সময়েরও এক টান সেখানে কাজ করে। সৈয়দ আকরম হোসেন, মাসুদুজ্জামান ও হামীম কামরুল হক এঁদের– আলোচনায় বাংলাদেশের উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও চরিত্রের সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষিক যে তৎপরতা আলোচিত হয়েছে, তা বাংলাদেশের উপন্যাস আলোচনায় নতুন চিন্তার সূত্র খুঁজতে সহায়ত করবে। এই লেখার শুরুতেই উল্লিখিত, ওই প্রথম তিনটি লেখার মতো আরও কয়েকটি লেখা থাকলে ভালো হত। হামীম কামরুল হকের একটি বাক্য চিন্তা-জাগানিয়া : প্রতিটি উপন্যাসের ভাষাই আলাদা। অর্থাৎ, যে কটি উপন্যাস সেই ক'টিই উপন্যাসের ভাষা। উপন্যাসের ভাষা প্রশ্নে এ কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আশাকরি, ভবিষ্যতে হামীম এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

হালখাতার এই সংখ্যায় দু-একটি ছোটখাট ত্রুটি আছে। শহীদুল্লা কায়সারের নাম সর্বত্র লেখা লেখা হয়েছে শহীদুল্লাহ কায়সার। আর এক জায়গায় (পৃ. ২৮৩) হাসান আজিজুল হকের *আগুনপাখি* উল্লেখ করা হয়েছে, হাসান হাফিজের 'আগুন পাখি'। হয়তো, সম্পাদকের নজর এড়িয়ে গেছে।

আশা করি, ভবিষ্যতে *হালখাতার* এই প্রকার প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। সম্পাদককে আবারও ধন্যবাদ।

প্রশান্ত মৃধা। সিলেট।
২৪.৫.২০১০

হালখাতায় বাংলাদেশের উপন্যাস

হা সা ন অ রি ন্দ ম

হালখাতা ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যার আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশের উপন্যাস। আমার মতো অন্যান্য পাঠকও হয়তো এ পত্রিকার ক্রমোন্নতি খেয়াল করছেন। এই সংখ্যায় সম্পাদক আলোচকদের আট কাতারে সাজিয়েছেন। উপন্যাসের খ্যাতনামা গবেষক ও আলোচকের পাশাপাশি তরুণ কয়েকজন লেখকও এ কাতারে জায়গা পেয়েছেন। সৈয়দ আকরম হোসেন তাঁর প্রবন্ধে বাঙালি মুসলমানের চেতনাগত সংকট, তার উত্তরণ প্রয়াস উল্লেখ করে বাংলাদেশের উপন্যাসকে কালপর্বে বিন্যাসপূর্বক যে আলোচনা করেন তাতে পাঠক বিষয়টি সম্পর্কে বেশ স্বচ্ছ ধারণাই পেয়ে যায়। প্রাবন্ধিক উপসংহারে এদেশের উপন্যাস বিষয়ে সঙ্গত কারণেই সপ্রশংস হতে পারেননি। এ সাহিত্যধারা প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে না পারার যে কারণ তিনি চিহ্নিত করেন তা-ও যৌক্তিক। তবে জাতশিল্পীর কলম কিন্তু আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও কিন্তু থমকে যায় না। বরং প্রতিকূল বাতাস অনেক সময় ভেতরের সৃষ্টি-আগুনকে উসকে দেয়, আমাদের নজরুল ছাড়াও বিশ্বসাহিত্যে এমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের কিংবা বাংলাদেশের সাহিত্যে তেমনটি ঘটেনি। মাসুদুজ্জামান উপনিবেশবাদ, জাতীয়তাবাদ ও জাতিচেতনার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের উপন্যাস বিচারের প্রয়াস পেয়েছেন। তাত্ত্বিক দিকসহ তিনি প্রথমে দেখিয়েছেন এ ভূখণ্ডের মানুষের ওপর উপনিবেশের প্রভাব। লেখকেরা কীভাবে উত্তর-উপনিবেশবাদী সমাজকে আঁকছেন সে প্রসঙ্গ এসেছে পরবর্তী আলোচনায়। বর্ণনার পঞ্চম পর্বের বিশ্লেষণ আরও খানিকটা বিস্তৃত হতে পারত। এই প্রাবন্ধিকও রচনার শেষ অংশে ঔপন্যাসিকগণের পাঠ, নিষ্ঠা ও শ্রমের ঘাটতির প্রতি ইঙ্গিত করেন।

হামীম কামরুল হক তাঁর লেখার শুরুতেই এদেশি বংশোদ্ভূত বিতর্কিত ভারতীয় হিন্দু লেখকের যে দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন তা কি এদেশের মুসলমানদের নিয়ে না-লেখার যৌক্তিক কারণ হতে পারে? তবে এ বৃত্তান্ত উল্লেখের তাৎপর্য কী? ওপারের বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, সিকদার বাবুদের সকল বক্তব্য নির্বিচারে অকাট্য মেনে কোনো কোনো লেখককে 'লস্ট জেনারেশন'ভুক্ত করায় উন্নাসিক পাণ্ডিত্য থাকতে পারে, সুবিবেচনা নেই। উনিশ শতক থেকে শুরু করে বাংলা গদ্যের একটা ফিরিস্তি দিয়ে প্রাবন্ধিক চার পৃষ্ঠাব্যাপী দৃষ্টান্ত যোগে বাংলাদেশের উপন্যাসের গদ্য বিশ্লেষণ করেন। শ্রমসাধ্য এই রচনা পাঠকের ভাবনায় প্রভাব ফেলতেই পারে। যতীন সরকারের

বিশ্লেষণ গভীর বোধ থেকে উৎসারিত, যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সাথে ভিন্নমত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে। রফিকউল্লাহ খানের রচনায় স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ করা গিয়েছে। রিষিণ পরিমলের গবেষণামূলক প্রবন্ধটি মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস বিষয়ে পাঠককে স্বচ্ছ ধারণা দিতে পেরেছে। অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষের লেখাটি সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী। আহমদ ছফা যে বাঙালির চিত্তে ক্রমেই উদ্ভাসিত হচ্ছেন তা পাঠক হিসেবে আমাদের কাছে আনন্দের। এ পর্যায়ে সলিমুল্লাহ খান মহাশয়-কৃত *গাভী বিত্তান্ত* বিষয়ক বৈঠকি ঢঙের উইটি আলোচনা পাঠকের মনে অপার আনন্দের সঞ্চার করেছে। হয়তো তিনি অগ্রসর মানসিকতার অধিকারী বলে আহমদ ছফার রচনায় ড. মনজুরুলের মতো আক্রান্ত বোধ না করে কিংবা এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার না করে বিরল শ্রেণীর এই বাংলা উপন্যাসটির যথার্থ মূল্যায়নে সচেষ্ট হয়েছেন। ছোটগল্পের মতো ইলিয়াস-বিশ্লেষণেও মামুন হুসাইন ব্যবহার করেছেন গদ্যের নিজস্ব ঢঙ। পারসোনাল এসের কায়দায় তাঁর উপস্থাপন শৈলী একটু বাড়তি মনোযোগ দাবি করলেও তা হৃদয়গ্রাহী। বিশেষ কায়দায় তিনি *খোয়াবনামার* যে নির্ঘন্ট ফেঁদেছেন তা-ও অভিনব। সত্যেন সেনের নাম কেন যেন অনেক ক্ষেত্রেই অনুচ্চারিত থাকে। সম্পাদককে ধন্যবাদ তাঁকে নিয়ে ক্ষুদ্র হলেও দুটি রচনা সূচিবদ্ধ করবার জন্য। এক্ষেত্রে মফিদুল হকের লেখাটি উৎকৃষ্টতর।
জাকির তালুকদারের *মুসলমানমঙ্গলের* ব্যবচ্ছেদজাত আলোচনা শান্তনু কায়সারের নিষ্ঠাকেই নির্দেশ করে। সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস নিয়ে এরকম বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় খুব বেশি দেখা যায় নি। বলতেই হয়, এ সংকলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখা এটি। সৈয়দ আজিজুল হকের আবুল ফজল বিষয়ক আলোচনায় পাঠক নতুন কিছু পেয়েছে বলে মনে হয় না।
জাহেদ সরওয়ার আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপের* কথা পেড়ে প্রসঙ্গের বাইরের বয়ানই বেশি করেছেন। লেখায় বিশ্লেষণ, পারম্পর্য– দুটোরই অভাব বোধ করেছে পাঠক। শওকত ওসমানের *ক্রীতদাসের হাসি* নিয়ে এযাবত কথা কম হয়নি, তবে সৌমিত্র শেখরের আলোচনাটি তথ্যবহুল। কবীর চৌধুরী গতানুগতিক বিশ্লেষণে আবুবকর সিদ্দিকের দুটি উপন্যাসের আলোচনা তুলে ধরেছেন। কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীর তাঁর 'জহিরকথনে' ঔপন্যাসিক শহীদুল জহিরের প্রবণতাগুলো ধরবার চেষ্টা করেছেন। জনপ্রিয় সাহিত্য যে ভালো সাহিত্য হতে পারে এবং হুমায়ূন আহমেদ ভালো লেখক–
একথা তুলে ধরতে ফেরদৌসী সুলতানা যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে তাঁর প্রচল জনপ্রিয় শিল্পচেতনাই প্রকটিত হয়েছে। তিনি যে প্রশ্নমালা দিয়ে রচনার যবনিকাপাত ঘটিয়েছেন তার জবাব বোধ করি হালখাতার অনুচ্চ শ্রেণীর পাঠকেরও জানা আছে। সন্দেহ নেই, লেখাটি এ-সংখ্যার জন্য বাহুল্য ছিল। বদিউর রহমান *জীবন আমার বোনের* শিল্পরীতি বিশ্লেষণ করে যথার্থভাবেই পাঠকের সামনে একে কলাকৈবল্যবাদী উপন্যাস রূপে তুলে ধরেছেন। স্বল্প পরিসরের আলোচনায় দীপংকর গৌতম

ঔপন্যাসিক রশীদ করীমের অসাধারণত্ব তুলে ধরেছেন। নাসরিন জাহানের উড়ুক্কু যার পড়া নেই গোপা দত্ত ভৌমিকের আলোচনায় তিনিও খানিকটা উপন্যাস পড়বার স্বাদ পেয়ে যান, কারণ প্রাবন্ধিক পাঠককে উপন্যাসটির ভেতরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। এছাড়া এ সংখ্যায় ছিল শওকত আলীকে নিয়ে ফরীদুল আলমের, সৈয়দ হককে নিয়ে মোস্তফা তারিকুল আহসানের, সেলিনা হোসেনকে নিয়ে নাজনীন আখতারের, আকিমুন রহমানকে নিয়ে আহমাদ মাযহারের প্রবন্ধ। সুসম্পাদিত ও সুপরিকল্পিত এই সংখ্যাটি পড়ে নিঃসন্দেহে আনন্দিত ও উপকৃত হয়েছি। তবু প্রশ্ন জেগেছে আশির দশক বা তৎপরবর্তী যে-সব লেখক সম্পর্কে স্বতন্ত্র রচনায় আলোচনা করা হয়েছে তাঁদের চেয়ে হাসান আজিজুল হক, আলাউদ্দীন আল আজাদ, হুমায়ুন আজাদ, হরিপদ দত্ত, মঞ্জু সরকার বা তসলিমা নাসরিন কি লেখক হিসেবে কম গুরুত্বপূর্ণ? তাহলে তাঁরা প্রাসঙ্গিক হলেন না কেন? যাঁদের কেবল একটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে– অন্যগুলো সম্পর্কে জানার আগ্রহ কিন্তু রয়েই গেল। একেবারে সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ ঔপন্যাসিকদের নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকলে সংখ্যাটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যেত।

তবে পাঠক হিসেবে আকাঙ্ক্ষা যেমন আমাদের থাকবেই অন্যদিকে সম্পাদকীয়তে হালখাতার সম্পাদক নিজেদের সীমাবদ্ধতার কথা অবশ্য স্বীকার করেছেন। মুঠোফোনের মাধ্যমে তার কাছ থেকে জানা গেল, যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিকের ওপর স্বতন্ত্র আলোচনা বাদ পড়েছে– সেটা অসচেতনতা বশত নয়। বরং বাদপড়াদের ওপরও লেখা পাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই লেখাগুলো শতচেষ্টা করেও নাকি পাওয়া সম্ভব হয়নি। এছাড়া পত্রিকার পৃষ্ঠাসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে অন্যান্য সংখ্যার তুলনায় এ সংখ্যার খরচ বেড়ে যাওয়ায়, আর্থিক সীমাবদ্ধতাকেও কিছুটা দায়ী করেছেন তিনি।

হাসান অরিন্দম
কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক। সহকারি অধ্যাপক, সরকারি কে.সি. কলেজ, ঝিনাইদহ।

উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যায় যে ঘাটতি রয়েছে

মা সু দ রা না

"হালখাতা" ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি বর্তমান সময়ে বোদ্ধা পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। বিশেষ করে এর বিষয়ভিত্তিক বৈশিষ্ট্যই বড় দৃষ্টান্ত। "শিল্পের দর্শন", "ইতিহাসের দর্শন" "ভূমিকম্প সংখ্যা" এবং "তেল-গ্যাস-কয়লা খনিজসম্পদ অধিকার সংখ্যা"টি ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি সংখ্যা মিলে নয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি সংখ্যাই বর্তমান প্রেক্ষাপটের একেকটি দলিল।

আজ আমি শুধু "বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক প্রবন্ধ সংখ্যাটি" নিয়ে আমার প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিষয়ে কিছু কথা বলব। সংখ্যাটি শুধু বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয়ক না হয়ে যদি বাংলা উপন্যাস বিষয়ক হত তাহলে আরো ভালো হত। কারণ কত দিন আর আমরা এই দ্বি-খণ্ডিত মানসিকতা নিয়ে চলব? তবে শুধু বাংলাদেশের উপন্যাস নিয়ে প্রবন্ধ সংখ্যা করার পেছনেও যে বিশেষ দর্শন কাজ করেছে যা দু'টি সম্পাদকীয় পড়লে বোঝা যায়। সংখ্যাটিতে নির্দিষ্ট উপন্যাসের ওপর আলোচনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আছে। যেমন হামীম কামরুল হকের প্রবন্ধটির প্রথমাংশে বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের বিষয়টি আলোচনার পাশাপাশি উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য খুব চমৎকারভাবে উঠে এসেছে। এই লেখাটিতে আরেকটি বিষয় এসেছে– একটি ভালো উপন্যাসের জন্য অবশ্যই আর্গুমেন্ট থাকতে হবে, এছাড়াও তার মতে থিম, ভাষা, কাহিনীও জরুরি বিষয়।

মাসুদুজ্জামানের "জাতিরাষ্ট্র ও উত্তর-উপনিবেশবাদ: বাংলাদেশের উপন্যাস পাঠের ভূমিকা" প্রবন্ধটিও গুরুত্বপূর্ণ। যতীন সরকারের বৃহৎ প্রবন্ধটিতে পূর্ববাংলার উপন্যাসের কালক্রমিক শ্রেণিবিভাগসহ একটি উপন্যাসের বড় তালিকা আছে। গবেষণার জন্য পরবর্তীকালে যে কেউ খুব সহজে এখান থেকে সাহায্য নিতে পারবেন। সংখ্যাটিতে বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হলেও বাংলাদেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের নিয়ে আলোচনা এখানে ঠাঁই পায়নি। বিশেষ করে সমকালীন ঔপন্যাসিকরা বাদ পড়েছেন। এটাই হল এই সংখ্যার একটি বড় ঘাটতির দিক। বাংলাদেশের বর্তমান সময়ের দু'জন গুরুত্বপূর্ণ লেখক হাসান আজিজুল হক এবং হরিপদ দত্তকে নিয়ে আলোচনাই স্থান পায়নি। হাসান আজিজুল হককে মিডিয়ার বদৌলতে অনেকে জানলেও হরিপদ দত্ত একজন প্রচারবিমুখ এবং অনেকটা নিভৃতচারী

লেখক। বাংলাদেশের অধিকাংশ নতুন প্রজন্ম তাঁকে চেনেই না। কিন্তু তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তাঁর অন্য উপন্যাসের কথা বাদ দিলে শুধু "জন্ম-জন্মান্তর" এবং "চিম্বুক পাহাড়ের জাতক" উপন্যাসের জন্য তিনি বাংলাসাহিত্যে আজীবন বেঁচে থাকবেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা উপন্যাসের ধারায় নতুন চমক সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে নিয়েও কোনো আলোচনা স্বতন্ত্রভাবে ঠাঁই পায়নি। এছাড়াও বর্তমান সময়ের হরিশংকর জলদাশকে নিয়ে আলোচনা খুব দরকারি ছিল।

সলিমুল্লাহ খান মানেই তত্ত্ব-বিশ্লেষণধর্মী লেখা; আহমদ ছফার "গাভী বিত্তান্ত" উপন্যাসটি যে সত্যিই নারীবিদ্বেষী এবং গো-হত্যা উপন্যাস নয় তা লেখক প্রাঞ্জল ভাষায় বেশ কিছু তথ্য-উপাত্ত দিয়ে তুলে ধরেছেন। প্রবন্ধটির মধ্যে নতুন ভাবনার ছোঁয়া আছে।

আমাদের দেশের জনপ্রিয় লেখক "হুমায়ূন আহমেদ"কে নিয়ে ফেরদৌসি সুলতানার লেখাটি একপেশেই হয়েছে বলা যায়। এই একপেশে লেখার বিপরীতে আর একটি প্রবন্ধ যেতে পারত। তার লেখার প্রেক্ষিতে শুধু এ কথাই বলতে চাই– হুমায়ূন আহমেদ দায়িত্বশীলতার দিক থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেখকই নন। তাকে বড় জোর "পণ্য লেখকই" বলা যেতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তিনি একজন হুঁ ঢ়ৎড়ফঁপঃ. তার কোনো সাহিত্যিক কমিটমেন্ট এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। তার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু নিজেই তিনি তার সম্ভাবনাকে ধ্বংস করেছেন। একইভাবে তার ভাই জাফর ইকবালও হাস্যরসের কল্পবিজ্ঞান লিখে কিশোর সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করছেন। এই দুই ভাই-ই ব্যবসায়ী হিসেবে সফল কিন্তু সেটা মানুষের ক্ষতি সাধন করে।

সৈয়দ আকরম হোসেন এবং বিশ্বজিৎ ঘোষের প্রবন্ধ দু'টি উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে গবেষণাধর্মী লেখা। বর্তমান সময়ের লেখক আহমাদ মোস্তফা কামালের ওপর আলোচনা থাকলে ভালো হত। প্রসঙ্গক্রমে আর একজন লেখকের কথা বলে শেষ করতে চাই– জুলাই ২০০৮ সনে "সংবেদ" থেকে প্রকাশিত শেখ আল মামুন-এর "নুহুলের মনচিত্র" উপন্যাসটি একটি দার্শনিক উপন্যাস। এ রকম উপন্যাস খুব কমই লেখা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। এ ধরনের অপরিচিত অথচ ভালো কিছু উপন্যাস সম্পর্কে বিশেষ আয়োজন এই সংখ্যায় থাকতে পারত।

তারপরও বলব, "হালখাতা" বিষয়ভিত্তিক সংখ্যা বের করে একটি নতুন ধারার সূচনা করেছে। হালখাতা আরো বহুদূর এগিয়ে যাবে এই প্রত্যাশা থাকল।

মাসুদ রানা
কর্মী, বিজ্ঞানচেতনা পরিষদ। শাহবাগ, ঢাকা।

প্র ব ন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন : একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা

শে খ মু হা ম্ম দ শ হী দু ল্লা হ

গত কয়েক দশক ধরে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কথা হচ্ছে। বৎসরের বিভিন্ন ঋতু বা মাসের সঙ্গে তাপমাত্রা, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বৃষ্টিপাত, বায়ুবেগ, ঝড়-এর যে চিরায়ত সম্পর্ক ছিল তাতে বিরাট পরিবর্তন হচ্ছে। ঋতু অনুযায়ী যে মাসে যে তাপমাত্রা বা বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। একই দেশে কোথাও বা কখনও অতিবৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও-বা কখনও অনাবৃষ্টি হচ্ছে। এমনও হচ্ছে দেশের কোনো এলাকায় যখন বন্যা হচ্ছে তখন দেশের অন্য এলাকায় চলছে খরা। ঝড়, ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ ও প্রবণতা বাড়ছে।

সবই হচ্ছে বিশ্বের জলবায়ুর উষ্ণায়নের ফলে। উষ্ণায়ন ক্রিয়া দুই কারণে ঘটে– **প্রথম কারণ :** অর্থনৈতিক উন্নয়ন-এর গতি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তেল, গ্যাস, কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য দাহ্য অর্গানিক বা কার্বনগঠিত দ্রব্য পোড়ানোর বা দহনের মাত্রার ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটছে এই পদার্থগুলো সবই কার্বনভিত্তিক অর্থাৎ এদের মধ্যে সাধারণ একটি রাসায়নিক মৌলিক উপাদান আছে, যা হল কার্বন বা অঙ্গার পরমাণু। সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহের বা অর্গানিক কম্পাউন্ডের মূল গঠনকারী উপাদান হচ্ছে এই কার্বন। তেল, মিথেন গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি কোটি কোটি বছর পূর্বে প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের থেকে জীবাশ্ম হয়ে সৃষ্ট। অতএব খড়কুটা, কাঠ, বাঁশ, গোবর ইত্যাদি পোড়ালে যেমন কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক যোগক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসে রূপান্তরিত হয় ও তাপ নির্গত হয় তেমনি জীবাশ্মজ্বালানি যথা তেল, মিথেন গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি মোটরযানের ইঞ্জিনে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বা চুলায় পোড়ালে একই রাসায়নিক যোগক্রিয়া ঘটে এবং তাপ উৎপাদিত হয়। সভ্যতার উন্নয়নের ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে তাপশক্তির ব্যবহার বাড়ছে। ফলে জীবাশ্মজ্বালানি পোড়ানো এবং কাঠ-বাঁশ তথা বর্তমান অর্গানিক কম্পাউন্ড পোড়ানো বাড়ছে। কার্বন কম্পাউন্ড সম্পূর্ণ পুড়লে কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় কিন্তু দহন ক্রিয়া সম্পূর্ণ না হলে কিছু কার্বন মনোক্সাইডও উৎপন্ন হয়। কিন্তু তা-ও কিছুকাল পরে বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক সমন্বয়ের ফলে কার্বন-

ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে গাছপালা সূর্যালোকের উপস্থিতিতে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে নিজের শরীরে কার্বন কম্পাউন্ড তথা কাঠ গঠন করছে। তাই তেল, গ্যাস, কয়লা, কাঠ, বাঁশ, গোবর পুড়ে কার্বন-ডাই-অক্সাইড হচ্ছে, আবার গাছপালা ঐ গ্যাসকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে কাঠের জন্ম দিচ্ছে। একে কার্বনচক্র বলে। এর ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নয়ন ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য একদিকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর উৎপাদন বেশি হচ্ছে অন্য দিকে গাছপালা ও বনাঞ্চল নাশ করার ফলে কাঠে রূপান্তরের মাধ্যমে ঐ গ্যাসের অপসারণ কমে যাচ্ছে। এর ফলে বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছে। নিম্নে দেখানো হল এর ফলে গ্রিনহাউস এফেক্ট হচ্ছে ও বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে।

দ্বিতীয় কারণ

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমাদের ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১৫-৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত উচ্চে বায়মণ্ডলে যে ওজোন স্তর আছে তা মেরু অঞ্চলের উপরে অত্যন্ত পাতলা হয়ে যাচ্ছে এমনকি ফুটো বা ছিদ্র হয়ে যাচ্ছে এবং ছিদ্রের আয়তন ক্রমাগত বাড়ছে। ওজোন গ্যাস ও অক্সিজেন গ্যাস সমধর্মী রাসায়নিক পদার্থ। উভয় গ্যাসের অনু মৌলিক উপাদান অক্সিজেনের পরমাণু দ্বারা গঠিত। অক্সিজেনের অনুতে আছে দুটি পরমাণু অথচ ওজোনে আছে তিনটি। কিন্তু একই পরমাণুবিশিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এ দুটি গ্যাসের ধর্ম বেশ স্বতন্ত্র। ওজোন স্তরটি পৃথিবীর প্রাণীজগতকে একটি ভয়ানক অপকার থেকে বাঁচায়। অনেকেই জানেন সূর্যালোকের অন্তর্গত অতিবেগুনি বা আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি-অংশ শস্য ও প্রাণীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং মানুষের চামড়ায় ক্যানসার সৃষ্টি করে। ওজোন স্তর এই রশ্মি অনেকটা শোষণ করে নেয়। মুখ্যত সিএফসি (ঈঋঈ) বা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন এবং কোনো কোনো এ্যারোসল স্প্রে ও ঐ জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য ওজোন স্তরে ক্ষতি বা ছিদ্র হওয়ার জন্য দায়ী। সিএফসি ফ্রিজ বা শীতল করার যন্ত্রে, আগুন নির্বাপণ করার ইকুইপমেন্টে এবং লুব্রিক্যান্ট হিসেবে বহু ব্যবহৃত। তাই বলা যায় ধনিক শ্রেণীর জনসংখ্যা ও ভোগবিলাসী জীবন বৃদ্ধির সঙ্গে ওজোন স্তরের ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে ও জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৮ সালে সিএফসি-র ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কারণ ওজোন স্তরে পাতলা করার বা ফুটো করার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯৮০'র দশকের শেষভাগে অনেক প্রমাণ আসতে থাকে যে ওজোন স্তর সিএফসি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ১৯৮৭ সালে কয়েকটি দেশ সিএফসি ব্যবহার হ্রাস করতে সম্মত হয়। তাছাড়া এই মর্মে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় যে এই উপাদান বিশ্বের জলবাতাসে ক্রমাগত তাপ বৃদ্ধি করতে অবদান রাখতে পারে।

গ্রিনহাউস এফেক্ট বা ফলাফল *(নিউ স্টান্ডার্ড এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে সংগৃহীত)*

যে ঘটনায় একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডল সূর্যের তাপকে আটকে ফেলে এবং মহাশূন্যে নির্গত হতে দেয় না সেই ঘটনা বা এফেক্টকে গ্রিনহাউস এফেক্ট বলা হয়। সারা বছর উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য যে কৃত্রিম তাপ আটকানো পরিবেশের জন্য গ্রিনহাউস নির্মাণ করা হয় তার থেকে নামটি নেয়া। পৃথিবীর বেলায় এই এফেক্ট প্রধানত কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও বায়ুমণ্ডলের অন্য কয়েকটি গ্যাস-এর দ্বারা তাপ আটকানোর কারণে ঘটে। এই এফেক্ট-এর কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে জীবনের জন্য তাপানুকূল হয়েছে। এই এফেক্ট না থাকলে পৃথিবীপৃষ্ঠ এত শীতল হত যে বরফ আচ্ছাদনের জন্য প্রাণীর ও গাছ-পালার জন্ম হত না।

যে গ্যাসগুলো মিলে গ্রিনহাউস এফেক্ট সৃষ্টি করছে সেগুলো বায়ুমণ্ডলের সামান্য অংশ অধিকার করে আছে। কিন্তু এই গ্যাসগুলো যথা কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন গ্যাস, নাইট্রাস এসিড গ্যাস, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাসের মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। এই বৃদ্ধির অধিকাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানবজাতির কর্মকাণ্ড দ্বারা সৃষ্ট। জীবাশ্মজ্বালানিসহ সকল জ্বালানির দহন সৃষ্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস, ধানগাছ ও গবাদিপশুর পাকস্থলিতে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় সৃষ্ট মিথেন গ্যাস, মোটরযান থেকে নির্গত ও নাইট্রোজেন ঘটিত সার থেকে নির্গত নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস এবং ফ্রিজে বহুল ব্যবহৃত ও এরোসোল এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যে ব্যবহৃত সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন গ্যাস এই এফেক্ট এর জন্য দায়ী।

বহু বিজ্ঞানী মনে করেন যে, উপরোক্ত গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে উষ্ণায়ন ঘটাবে। একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাপমাত্রা কয়েক ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। এই উষ্ণায়ন পৃথিবীর বহু অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটাবে। বৃষ্টিপাতের সময়কাল এবং পরিমাণে তারতম্যের ফলে পানি-সরবরাহ ব্যবস্থা এবং কৃষিব্যবস্থা হুমকিতে পড়বে। বিশ্বের উষ্ণায়নের ফলে হিমবাহ এবং মেরুতে জমাট-বাঁধা বরফ গলে যাবে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমুদ্রের উপকূল জলমগ্ন হবে।

১৯৮০ সালের শেষভাগে আবহাওয়ার রেকর্ড থেকে পাওয়া যায় উষ্ণায়ন সত্যিই ঘটছে। এই উষ্ণায়নকে একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের এক সম্মেলনে ১৫০ টির বেশি দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের সীমা বেঁধে দেয়ার ব্যাপারে একটি চুক্তি করে।

১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিওডিজিনিরো ধরিত্রী সম্মেলনে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, সমগ্র ইউরোপ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ শিল্পোন্নত দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষতিপূরণে ফান্ড গঠনের অঙ্গীকার করে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর অধিবাসী প্রাণীদের ক্ষতি

জুওলোজিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডন এবং গ্লোবাল নেটওয়ার্কের এক যৌথ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ১৯৭০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সাড়ে তিন দশকের ব্যবধানে পৃথিবীর জীববৈচিত্র্যে মারাত্মক ধস নেমেছে। এ সময়ে অন্তত ৩৩০৯ প্রজাতির বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে ১২৩৫টি প্রজাতি অর্থাৎ শতকরা ৩৭ ভাগ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রতিবছর জীববৈচিত্র্য হারানোর যে প্রবণতা তাতে ধারণা করা হচ্ছে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫১ ভাগ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাবে– যা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। রিপোর্টে আরও উল্লেখ করা হয়েছে জীববৈচিত্র্যের মারাত্মক অবনতির ফলে নেমে আসতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়– যার প্রভাব পড়বে কৃষিজমি, বনভূমি, এমনকি সাগরসম্পদের উপর। পরিণতিতে বেড়ে যাবে খাদ্যপণ্য, পানি ও জ্বালানির মূল্য। ডব্লিউডব্লিউএফ-এর আন্তর্জাতিক (ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার) মহাপরিচালক জেমস লিপের ভাষায়, ভয়াবহ সেই পরিণতি থেকে পৃথিবী ও পৃথিবীর জীবকুলকে রক্ষায় আমাদের জীবনযাপনের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে। যেসব ক্রিয়াকলাপে জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হবার আশঙ্কা থাকে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। একই গ্রুপের স্কটল্যান্ড শাখার নীতিনির্ধারক ড. ড্যান বারলো বলেন, বিশ্বের চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কট নিয়ে মিডিয়া মাতামাতি করলেও মূল অনুষঙ্গ প্রকৃতি বিশেষ করে জীববৈচিত্র্য নিয়ে তেমনটি উচ্চবাচ্য করছে না।

প্রকৃতিবাদী সংগঠন গ্রিনপিসের অন্যতম কর্ণধার ডুনাল পিয়েরে আরও একধাপ স্বর চড়া করে বলেছেন, ধনী দেশগুলো তাদের জীবনমান উন্নত করার প্রয়াসে বিশ্বকে, বিশেষ করে অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশকে বাসকেটে বা ঝুড়িতে পরিণত করেছে। তারা শিল্পবর্জ্য থেকে শুরু করে যাবতীয় পরিবেশবিধ্বংসী উপাদান ঠেলে দিচ্ছে দরিদ্র দেশগুলোতে। ফলে দরিদ্র দেশগুলো ক্রমেই আরও দারিদ্র্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। কোপেনহেগেন জলবায়ু শীর্ষসম্মেলনেও তারা তাদের কুৎসিত চেহারা আড়াল করতে পারেনি। তাঁর ভাষায় কার্বন নির্গমনের হার কমিয়ে আনার ব্যাপারে যেসব গালভরা প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে তা আসলেই অন্তঃসারশূন্য। বরং চলমান সঙ্কটকে আরও প্রকটতর করার দীর্ঘমেয়াদি সময় পেল সংশ্লিষ্ট দেশগুলো। তাঁর মতে, কার্বন নির্গমন হ্রাসের হারের যে প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা হয়েছে তা মনিটরিং-এর জন্য চাই নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সংস্থা– যার কাজ হবে আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তি সংস্থার (আইএই) মতোই। তবে যেসব দেশ কার্বন নির্গমনে শীর্ষে অবস্থান করছে ঐ সংস্থায় তার পর্যবেক্ষক না রাখাই ভালো। তাতে অন্তত মানসম্মত মনিটরিং আশা করা যেতে পারে।

প্রাণী সংরক্ষণবাদী সংগঠন এপিএ'র গবেষক এ্যানাল জারগান বলেন, মানুষের জীবনমান উন্নত করার নামে প্রাণী নিধন প্রকারান্তরে মৃত্যুকে ডেকে আনা। কেননা মানুষের বেঁচে থাকার জন্য তার চারপাশে যে ব্যূহ দরকার তা রচনা করে মূলত সহযোগী প্রাণী ও পরিবেশ। অথচ সে দিকটায় নজর নেই কারো। অর্থনৈতিক মন্দা

নিয়ে বহু গবেষণা করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলন পর্যন্ত হয়েছে। সেসব সম্মেলনে মন্দা কাটিয়ে ওঠার নানা উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আঞ্চলিক তহবিল গঠনের প্রসঙ্গও এসেছে। অথচ মহামন্দার মূল কারণ জীববৈচিত্র্যে ভয়ানক পরিবর্তন, সে বিষয় নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয়নি। যা হয়েছে তা একটা দায়সারা গোছের। তাই সর্বাগ্রে জীববৈচিত্র্য নিয়ে ভাবতে হবে। অর্থনৈতিক সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্য তো বটেই পৃথিবী ও এর বুকে বিচরণকারী জীবজন্তুকে নিরাপদ রাখার মূলমন্ত্র পরিবেশবিধ্বংসী ক্রিয়াকলাপ পরিহার করা। তবেই উষ্ণায়ন রোধ হবে। দুই মেরুর বরফচাঁই অক্ষুণ্ন থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে থাকবে। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, মহামারী সংহারমূর্তি ধারণ করবে না। সর্বোপরি মানুষ আয়েশে না হোক নিঃশঙ্কচিত্তে বসবাস করতে পারবে মর্ত্যের মাটিতে। এ জন্য রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ও তা পালনের বিকল্প নেই।

১ সেপ্টেম্বর ২০০৯ তারিখে কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে প্রথম দক্ষিণ এশীয় সম্মেলন। সেখানে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর প্রতিনিধিরা একটি রূপকল্প তৈরি করেন। ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠেয় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনবিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে পর্বতবাসীর যে ক্ষতিগুলো হবে, রূপকল্পে তা তুলে ধরার ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়ায় বিশ্বের প্রধান অর্থনৈতিক জোট জি-২০-র দুই দিনব্যাপী সম্মেলন গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০০৯-এ শেষ হয়েছে। কিন্তু ঐ সম্মেলনের সফলতার ব্যাপারে হতাশা ব্যক্ত করেছেন পরিবেশবাদীরা। তাঁরা আশা করেছিলেন, সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় একটা বড়সড় আন্তর্জাতিক তহবিলের ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু তহবিলের ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট ঘোষণাই দেননি বিশ্বনেতারা। ফলে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু সম্মেলনের সফলতার ব্যাপারে সংশয় তৈরি হল।

সেপ্টেম্বর ২০০৯-এর শেষ সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে ইউএসআইডি'র এক সভায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপুমনি বলেছেন জলবায়ু বিপর্যয়ের দরুন বাংলাদেশ মহাবিপর্যয়ের শিকার হবে। অথচ এই শতকে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় বিপদে বাংলাদেশের মতো দেশের দায়িত্ব সামান্যই। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশেষ করে নজরে এনেছেন ঘন ঘন দুর্যোগ, জলোচ্ছ্বাস ও বিরাট এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়ার ফল হিসেবে মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হওয়া এবং খাদ্য নিরাপত্তা ভেঙে পড়ার আশঙ্কার কথা। এ বিষয়ক জাতিসংঘের সংস্থা আইপিসিসির আশঙ্কা, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা ৫০ বছরের মধ্যে ডুবে যাবে। প্রায় দুই কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তু হয়ে যাবে। রেহাই পাবে না সুন্দরবনও। রোগ ও মহামারী যেমন বাড়বে, তেমনি সম্পদ নিয়ে হানাহানিও বেড়ে যাবে ভয়াবহ মাত্রায়। দেখা দেবে পানীয় জলের সংকট।

অথচ এই পরিণতির জন্য দায়ী উন্নত দেশের অতিমাত্রায় জ্বালানি ব্যবহার ও ভোগবিলাসী জীবন যাপন এবং অতিমাত্রায় জ্বালানি পুড়িয়ে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বাড়িয়ে ফেলা। কিন্তু একের পর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হলেও এর দায়দায়িত্ব আরোপ ও প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে তারা নারাজ। যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও চীনেরই এ ব্যাপারে দায় বেশি। কিন্তু তারা ক্ষতিকর গ্যাস নির্গমন রোধসংক্রান্ত ১৯৯৭-এর কিয়োটা প্রটোকলে স্বাক্ষর করেনি। কিয়োটা প্রটোকল অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো তাদের মোট জাতীয় বাজেটের একটা অংশ ক্ষতিপূরণ হিসেবে নিয়মিতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে দিতে বাধ্য।

আমরা আশা করব উন্নত দেশগুলো দরিদ্র ও বিপন্ন দেশগুলোর কথা শুনবে, প্রতিকারের দায়িত্ব নেবে এবং বাংলাদেশের মতো ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেয়ার মাধ্যমে কৃতকর্মের দায় কিছুটা হলেও মেটাবে।

উষ্ণায়ন ও জলবায়ু-সুবিচার, কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলনে মতৈক্য হতে হবে

বিশ্বের গড় তাপমাত্রা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাওয়ায় দেখা দিয়েছে জলবায়ু বিপর্যয়। এর ফলে পৃথিবী নামের আমাদের এই প্রিয় গ্রহটি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিপর্যয়ের মুখোমুখি। আপাতত হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় হিমবাহ এবং মেরু অঞ্চলের হিমশৈল গলতে শুরু করেছে। সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ বিশ্বের অনেক দেশের উপকূলীয় অঞ্চল ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পরিণামে উপদ্রুত অঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। দেখা দেবে জলবায়ু-নিরাপত্তা সমস্যা। বাস্তুচ্যুত মানুষ কোথায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবে, কীভাবে বাঁচবে–এসব প্রশ্নে দেশে দেশে দেখা দেবে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা। আসন্ন ঘোর দুর্দিনের কথা চিন্তা করে বিশ্ববাসীকে এখনই সক্রিয় হতে হবে।

এই পটভূমিতে ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে (৭-১৮) কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিশ্ব জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন (কপ-১৫)। এখানে বিশ্বের প্রায় ১৯০টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান, পরিবেশ বিজ্ঞানী, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধিরা সমবেত হয়ে বিশ্বের উষ্ণায়ন, ২০৫০ সালের মধ্যে কিভাবে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করবেন। কিন্তু কাজটা কঠিন। এর আগে ১৯৯৭ সালে কিয়োটা প্রটোকলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা কমিয়ে আনার যেসব চুক্তি করেছিল, তা প্রায় কেউই মেনে চলেনি। কথা ছিল, সবাই ২০১০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ ১৯৯০ সালের মাত্রার চেয়ে ৫ দশমিক ২ শতাংশ কমিয়ে আনবে। কিন্তু আশঙ্কা করা হচ্ছে, কমানো তো দূরের কথা, বরং ২৫ শতাংশ বেড়ে যেতে পারে। তাই ডিসেম্বরে বিশ্বনেতারা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। কার্বন গ্যাস নিঃসরণ আকাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনা এবং এর বাস্তবায়ন তদারকির কার্যকর ব্যবস্থা না করতে পারলে

কপ-১৫ শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ হতে পারে এবং সে রকম কিছু হলে তা সবার জন্য এক বিয়োগান্তক পরিণতি ডেকে আনবে; যা কারও কাম্য নয় ।

বিশ্বের উন্নত দেশগুলো বছরে মাথাপিছু ১৫-২০ টন, চীনের মতো উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলো প্রায় দেড় টন আর বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলো মাত্র শূন্য দশমিক ২ টন কার্বন গ্যাস নিঃসরণ করে ।

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠেয় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সম্মেলনের আগ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৫০ দিনব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন । অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে গত ২৪ অক্টোবর ২০০৯ এই কর্মসূচি শুরু হয় । এর অংশ হিসেবে ওই দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয় । কোপেনহেগেনে বিশ্বনেতারা জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলায় একটি কার্যকর চুক্তিতে না পৌঁছা পর্যন্ত সারা বিশ্বে এই বিক্ষোভ চলবে ।

এক শনিবার নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে হাজার হাজার পরিবেশবাদী জড়ো হয় । আয়োজকেরা জানান, বিশ্বের ১৮০টি দেশে এই কর্মসূচি চলবে । একই দিন প্যারিসের সেন্ট্রাল স্কয়ারে সমবেত লোকজন পরিবেশ বাঁচানোর দাবিতে নানা কর্মসূচি পালন করে ।

বার্লিনের সিটি সেন্টারের সামনে সাড়ে তিনশ'র বেশি পরিবেশবাদী চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা মারকেলের মুখোশ পরে বিক্ষোভ করেন । লন্ডনের টেমস নদীর তীরে ছয়শ'র বেশি পরিবেশবাদী জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করেন । তাঁরা এর জন্য দায়ী রাষ্ট্রগুলোকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান । এছাড়া লেবাননের বৈরুত, তুরস্কের ইস্তাম্বুল, বাংলাদেশের ঢাকা, ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় কর্মসূচি পালিত হয়েছে ।

কোপেনহেগেন সম্মেলনে বাংলাদেশের কর্মকৌশল

(ড. ফাহমিদা খাতুনের নিবন্ধ থেকে) "জলবায়ু পরিবর্তন চলমান, এটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার সুযোগ নেই । জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকারি প্যানেল বা আইপিসিসি ২০০৭ সালে তাদের চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্টে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিদ্যমান অনেকগুলো বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও প্রমাণাদি উপস্থাপন করে' । আইপিসিসি দেখিয়েছে যে গত ১০০ বছরের বিশ্বের তাপমাত্রা ০ দশমিক ৭৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে; সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১৯৬১ সাল থেকে ২০০৩ পর্যন্ত ১.৮ মিলিমিটার থেকে বেড়ে ১৯৯৩ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত সময়ে ৩.১ মিলিমিটার বেড়েছে; বেশি অঞ্চল জুড়ে এবং বেশি সময় ধরে খরার তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে । জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত দেশের পরিস্থিতি অনেকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে । এতে করে কৃষি-উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে । কৃষি-উৎপাদনে এই ক্ষতির পরিমাণ এশীয় দেশগুলোতে শতকরা ১০ ভাগ এবং সাহারা-দক্ষিণ আফ্রিকায় শতকরা ১৭ ভাগ হতে পারে । এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, বর্তমান হারে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাড়তে থাকলে দক্ষিণ

এশিয়ার দেশগুলোতে গম উৎপাদন শতকরা ১২ ভাগ, ধান উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ এবং ভুট্টা উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ কমে যেতে পারে। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার ১৬০ কোটি লোকের জন্য পানি এবং খাদ্য-নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুধু ধনী এবং দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে বৈষম্য বাড়বে না, দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেও বৈষম্য দেখা দেবে। দেশের ভিতরে আর্থ-সামাজিকভাবে দুর্বলতম অংশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বেশি।

২০০৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কনভেনশন কাঠামো বা ইউএনএফসিসি'র অধীনে বালি রোডম্যাপ গৃহীত হয়। এতে বিশ্বের দেশগুলো ২০১২ পর্যন্ত এবং তার পরেও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং কার্যক্রম নিয়ে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বালি রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০০৯ সালের ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন সম্মেলনে পাঁচটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য হওয়ার কথা। এগুলো হল, (১) দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতার জন্য অংশীদারীমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, যার মধ্যে বিশ্বের কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা রাখা। (২) জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার জন্য জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরো বেশি করে কার্যক্রম গ্রহণ করা। (৩) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করার জন্য কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। (৪) জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং ঝুঁকি মোকাবিলা করতে কার্যক্রম নেয়ার জন্য প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া বর্ধিত করা। (৫) আর্থিক সহায়তা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়ানো।

বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত সময়কালে গড় তাপমাত্রা মে মাসে ১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং নভেম্বর মাসে ০ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বেড়েছে। অন্যদিকে বাৎসরিক গড় বৃষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। ঘন ঘন বন্যা হচ্ছে এবং বন্যা ভয়াবহ হচ্ছে; ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মাত্রা বেড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবগুলোর কারণে বাংলাদেশের মানুষের জীবনের নিরাপত্তাই শুধু বিঘ্নিত হবে না, যারা বেঁচে থাকবে তাদের খাদ্য-নিরাপত্তাও হুমকির মুখে পড়বে। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়। কেননা, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়া যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমন করে তা খুবই নগণ্য। তাই বাংলাদেশের জন্য কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করা নয়, এই প্রভাবের মাত্রা কমিয়ে প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য পরিমণ্ডলে এর ঝুঁকি মোকাবেলার প্রচেষ্টাই মূল লক্ষ্য। যেমন কী করে জলবায়ুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে কৃষি-উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া যায়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, সেটি কোথায় পাওয়া যাবে? তা ছাড়াও প্রয়োজন– প্রযুক্তি।

উন্নত দেশগুলোর কথা এবং কাজের মধ্যে মিল না থাকার কারণে উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশের সক্ষমতা বাড়ানোর কার্যক্রম তেমন এগোতে পারছে না। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে কার্বন মুক্ত করতে হলে অর্থ ব্যয় করতে হয়। উন্নত দেশগুলোর জলবায়ু

পরিবর্তন রোধ করার এবং পরিবেশ রক্ষার জন্য নিজেদের দেশে বিনিয়োগ বাড়িয়ে চললেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সাহায্যে তেমন এগিয়ে আসছে না। চলমান বিশ্ব-অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় উন্নত দেশগুলো যে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে তাতে প্রায় ৪ হাজার ১০০ বিলিয়ন ডলার দেয়া হয়েছে তাদের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য। এই বিপুল অর্থ মূলত উন্নত দেশগুলোর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনীতির জন্য ভর্তুকিস্বরূপ। এ ধরনের পদক্ষেপ অসম এবং বৈষম্যমূলক। কেননা, পরিবেশ রক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দে এ রকম উদারতা দেখা যায় না। ইউএনএফসিসি হিসাব করেছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রয়োজন হবে ২৮ থেকে ৬৭ বিলিয়ন ডলার, যা কিনা তাদের মোট জাতীয় উৎপাদন জিডিপির ০.০৬. থেকে ০.২১ ভাগ হবে মাত্র। আন্তর্জাতিক সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতেও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হবে। কেননা, উন্নয়নশীল দেশগুলোর জ্বালানি অবকাঠামোতে প্রচুর বিনিয়োগ প্রয়োজন। ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি বলেছে, এই খাতে ২২ ট্রিলিয়ন (২২ হাজার বিলিয়ন) ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন। অথচ ২০০৮ সালে বিনিয়োগ হয়েছে ১৪৮ বিলিয়ন ডলার।

বর্তমানে বাংলাদেশের জন্যও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কার্যক্রমের অর্থায়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা করার জন্য সামগ্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এবং আন্তর্জাতিক কাঠামোর অধীনে পরিবেশ-বান্ধব বিনিয়োগ বহুগুণ বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে কম্প্রিহেনসিভ অ্যাকশন প্ল্যান ঘোষণা করেছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম বছরের জন্য পাঁচ বিলিয়ন ডলার অর্থ প্রয়োজন হবে। তবে অর্থায়নের ব্যাপারে আরেকটি বিষয় হল, জলবায়ু সংক্রান্ত বর্ধিত অর্থ সাহায্য কিভাবে, কোন কাঠামোর অধীনে ব্যয় করা হবে। বাংলাদেশের মতো দেশে অর্থ জোগাড় করার চেয়ে অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় করাটাই একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতি ও ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে, অনেক ক্ষেত্রেই এই বিনিয়োগের একটা বড় অংশ এসেছে উন্নয়ন সহযোগী দেশ এবং দাতাগোষ্ঠীর কাছ থেকে। বাংলাদেশের জন্য সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হল, এই খাতে বিনিয়োগ আরো বাড়ানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকিকে সামনে রেখে এই ঝুঁকি হ্রাসে যথাযথ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাওয়া। ২০০৮ সালে সরকার বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এই কৌশলপত্র এবং কর্মপরিকল্পনা ছয়টি ভিত্তিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। (১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য; (২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; (৩) অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা; (৪) গবেষণা; (৫) জলবায়ু পরিবর্তন রোধ এবং কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনা এবং (৬) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনাটি কিছু সংযোজন-বিয়োজন করে ২০০৯-এ পুনঃসংস্করণ করা হয়েছে। এতেও এই ৬টি বিষয়েই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোপেনহেগেন জলবায়ু সংক্রান্ত জাতিসংঘের সম্মেলনে বাংলাদেশের মানুষের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ঝুঁকি মোকাবিলায় কী কী প্রস্তুতি নেয়া জরুরি দরকার, সে সব বিষয়ে আলোচনার মূল নথিপত্র হবে এই কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনাটি।

তবে বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলা করা সংক্রান্ত আলোচনায় দরিদ্র দেশগুলোর জন্য অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি কেন্দ্রস্থলে রয়েছে। কোন্ উৎস থেকে অর্থ আসবে, কোন্ শর্তে আসবে, কিভাবে তা ব্যয় হবে, প্রযুক্তি হস্তান্তর কিভাবে হবে, বাণিজ্য সংক্রান্ত মেধাস্বত্ব আইনের ব্যাপারে জটিলতা কিভাবে দূর করা হবে– এই বিষয়গুলো জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের কৌশলপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। বিশ্ববাসী ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত পেয়েছে, ২০০৯ সালের ৭-১৮ ডিসেম্বর কোপেনহেগেন সম্মেলনে উন্নত দেশগুলো তাদের কার্বন নির্গমন কমানোর ব্যাপারে কোনো ধরনের আইনগত চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে না। তবে এ ধরনের চুক্তি হোক বা না হোক বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কোপেনহেগেন এবং তারপরেও বিশ্বসভায় দেনদরবারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ এবং জুতসই প্রযুক্তি আহরণ করা।"

মিখাইল গর্বাচেভ ও আলেকজান্ডার লিখোতাল-এর প্রবন্ধ থেকে

যুক্তিসংগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন যে স্তরে সুস্থিত করা উচিত সে স্তর অর্জনে শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন কমাতে হবে ৪৫ থেকে ৫০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে তা প্রায় পুরো থামাতে হবে। এখন আলোচনার টেবিলে ২০২০ সালের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ কমানোর যে কথা তোলা হচ্ছে, তা হলে চলবে না। প্রধান প্রধান উন্নয়নশীল দেশকেও জাতীয় পর্যায়ে যথাযথ উপশমমূলক কর্মসূচি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তবে ধনী দেশগুলোকেই আগে পদক্ষেপ নিতে হবে। গত ২০ বছরের নিষ্ক্রিয়তার ফলে তাদের কোনো অধিকার নেই অন্যকে নির্দেশ দেওয়ার।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) সতর্ক করে জানিয়েছে, ২০৩৫ সালের মধ্যেই হিমালয়ের সব হিমবাহ গলে যেতে পারে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ওই অঞ্চলের বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব এরই মধ্যে অনুভূত হচ্ছে। নেপাল ও ভুটানে গলে যাওয়া হিমবাহ থেকে বিশালাকৃতির হ্রদ সৃষ্টি হয়েছে। এসব হ্রদ উপচে ভাটিতে থাকা গ্রামগুলো প্লাবিত করতে পারে। নেপালের পর্বতারোহী ও পরিবেশ কর্মী দাভা স্টিভেন শেরপা বলেন, ২০০৭ সালে মাউন্ট এভারেস্টের বেস ক্যাম্পে একটি তুষারপাতের ঘটনার পর থেকে তিনি পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন। হিমালয়ের বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি

জানান, একটি হিমবাহের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার কয়েক মিনিট পর সেটি ধসে পড়ে।

এদিকে এক সমীক্ষার বরাত দিয়ে চীনের বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, হিমবাহ গলে যাওয়ার হার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে বেশি করে স্বল্পমেয়াদি বন্যা হচ্ছে। আর হিমবাহ গলে যাওয়ার কারণে দীর্ঘ মেয়াদে নদীর প্রবাহ হ্রাস পাবে বলে ওই সমীক্ষায় জানানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, হিমালয়ের উৎসগুলো থেকে পানির প্রবাহ কমে গেলে ভারত ও চীনের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে। আইপিসিসি জানিয়েছে, বাংলাদেশের মতো ভাটির দেশগুলোতেও ব্যাপক বন্যা দেখা দিতে পারে এবং পরে সেখানকার নদীগুলো শুকিয়ে খরা দেখা দিতে পারে। তবে বিজ্ঞানীদের একটি অংশ হিমবাহ গলে যাওয়ার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে একমত নন। তারা জানিয়েছেন, হিমবাহগুলো বরং আরো জমাট বাঁধছে। সম্প্রতি এই ধারণার সমর্থক ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ বিজয়কুমার রায়নাকে উদ্ধৃত করে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবকে খাটো করে বর্ণনা করতে গিয়ে সমালোচিত হয়েছেন সে দেশের পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ।

নেপালভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড মাউন্টেন ডেভেলপমেন্ট (আইসিআইএমওডি) তিন দশক ধরে হিমালয় অঞ্চলের ওপর গবেষণা চালাচ্ছে এবং সতর্ক করে বলেছে, এ অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণে আরো গবেষণা দরকার।

অতিরিক্ত উষ্ণায়নের জন্য দায়ী কার্বন নিঃসরণ

যা ধারণা করা হত, তার চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী কার্বন-ডাই-অক্সাইড। কোনো এক রোববার প্রকাশিত এক সমীক্ষা থেকে এ তথ্য জানা গেছে। আর এতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের ব্যাপারে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কোপেনহেগেন সম্মেলন শুরুর হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে এ গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়।

নেচার জিওসায়েন্স সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রটিতে ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা জানান, জলবায়ু নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ব্যবহৃত একটি উপাত্তের কারণে সম্ভবত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নিঃসরণের কারণে প্রাকৃতিকভাবে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রক্রিয়াটির প্রতি ভালো করে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আর এতে কার্বন নিঃসরণের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হিসাব-নিকাশে গোলমাল হয়ে থাকতে পারে।

গবেষণা প্রতিবেদনের মূল রচয়িতা ব্রিটেনের ইউনির্ভার্সিটি অব ব্রিস্টলের ড্যান লান্ট বলেন, 'আমরা অনেক বেশি আতঙ্ক তৈরি করতে চাচ্ছি না। তবে বিশ্ববাসী কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলে এর মাত্রা কতটুকু হওয়া উচিত, তা

নিয়ে আলোচনা করতে আগ্রহী আমরা। কার্বন নিঃসরণের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে।

দৈনিক প্রথম আলো, ১৩ ডিসেম্বর ২০০৯ থেকে উদ্ধৃত

পরিবেশবাদী সংগঠন ক্লাইমেট অ্যাকশন, গ্রিনপিসসহ বিভিন্ন সংগঠন এক বছর ধরে এই প্রতিবাদ সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়েছে বলে আয়োজকরা জানান। ডেনমার্কভিত্তিক সংগঠন কিমা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকেও কোপেনহেগেনে আলাদা বেশ কয়েকটি সমাবেশের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি সংগঠনই পৃথিবীর তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি বাড়তে না দেওয়া ও গ্রিনহাউস গ্যাসের ঘনত্ব ৩৫০ পিপিএমের বেশি বাড়তে না দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে ১২ ডিসেম্বর ২০০৯-এ বাংলাদেশের বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (ইইউ) পক্ষ থেকে ১০.৬ বিলিয়ন ডলারের যে জলবায়ু তহবিল ঘোষণা করা হয়েছে তাকে অপর্যাপ্ত হিসেবে মনে করে বাংলাদেশ। কেননা, এই অর্থ দিয়ে বাংলাদেশসহ জলবায়ু ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলো সম্ভাব্য ক্ষতি মোকাবিলা করতে পারবে না।

হাসান মাহমুদ আরও বলেন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশের যে সংখ্যক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা ৪২টি ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। তাই জনসংখ্যার মাথাপিছু হিসাব করলে মোট তহবিলের ১৫ শতাংশ বাংলাদেশের পাওয়া উচিত। বাংলাদেশের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জলবায়ু-ঝুঁকিতে থাকা প্রায় ১০০টি দেশের জোট মোস্ট ভালনারেবল কান্ট্রি (এমভিসি) জাতিসংঘে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে বলেও তিনি জানান।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আয়োজন করা 'বাংলাদেশ : জলবায়ু পরিবর্তনের নির্মম শিকার' শীর্ষক এক পার্শ্ব অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের অর্থ-ব্যবস্থাপনা বিশ্বব্যাংকের হাতে ছেড়ে দেওয়া বাংলাদেশ নৈতিকভাবে সমর্থন করে না। তবে আপাতত দুই বছরের জন্য বিশ্বব্যাংকের কাছে এই অর্থ-ব্যবস্থাপনার জন্য ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তারপর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব নেওয়া হবে।

বিশ্বব্যাংকের কাছে তহবিল ব্যবস্থাপনার অর্থ ছেড়ে দিলে তারা ১৫ শতাংশ অর্থ ব্যবস্থাপনা খরচ বাবদ কেটে রাখবে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ কম অর্থ পাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকেরা এই প্রশ্ন তুললে হাসান মাহমুদ বলেন, বিদ্যমান আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে যাতে জলবায়ু তহবিলের টাকা খরচ করা না হয়, সে জন্য বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের কাছে প্রস্তাব করবে। তবে এই প্রতিষ্ঠান তৈরি হওয়ার অন্তর্বর্তীকালীন সময় হিসেবে দুই বছর বিশ্বব্যাংক তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেবে।

জাতিসংঘের ডাকে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে জমায়েত হয়েছেন বিশ্বের ১৯২টি দেশের সরকারি প্রতিনিধিরা। (কোপ-১৫ সম্মেলন ৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯) জলবায়ু সম্মেলনের পঞ্চম দিনে এসে খসড়া প্রস্তাব প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ২০৫০ সালের মধ্যে ১৯৯০ সালের তুলনায় ৫০ বা ৮০ অথবা ৯৫ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি শিল্পবিপ্লবের শুরুর তুলনায় ১.৫ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ধরে রাখার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। ছোট দ্বীপরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলো চায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখার লক্ষ্য ঠিক করা হোক। কিন্তু জি-৮ শিল্পোন্নত দেশগুলো এটাকে রাখতে চায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে। উন্নয়নশীল ও সম্ভাব্য ক্ষতির শিকার দেশগুলো চায়, জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আইনগত বাধ্যবাধকতাসহ বিশ্বের সব রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি ও রাজনৈতিক মতৈক্য আসুক। জলবায়ু ক্ষতির শিকার রাষ্ট্রগুলো চাইছে, কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর না-করা যুক্তরাষ্ট্রও চুক্তিতে স্বাক্ষর করুক।

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এখনই যদি বিশ্বের সব দেশ কার্বন নিঃসরণের মাত্রা শূন্যে নামিয়ে আনে, তা হলে জলবায়ু পরিবর্তন বন্ধ হবে না। কেননা বায়ুমণ্ডলে এরই মধ্যে যে পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইডসহ বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে বিশ্বের জলবায়ু-ক্ষতির পরিমাণ বাড়তেই থাকবে। তাই ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে জলবায়ু ক্ষতিপূরণ আদায় করে দরিদ্র দেশগুলোকে টিকে থাকতে সহায়তা দিতে একটি অভিযোজন তহবিল (অ্যাডাপটেশন ফান্ড) তৈরি নিয়ে কোপেনহেগেন সম্মেলনে আলোচনা প্রায় চূড়ান্ত।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার ব্যয় হিসেবে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বছরে ৭.২ বিলিয়ন ইউরোর একটি তহবিলের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু দরিদ্র ও সম্ভাব্য ক্ষতির শিকার দেশগুলো বলছে, ক্ষতির বিবেচনায় এই অর্থ অতি সামান্য। সম্মেলনে বাংলাদেশ কথা বলছে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর একটি ও জি-৭৭-এর সদস্য হিসেবে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর দাবি তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রির বেশি বাড়তে না দেওয়া, আর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ঘনত্ব ৩৫০-এর বেশি হতে না দেওয়া। তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি চাওয়া হচ্ছে, হয়তো ২ ডিগ্রিতে একটা সমঝোতা হবে।

কিয়োটো থেকে কোপেনহেগেন

১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে জাতিসংঘ একটি জলবায়ু সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে শিল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য সহায়তা দিতে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া বিশ্বের সব রাষ্ট্র একমত হয়েছিল। এ ব্যাপারে একটা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়, যা কিয়োটো প্রটোকল নামে অভিহিত হয়। ২০১২ সালে কিয়োটো চুক্তির মেয়াদ শেষ

হতে চলেছে। এর আগেই যুক্তরাষ্ট্রকে সঙ্গে নিয়ে জাতিসংঘ আরেকটি চুক্তি চাইছে, যা হবে সবার জন্য বাধ্যতামূলক।

কার্বন হ্রাস নিয়ে ত্রিমুখী দ্বন্দ্ব

কোপেনহেগেন সম্মেলন শুরুর দিনই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা দিয়েছে, তারা ২০ শতাংশ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করবে। অন্য দেশগুলো রাজি হলে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত রাজি আছে তারা। অন্যদিকে অন্যতম বেশি কার্বন নিঃসরণকারী দেশ চীন ও ভারত বলছে, তারা মাত্র শিল্পোন্নয়ন শুরু করেছে, প্রবৃদ্ধির হার ধরে রাখতে তাদের আরো কিছু দিন কার্বন নিঃসরণ হবেই। চীন ও ভারতের প্রভাবাধীন জোট জি-৭৭ কার্বন হ্রাসের বাধ্যতামূলক শর্ত যাতে দেয়া না হয় সেই চেষ্টা করে যাচ্ছে।

নিজেদের কার্বন নিঃসরণ কমাতে রাজি না হলেও কিয়োটো চুক্তির আওতায় তৈরি জলবায়ু তহবিলের ৬০ শতাংশ অর্থ নিয়ে যাচ্ছে চীন ও ভারত। জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করে এমন শিল্পপ্রযুক্তি (সিডিএম) ব্যবহার করলে এই অর্থ পাওয়া যায়। তাই সাবেকি প্রযুক্তিনির্ভর বাংলাদেশ এখনো এই তহবিলের অর্থ পায়নি। চীন, ভারত ও ব্রাজিল চাইছে এবার যাতে জলবায়ু তহবিলের অর্থ তারাই পায়।

অন্যদিকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর নেতৃত্বে আছে লেসোথো। বাংলাদেশও গতবারের সভাপতি হিসেবে নীতিনির্ধারণী ভূমিকা রাখছে। জলবায়ু ক্ষতির শিকার দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য এই জোট থেকে দাবি তোলা হচ্ছে। এই জোটের বেশিরভাগ দেশ আবার জি-৭৭ সদস্য হওয়ায় তাদের পক্ষে আলাদা করে অবস্থান নেওয়াও কঠিন। অন্যদিকে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপ জলবায়ু ক্ষতির শিকার ক্ষুদ্র ও দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোকে নিয়ে গঠন করেছে আলাদা একটি জোট। প্রায় ২০টি দেশ এই জোটের সদস্য হলেও জাতিসংঘ থেকে তাদের এখনো কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে এই জোট নৈতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। ডেনমার্ক সরকারের উদ্যোগে বাংলাদেশ, ব্রাজিল, মেক্সিকো, মালদ্বীপ, নেপালসহ ১৮টি দেশ নিয়ে একটি যৌথ অবস্থান ঘোষণারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ জি-৭৭-এর বাইরে আরেকটি জোটে কেন গেল, তা নিয়ে এরই মধ্যে চীন ও ভারতের দিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

সব মিলিয়ে কোপেনহেগেন হয়ে উঠেছে ত্রিমুখী কূটনৈতিক যুদ্ধের ময়দান। এই যুদ্ধে কারা জিতবে তা নির্ভর করছে ধনী দেশগুলো কতটা উদার হবে তার ওপর।

জলবায়ু তহবিলের শুভঙ্করের ফাঁকি

ইউএনএফসিসিসি থেকে কোপ-১৫ সম্মেলন শুরুর আগের দিন ঘোষণা করা হয়েছে, তারা জলবায়ু ক্ষতির শিকার দেশগুলোকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১০ বিলিয়ন ডলার দেবে। ২০২০ সালের মধ্যে এর পরিমাণ হবে ১০০ বিলিয়ন ডলার। এই টাকার ২০ শতাংশ আসবে নগদ অর্থসহায়তা আকারে। বাকি টাকা বিনিয়োগ ও

প্রযুক্তিসহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। অথচ কিয়োটা চুক্তি অনুযায়ী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলো জলবায়ু ক্ষতির শিকার ধনী দেশগুলোকে প্রতিবছর তাদের মোট বৃদ্ধির ১ দশমিক ৪ শতাংশ দেবে। এই হিসাবে ১ হাজার ২০০ বিলিয়ন ডলার সহায়তা পাওয়ার কথা। কিন্তু যুক্তরাজ্য ও ডেনমার্ক বাংলাদেশ, নেপাল ও মালদ্বীপকে প্রায় এক বিলিয়ন ডলারের সহায়তা দিয়েছে। অন্য কোনো দেশই এখন পর্যন্ত কিয়োটা প্রটোকল অনুযায়ী অর্থ সহায়তা দেয়নি।

বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, স্বল্পমেয়াদি সহায়তার পরিমাণ ১৫০ বিলিয়ন ডলারে উত্তীর্ণ করা উচিত। নয়তো বাংলাদেশসহ ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর পক্ষে টিকে থাকাই মুশকিল হয়ে যাবে। আইপিসিসি বাংলাদেশের দাবির পক্ষে অবস্থান নিলেও ধনী রাষ্ট্রগুলো কোনো জবাব দেয়নি। এরকম একটি পরিস্থিতিতে কোপ-১৫ সম্মেলন চলছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে, তা এখনো কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। চুক্তি সমঝোতা, রাজনৈতিক অঙ্গীকার বা ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় সব চেষ্টাই চালু আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুরো আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত ও ব্রাজিলের ওপর, বাংলাদেশসহ দরিদ্র রাষ্ট্রগুলো কতটুকু চাপ তৈরি করতে পারবে কিছুটা তারও ওপর। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশ ও দ্বীপরাষ্ট্রগুলোর পক্ষে নিজেদের অবস্থান ঘোষণা করেছে। দেখা যাক সামনের দিনে কী হয় আশা-নিরাশার কোপেনহেগেনে।

দৈনিক প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর ২০০৯

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উষ্ণতা বাড়ার পাশাপাশি হৃদরোগ, রক্তচাপ, ডায়াবেটিসের মতো অ-সংক্রামক রোগ-ব্যাধি বাড়বে। একই সঙ্গে বাড়বে নতুন ভাইরাস; জীবাণুতে আসবে পরিবর্তন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে শিশুস্বাস্থ্যে। সচেতন থাকলেই এসব ব্যাধি প্রতিরোধ করা সম্ভব। এ জন্য সব শ্রেণী-পেশার মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।

'বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের নির্গমন কমাতেই হবে' জলবায়ু পরিবর্তনের প্রশ্নে মতৈক্যের একটি জায়গা তৈরি হয়েছে। ধনী-গরিব সব দেশের পক্ষ থেকেই একটি কথাই উঠছে। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ২০৫০ সালের মধ্যে গড়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হলে শতকরা ৮০ ভাগ কার্বন নির্গমন কমাতেই হবে। এ পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যত আন্তর্জাতিক সভা হয়েছে, তার মধ্যে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কে কমাবে? এবং কীভাবে কমাবে? সেই প্রশ্ন এখনো অমীমাংসিত। তবে এ কথাও আমরা সবাই জানি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের জন্য শিল্পোন্নত দেশের তথাকথিত উন্নয়ন বা অতি-উন্নয়ন এবং পৃথিবীর সব দেশেই ধনীদের বিলাসী জীবনযাত্রার ধরন দায়ী। এই জীবনযাপনের সব মাধ্যম জ্বালানিনির্ভর, যার মধ্যে এই কার্বন নির্গমনের সব উপকরণ রয়ে গেছে।

হিমালয়ের হিমবাহ গলে যাওয়ার ফলে এশিয়ার, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ার, নদীর উৎস ২০৩৫ সাল অর্থাৎ মাত্র ২০ থেকে ২১ বছরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে বাংলাদেশসহ ভারত, তিব্বত, নেপাল, পাকিস্তান ও মিয়ানমারে আগামী কয়েক দশকে বন্যা ও খরার ঘটনা বেড়ে যাবে। এর অর্থ হচ্ছে, বঙ্গোপসাগরে পানির উচ্চতা এমনিতেই বাড়বে, তার ওপর যোগ হবে হিমালয়ের বরফগলা পানি। বাংলাদেশের মাথার উপরে এবং পায়ের তলায় সব দিক থেকেই আঘাত আসবে।

জাতিসংঘের একটি প্রতিবেদন, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ১৯৯৮ ওভারভিউ, ধনী-গরিবের ভোগের বিপুল ব্যবধান তুলে ধরেছে। সেখানে বলা হয়েছে, মাত্র ২০ শতাংশ ধনী মানুষ ৮৬ শতাংশ ভোগ করে আর সর্বনিম্ন ২০ শতাংশ গরিব মানুষ ১ দশমিক ৩ শতাংশ ভোগ করে। এই বিশ শতাংশ ধনীরা ৪৫ শতাংশ মাছ-মাংস, ৫৮ শতাংশ জ্বালানি, ৮৪ শতাংশ কাগজ এবং ৮৭ শতাংশ গাড়ির ব্যবহার করে। এর বিপরীতে সর্বনিম্ন বিশ শতাংশ মানুষ মাত্র ৫ শতাংশ মাছ-মাংস, ৪ শতাংশ জ্বালানি, ১ দশমিক ১ শতাংশ কাগজ এবং ১ শতাংশ গাড়ি ব্যবহার করে। তাহলে এই গরিব মানুষগুলোকে দুনিয়া থেকে একেবারে সরিয়ে দিলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১ শতাংশও উন্নতি করা যাবে না। অথচ ধনীরা একটু দয়া করে তাদের ভোগের মাত্রা কমিয়ে দিলে অনেক পার্থক্য বোঝা যাবে, এই কথা একটি শিশুও হিসেব করে বুঝবে। কিন্তু তবুও কেন তৃতীয় বিশ্বের জনসংখ্যার দিকে আঙুল তোলা হচ্ছে?

কপ ১৫ পরবর্তী কাল

২৫ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা থেকে উদ্ধৃত:

ড. আতিক রহমান, **পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ :** জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য শক্তিশালী দেশগুলোকে দায়ী করা হয়। কিন্তু উন্নত দেশগুলো নিজেদের অভ্যন্তরীণ স্বার্থের ওপর বেশি জোর দেয়। ফলে উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুষম ভূমিকা পালনের জন্য চুক্তি করতে সহজে রাজি হয় না। উন্নত দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষায়ই চুক্তি করে থাকে। তারা উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা এড়িয়ে যায়। ১৯৯৭ সালে কিয়োটো প্রটোকল চুক্তি হয়। এর মেয়াদ ২০১২ সালে শেষ হয়ে যাবে। প্রটোকলের লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর মোট গ্রিনহাউস গ্যাসে ১৯৯০ সালের লেভেলের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ কমাতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার বার অস্বীকার করেছে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে। তারা বলছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি নিজস্ব আইন আছে। আইনটি কংগ্রেস পার হয়ে এখন সিনেটের কাছে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি এই আইনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্বন গ্যাস মুক্ত করতে সহযোগিতা করবে। কিয়োটো প্রটোকলের চুক্তি অনুসারে প্রায় ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কার্বন নিঃসরণ কমানোর চেষ্টা করছে। আমেরিকার বেশ কিছু অঙ্গরাজ্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য। কোপেনেহেগেনে যে বৈঠক

হল, তা প্রধানত তিনটি পর্যায়ে হয়। ছয়-সাত দিন প্রথম পর্যায়ে সচিব কিংবা সরকারসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কারিগরি বিভাগের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে সরকারপ্রধানদের বৈঠক হয় শেষ তিন দিন। প্রথম দুটি পর্যায়ের বৈঠকের উদ্দেশ্য হল আলোচনার মাধ্যমে একটি মতৈক্যে আসা। শেষ পর্যায়ে সরকার-প্রধানেরা দু-একটি বিষয় বাদে মতৈক্যে পৌছে তা ঘোষণা করবেন। কিন্তু পরে কোপেনহেগেন বৈঠকে অনেক বিষয় আসে, সেগুলোর কোনো মীমাংসা করা সম্ভব হচ্ছে না। শেষের দিকে বৈঠক ভেঙে যাচ্ছিল। অন্য দিকে কিছু কিছু দেশ পারস্পরিক বৈঠকে অনেকগুলো বিষয়ে মতৈক্যে পৌঁছায়। কোপেনহেগেন বৈঠকের প্রায় এক মাস আগে বেইজিংয়ে একটি বৈঠক হয়েছিল চীন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে; যারা দু-তিন বছর ধরে নতুন যুক্ত হয়েছে, তাদের বেসিক গ্রুপ বলা হয়। তারা সেই বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়, যদি তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ আসে তবে তারা কোপেনহেগেন বৈঠক থেকে একসঙ্গে বের হয়ে যাবে, এরকম পরিস্থিতিতে তারা বৈঠকে যোগদান করে। যখন বৈঠক ভেঙে যাচ্ছিল তখন ছোট আকারে ২২টি দেশ নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ফলে অন্যান্য দেশ এতে বঞ্চিত হয়। কোপেনহেগেনে যে চুক্তি হয়, তাতে উন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষা করা হয়। তবে কিছু লাভ হয়েছে যেমন– ২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার বেশি বাড়ানো যাবে না। কিন্তু কিভাবে হবে তা উল্লেখ করা হয়নি চুক্তিতে। আরেকটি বিষয় হচ্ছে ৩০ বিলিয়ন ডলারের একটি ফান্ড তৈরি করা হবে, প্রতিবছরের জন্য ২০১২ সাল পর্যন্ত। ২০১২ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলারের ফান্ড তৈরি করা হবে। এই ফান্ড অনুন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু চুক্তিতে পরিষ্কার করা হয়নি, কারা কী পরিমাণ অর্থের যোগান দেবে। ফলে দুই পৃষ্ঠার যে কোপেনহেগেন চুক্তি করা হয়েছে, তা এখন জাতিসংঘে সব দেশের সম্মতিক্রমে অনুমোদিত হবে। কিন্তু চুক্তিটির অস্পষ্টতার কারণে বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হবে। উচিত ছিল কোপেনহেগেন সম্মেলনে চুক্তিটি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করে পাস করিয়ে দেওয়া।

কোপেনহেগেনে যে ফান্ড গঠনের কথা বলা হচ্ছে, সে ফান্ড থেকে কীভাবে খরচ করা হবে, কারা কতটুকু করবে, সে বিষয়টি পরিষ্কার করা হয়নি। যেমন ভারত বলছে, তাদের ৩০০ মিলিয়ন ধনী লোক আছে। কিন্তু ভারতে যে ৭০০ মিলিয়ন অভুক্ত ও গরিব রয়েছে, তাদের তথা তারা সম্মেলনে লুকিয়ে রাখছে। ফলে ভারত ধনী লোকদের সামনে রেখে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মিটিগেশনের চাপ থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখছে। আবার যখন ফান্ড গঠন করা হবে, তখন দেখা যাবে ভারত সেই ৭০০ মিলিয়ন দরিদ্র লোককে সামনে তুলে এনে ফান্ড থেকে অর্থ দাবি করবে। তাই বাংলাদেশ এখনো নিশ্চিত নয় ফান্ড থেকে কী পরিমাণ আর্থিক সহায়তা পাবে।

আহসান উদ্দিন আহমেদ, পরিচালক, সেন্টার ফর গ্লোবাল চেঞ্জ :

বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় দুই কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। ইতিমধ্যে অনেকেই গৃহহীন হয়ে বাসস্থান পরিবর্তন করেছে, এ ধরনের অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে। কোনো স্থানের জলবায়ু পরিবর্তন বলতে আবহাওয়ার কোনো একটি বিষয়ের ন্যূনতম ৩০ বছরের গড় পরিবর্তন বুঝি। বিগত ৫৮ বছরের ২১টি স্থানের তাপমাত্রার যে হিসেব রয়েছে, তা থেকে আমরা বলতে পারি, শীতের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে এসেছে। আমাদের দেশের জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, ঋতুকাল প্রায় পরিবর্তনীয় রয়েছে। গড় বৃষ্টিপাত অপরিবর্তিত রয়েছে কিন্তু অধিকতর বৃষ্টিপাতবহুল দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতাটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশি দেখা দিচ্ছে। উল্লেখযোগ্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে, বৃষ্টিপাতের আগে যেখানে সমভাবাপন্ন অবস্থাটা ছিল, জুলাইয়ের শেষার্ধে ও আগস্টের প্রধমার্ধে সেটি এখন বিস্তৃত হয়ে জুনের শেষার্ধ থেকে জুলাইয়ের ১০ দিন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আর বাকি বৃষ্টিপাত আগস্টের শেষার্ধে চলে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত নিয়মিতভাবে যে সময়কালে হওয়ার কথা, তা সময়মতো হচ্ছে না। তাই বন্যা যেসময় হওয়ার কথা কিংবা মানুষ যে সময় বন্যা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকেন সেই সময়কাল ব্যাহত হচ্ছে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন– উন্নতজাতের আমন ধান চাষের জন্য ১৫ আগস্টের মধ্যে ছোট চারাগুলো রোপণ করতে হয়ে। কিন্তু বৃষ্টিপাতবহুল দিনের সংখ্যা আগস্ট মাসের শেষার্ধে হয়, পানি নামতে নামতে দেরি হওয়ায় আমন উপযোগী জায়গায় আমন ধান রোপণ সম্ভব হয় না।

তাই এটা আমাদের কৃষি-পরিবেশ ব্যবস্থায় ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেছে। সম্প্রতি অনেকগুলো সাইক্লোন আঘাত হেনেছে। সাইক্লোনগুলোর প্রচণ্ডতার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের উপকূলীয় প্রতিরক্ষা বাঁধগুলোতে সাইক্লোনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধির ফলে শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। লবণাক্ত পানি কৃষিজমিতে প্রবেশ করছে। কৃষি-পরিবেশ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে।

লবণাক্ত পানি যেখানে মিষ্টি বা স্বাদু পানির সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছে, সেখানকার পানির ঘনত্বের পরিবর্তন ঘটে। নদীবক্ষে পলি অধঃক্ষেপণের পরিমাণ বেড়ে যায়। সেখানে নদীর পানি দুই পাড় উপচে পড়ে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করবে। ফলে জলাবদ্ধ এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। ৫০ বছর ধরে সমুদ্রে উপরিতলের গড় তাপমাত্রার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। এতে ঘন ঘন নিম্নচাপের সৃষ্টি হচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিতলের তাপমাত্রার পরিমাণ যত বাড়বে, নিম্নচাপগুলো তত শক্তিশালী হয়ে সাইক্লোনের সৃষ্টি করবে। গত ২০ বছরের আগে বঙ্গোপসাগরে বছরে গড়ে ৫/৬ টার বেশি নিম্নচাপ হত না। এখন সেখানে বছরে গড়ে ১২-১৪ টা নিম্নচাপ দেখা দিচ্ছে। ফলে বর্ষা মৌসুমে গভীর সমুদ্রে মৎস্যজীবীরা বেশি দিন মাছ ধরতে পারছে না। বার বার ঝড়ের সতর্ক সংকেতের কারণে তীরে ফিরে আসতে হচ্ছে। ফলে তাদের পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশের প্রতিটি জেলায় জলবায়ু বিপন্নতা বা ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করে

কৃষি, খাদ্য, স্বাস্থ্য, অবকাঠামোসহ সব বিষয় নিয়ে সরকারকে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করতে হবে বেশি করে। স্থানীয় সমস্যা মোকাবিলার জন্য স্থানীয়দের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। আবহাওয়ার মতো কৃষিক্ষেত্রে পূর্বাভাস ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। পাঠক্রম প্রণয়নের কোনো সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি, আমদের মানবসম্পদকে দক্ষ ও সচেতন করে গড়ে তুলতে না পারলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর যে পরিমাণ গবেষণা তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, সে তুলনায় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তেমন কোনো গবেষণা ফলাফল বের হয়নি। কমিউনিটিভিত্তিক অভিযোগব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী ফসলের বীজ ছড়িয়ে দিতে হবে। উপকূলীয় বাঁধগুলোর উচ্চতা বৃদ্ধি করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে। নতুন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান নির্বাহী, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি : কিয়োটো প্রটোকলে আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে আমেরিকা প্রথম থেকেই চুক্তিবদ্ধ হয়নি। প্রথমে উন্নত দেশগুলো কিয়োটো প্রটোকল চুক্তিতে রাজি না হলেও পরবর্তী সময়ে তারা চুক্তিতে সই করেছে। কিন্তু কিয়োটো প্রটোকল যে উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে, সেটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হয়নি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ এলাকা ডুবে যাবে এবং দুই কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হবে। ফলে বাংলাদেশ যে পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হবে, তা টাকা দিয়ে পোষানো যাবে না। কোপেনহেগেন চুক্তির আট নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, নতুন ও এডিশনাল অর্থাৎ বর্ধিত ফান্ড গঠন করা হবে। ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ৩০ বিলিয়ন ডলার দেওয়া হবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর জন্য। পরবর্তী সময়ে ২০২০ সাল পর্যন্ত উন্নত বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার দেবে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোকে তাদের ফান্ড থেকে। কোপেনহেগেন–১৫ সম্মেলনের ফলে যে দলিল রয়েছে, তাতে কিছু ফাঁক রয়েছে, যা দিয়ে বাংলাদেশের মতো দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষতির সম্মুখীন হবে তা পূরণ করা সম্ভব হবে না। বলা হয়েছিল, যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তারা এর প্রতিরোধ ব্যবস্থায় ভূমিকা পালন করবে। কিন্তু বর্তমানে একটি বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যারা এখন এগিয়ে গেছে অর্থাৎ উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে এবং সামর্থ্য আছে তাদেরও জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধব্যবস্থায় ভূমিকা পালনের জন্য বলা হচ্ছে। এ জন্য জি–৭৭-এর মতো চীন কিংবা ভারতকে নিয়ে নতুন মেরুকরণ দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তারা এগিয়ে আসছে না ভূমিকা পালন করতে। বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের

জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক পর্যায়ে কাজ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানি আমাদের জন্য একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। ভারত, চীন, নেপালকে নিয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে পানি ভাগাভাগির বিষয়টি নির্দিষ্ট করতে হবে। সরকারের পরিবেশগত মূল্যবোধ স্থির করা দরকার। বিদেশি সংস্থাগুলো বলে, বাংলাদেশের শিল্পকারখানাগুলো ঢাকার বুড়িগঙ্গাকে দূষিত করল, সে ক্ষেত্রে সরকার কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারল না আর জলবায়ু পরিবর্তনে উন্নত দেশগুলোকে দায়ী করা হচ্ছে। আগে নিজেদের পরিবেশকে সুন্দর করার চেষ্টা করতে হবে। আইলা-দুর্গত অঞ্চলের মানুষ কিন্তু ভেঙে পড়েছে, সরকারের কাছে তাদের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমরা অভিযোজনের কথা বলছি। মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ কিন্তু অভিযোজন নয়। অর্থের সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

ড. আইনুন নিশাত, জ্যেষ্ঠ জলবায়ু-বিশেষজ্ঞ, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার : কপ-১৫-এর চেয়ারপারসন ছিলেন ডেনমার্কের জলবায়ু ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী, তাকে সরিয়ে দিয়ে সবশেষে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী নিজে দায়িত্ব নেন। ফলে তিনি সঠিকভাবে কোপেনহেগেন সম্মেলনে দিকনির্দেশনা দিতে পারেননি। অন্য দিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা আরেকটি ভুল করেছেন। কোপেনহেগেন সম্মেলনে ১৯২টি দেশকে রাজি হতে হবে যেকোনো চুক্তির জন্য। কিন্তু তিনি প্রথমে সাতটি দেশকে ডেকে বৈঠক করে একটি খসড়া তৈরি করলেন। পরে এই দেশের জলবায়ু প্রশমন খাতে (মিটিগেশন) যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে, তার সঠিক হিসাব থাকার শর্তে বিদেশি দাতা দেশগুলো অর্থ ব্যয় করে। কোপেনহেগেন অ্যাকোর্ডে যে অর্জন হয়েছে, তা হয়েছে প্রতিবাদী এনজিওগুলোর ভূমিকার জন্য। কোপেনহেগেনে আয়োজক ডেনমার্কের মূল প্রতিনিধিত্বকারী নেগোশিয়েটরকে এক মাস আগে চাকরিচ্যুত করা হয়। পরে জলবায়ু ও বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়ার পর তিনি সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতিনিধিত্বশীল ২৫টি দেশকে নিয়ে আরেকটি খসড়া তৈরি করলেন। কিন্তু বিশেষ করে ভারত ও চীন এর বিরোধিতা করল। আবার চারটি দেশ ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিল আলাদা বৈঠক করে আরেকটি খসড়া তৈরি করে। এ রকম চারটি খসড়া মাঝেমধ্যে ছাড়া হত কোপেনহেগেন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্য। ফলে ১৯২টি দেশের অধিকাংশ দেশই এ থেকে বঞ্চিত হয় এবং ভেতরে ভেতরে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। পরবর্তী সময়ে চতুর্থ খসড়াটি চূড়ান্ত করে তা জাতিসংঘে পাঠানো হয়। জাতিসংঘের আইন বিভাগ বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য ১৯২টি দেশকে রাজি করাতে হবে জাতিসংঘের। ফলে কপ-১৫ সম্মেলনে বলা হয়েছে আগামী এক বছরের মধ্যে এটি চূড়ান্ত করার সময় চাওয়া হয়েছে, যা আইনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনা হবে। বছর তিনেক আগে সার্ক পরিবেশ মন্ত্রীদের বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা, তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদান বিষয়ে একটি চুক্তি হয়েছিল। ওই চুক্তিটি বাস্ত

বায়ন করতে হবে। দাতা সংস্থার তহবিল থেকে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা চাওয়ায় পাশাপাশি জলবায়ু প্রশমন খাত (মিটিগেশন) থেকে অর্থ দিয়ে উন্নত প্রযুক্তির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ থেকে অর্থ চাইতে পারে। বাংলাদেশে যেসব পরিকল্পনা করা হয় তা যথোপযুক্ত, সময়োপযোগী, আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত হয় না।

আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশের যথেষ্ট পরিমাণে গবেষণা কেন্দ্র নেই। আমাদের আরও অধিক গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সঠিকভাবে সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কারণ উপকূলীয় অঞ্চল সবচেয়ে বেশি হুমকির সম্মুখীন।

আমরা কোপেনহেগেন সম্মেলন কিংবা অন্য কোনো সম্মেলনে দেখেছি বিশ্বের অন্যান্য দেশে সরকার পরিবর্তিত হলেও বিশেষজ্ঞ অপরিবর্তিত থাকেন। বিভিন্ন সম্মেলনে অংশ নেওয়া সেসব দেশের বিশেষজ্ঞ দলগুলো একই থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিশেষজ্ঞ দলও পরিবর্তিত হয়। ফলে একাধিক সম্মেলনে সঠিকভাবে সমন্বয় করা সম্ভব হয় না। অন্য দিকে রাজনৈতিক ব্যক্তি বা যাঁরা সরকারের পক্ষ থেকে সম্মেলনে নেতৃত্ব দেন, তাঁদের বক্তব্য আগে থেকেই লিখিত থাকে। কিন্তু অনেক সময় সম্মেলনের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। তখন সরকারের রাষ্ট্রদূত, যিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে থাকেন সেখানে তার দায়িত্ব হল সেটা পরিবর্তন করা। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রদূতরা সাঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। বাংলাদেশের মন্ত্রণালয়গুলোকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নির্দিষ্ট দল গঠন করতে হবে, যা সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল হবে না। প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনকে ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মাথায় রেখেই পরিকল্পনা নিতে হবে। রিওতে যে চুক্তি হয়, তাতে অ্যাডাপটেশন ও মিটিগেশন দুটির কথা বলা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের মিটেগেশন ডিজাস্টার মিটিগেশন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ডিজাস্টার মিটিগেশন হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের অ্যাডাপটেশন। মিটিগেশন হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো।

গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর ফলে পরিবেশের যে প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তা মোকাবিলা করা কিংবা খাপ খাওয়ানো হচ্ছে অ্যাডাপটেশন । প্রথমে যে সব দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধি করছে, তা কমানোর জন্য সেসব দেশের ওপর বিশ্বের চাপ বাড়াতে হবে। আইনের বাধ্যবাধকতার মধ্যে কীভাবে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো যায়, সে লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে অন্যান্য দেশ একমত হয়। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে কোপেনহেগেন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো ২০০৫

সাল থেকে কার্যকর ভূমিকা পালন শুরু করে। ১৯৯২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ১৩ বছর সময় লাগল। ফলে অ্যাডাপটেশনটি পিছিয়ে পড়ল। কোপেনহেগেনের অন্যতম অর্জন হল পরবর্তী চুক্তি (এডব্লিউজিএলসিএ), যা খসড়া পর্যায়ে রয়েছে।

অ্যাডাপটেশনকে মোকাবিলার জন্য কাজ করতে হবে। ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) প্রক্রিয়ায় উন্নত দেশগুলো কার্বন উৎপাদন বৃদ্ধি কিছু কমাল। তারা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থ বিনিয়োগ করে গ্রিনহাউস গ্যাস কিছু কমিয়ে ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম), কার্বন ক্রেডিট কিনে নিল।

অ্যাডাপটেশনের জন্য সিডিএম ফান্ডে মোট ৪৫০ মিলিয়ন ডলার জমা করা হয়। আরেকটি বিতর্ক হচ্ছে টাকাটা কিভাবে ব্যয় করা হবে। ফান্ডটি কি বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে খরচ হবে নাকি নিজস্ব ফান্ড গঠন করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ইউরোপে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে বরফ পড়া শুরু হয়ে বেশ কিছুদিন চলছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সারা বিশ্বে পড়ছে। তাই বিশ্ববাসী সতর্ক হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন করার জন্য। আমরা অর্থ ব্যয় করে অবকাঠামো করি, কিন্তু তার সঠিক ব্যবহার ও পরিচর্যা বা দেখভাল করি না। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। ১৯৬৬-৬৮ সালে বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তা দেখভাল কিংবা পুনঃসংস্কার করা হয়নি। ফলে আইলার সময় বাঁধ ভেঙে পানি উপকূলীয় অঞ্চলে ঢুকে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। বাংলাদেশে যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়, তা দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নেওয়া হয় না। আমাদের উচিত, এখন থেকে দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশ-বান্ধব পরিকল্পনা গ্রহণ করে জলবায়ু পরিবর্তন যথাসম্ভব রোধ করা।

দৈনিক প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১০ : সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'কোপেনহেগেন সম্মেলনের পরবর্তী অবস্থা–বাংলাদেশের পরবর্তী করণীয়' ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব ন্যাচারের (আইইউসিএন) এশিয়া অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা ড. আইনুন নিশাত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, শিল্পবিপ্লবের আগের অবস্থার তুলনায় পৃথিবীর তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো বেড়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বাড়লে সেটা ক্ষতিকর হবে, এটাকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রির বেশি বাড়তে দেয়া যাবে না। পৃথিবীর স্বার্থেই এটা করতে হবে। আইনুন নিশাত বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় প্রচুর তহবিল আসবে। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা (বাংলাদেশ) এই তহবিল ব্যবহার করতে পারছি কি না। আমাদের দ্রুত পরিকল্পনা নিতে হবে। আগামী দুই বছরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য ১০ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকা) সহায়তা আসবে। উন্নয়নশীল ও দুর্যোগের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিকবলিত দেশ হিসেবে বাংলাদেশও সহায়তা পাবে। আমাদের এই টাকা ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

জলবায়ু জলবায়ু খেলা : *সাপ্তাহিক, ৬ মে ২০১০ থেকে উদ্ধৃত:* সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তন হতে হতে জলবায়ু আজকের পর্যায়ে এসেছে। তাতে প্রাণের প্রবাহ কিংবা সভ্যতা বিকাশ থেমে থাকেনি। সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায়নি। ভবিষ্যতেও পরিবর্তন হবে। হাজার বছর কিংবা পাঁচশ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা জলবায়ু তখনকার অবস্থায় টেনে রাখার চেষ্টা করেননি। জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে। কিন্তু এই জলবায়ু নিয়ে গত কয়েকবছর ধরে পৃথিবী জুড়ে চলছে ব্যাপক জল্পনাকল্পনা। বের হচ্ছে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র, থিসিস। অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভা, সেমিনার, বিতর্ক। আর সব বিষয়ের মতো জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়েও রয়েছে নানা মত। এর কোনটি সত্য আর কোনটি মিথ্যা তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছে। বেরিয়ে আসছে নানা ধরনের তথ্য।

শুরুটা অনেক আগে থেকেই। তবে পুরো ৭০ দশক জুড়েই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী এবং গণমাধ্যমের প্রচারণায় আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে জলবায়ু। ৭০-এর মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ করেই তাপমাত্রা কমে যেতে থাকে যা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করে। ঐ সময় কিছু গবেষণায় দাবি করা হয় যে, তাপমাত্রা আরো কমে যেতে পারে। আবার অন্যদিকে কিছু গবেষণায় দাবি করা হয় অধিক হারে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কারণে তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে। অর্থাৎ একই সঙ্গে উষ্ণতা বৃদ্ধি এবং কমে যাওয়ার প্রভাব বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল তখন।

এর সঙ্গে তখন নতুন যে বিষয়গুলো আলোচনায় আসে তা হল, বিভিন্ন দেশে প্রান্তীয় বনাঞ্চল কমে যাওয়া, এ্যাসিড বৃষ্টি এবং ওজোনস্তরে ছিদ্র তৈরি হওয়া যার ফলে ১৯৮৭ সালে মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৮৮ সালে জলবায়ু পরিবর্তনের বিতর্কে ঘৃতাহুতি দেন নাসার বিজ্ঞানী জেমস হ্যানসেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন– বাজে কথা বলা বন্ধ করে একথা লিখুন যে, গ্রিনহাউস প্রভাবই দায়ী, কারণ এর সপক্ষে শক্তিশালী সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে। ইন্টার গভর্নমেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) বা জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল ৮৮-তে জন্মলাভ করলেও এর জন্মপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা নিয়ে আয়োজিত '৮৫ সালের এক কর্মশালায়। সেখানে বিজ্ঞানীরা তাপমাত্রা বৃদ্ধির ব্যাপারে একমত হবার ফলে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে খাপ খাওয়ানোর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পাটাতনের (প্লাটফর্মের) প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৮৮ সালের পর থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি আঙ্গিকগত দিক থেকে এবং প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে ভিন্নমাত্রা লাভ করে। জলবায়ু পরিবর্তনকে বিভিন্ন এনজিও তাদের প্রচারণায় শীর্ষে নিয়ে আসে। তবে একইসঙ্গে লক্ষণীয়ভাবে অন্য আরেকটি সংঘবদ্ধ গোষ্ঠী তৈরি হয় যারা এর বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন কোয়ালিশন (জিসিসিসি) নামে এই গোষ্ঠী কিয়োটো প্রটোকলের বিরোধিতা করে। কিন্তু একের পর এক ১৯৯০, ১৯৯৫ এবং ২০০১ পর্যন্ত আইপিসিসি'র তিনটি মূল্যায়ন রিপোর্টেই ক্রমবর্ধমান হারে

জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষের ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে জিসিসিসি'র মাঝে ভাঙ্গনের সুর দেখা দেয়। ১৯৯৭ সালে বিপি (বৃটিশ পেট্রোলিয়াম) এবং পরবর্তীতে শেল (১৯৯৮), ফোর্ড (১৯৯৯) এবং ক্রমান্বয়ে টেক্সাকো, ডেইমলার-ক্রাইসলার ইত্যাদি কোম্পানি জিসিসিসি ছেড়ে যায়। ২০০১ সালে আইপিসিসির তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্ট প্রকাশের ফলশ্রুতিতেই ২০০২ সালের গোড়ার দিকে জিসিসিসি ভেঙে যায়।

উল্লেখ্য জলবায়ু পরিবর্তন বিতর্কের প্রভাব এ সময় এতটাই ব্যাপকতা লাভ করে যে, চলচ্চিত্র ও গল্প-উপন্যাসেও তা ফুটে ওঠে। ২০০৪ সালে মুক্তি পায় 'দ্য ডে আফটার টু'মরো' নামের একটি ছবি, যাতে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। ২০০৪ সালের মাইকেল কার্কটনের' স্টেট অব ফিয়ার' নামে একটি রোমাঞ্চ উপন্যাস তুমুল সাড়া ফেলে দেয়, যেটিতে মূল বক্তব্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সবকিছুই একটি ষড়যন্ত্র। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ টিভি চ্যানেল ফোর-এ একটি প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। এর প্রথম ৭০ সেকেন্ডে বলা হয়েছে 'বরফ গলে যাচ্ছে, সমুদ্র ফুঁসে উঠছে, হারিকেন তীব্র হচ্ছে এবং এটা আপনার দোষেই হচ্ছে।' ভয় পাচ্ছেন? ভীত হবেন না, কারণ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

২০০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনার আঘাতে আবার জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা তুঙ্গে ওঠে। তখন টাইম, দ্য ইস্টার্ন রিভিউ, বিজনেস উইক, অবজারভার ইত্যাদি পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে বিভিন্ন বিশ্লেষণধর্মী লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। ২০০৬ সালে মুক্তি পায় 'এন ইনকনভিনিয়েন্ট ট্রুথ', যার কারণে আল গোর ২০০৮ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। অতঃপর ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় আইপিসিসি ৪র্থ মূল্যায়ন রিপোর্টের। এ প্রতিবেদনে স্পষ্ট করেই ঘোষণা করা হয় যে, মানব-কর্মকাণ্ডই বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য ৯০ শতাংশেরও বেশি দায়ী। ২০০৭-এ ডাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের আলোচানায় জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক হয়। প্রেসিডেন্ট বুশ ঘোষণা দেন, যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি 'চরম সমস্যা' হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিতর্কের বিষয়বস্তুও বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হতে দেখা গেছে। যেমন, এক সময় বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে আদৌ জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। এরপর বিতর্ক সরে এসেছে কিভাবে এর সমাধান করা যায়। এখন এই বিতর্কের বিষয়বস্তু হচ্ছে এটা কোনো প্রোপাগান্ডা কিনা।

বেশ কিছুকাল যাবত বিশ্ববাসী শুনে আসছে, পৃথিবী গ্রিনহাউসের প্রভাবে প্রতিনিয়ত উষ্ণ হচ্ছে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা গত শতাব্দীতে ০.৭ সেলসিয়াস বেড়েছে এবং বার্ষিক গড় তাপমাত্রা গত ৫০০-১০০০ বছরের যেকোনো গড়ের চেয়ে বেশি। তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ– হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের বৃদ্ধি (কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড এবং ক্লোরোফ্লুরো কার্বন) যেগুলো মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলেই তৈরি হচ্ছে। বিংশ শতাব্দীতে শক্তি ব্যবহার ১০ গুণ বেড়েছে যা জনসংখ্যার বৃদ্ধির চেয়ে বেশি এবং প্রায় ৭শ কোটি টন কার্বন

বাতাসে নিঃসৃত হয়েছে– যার ৮০ শতাংশই হয়েছে খনিজ তৈল এবং কয়লা ব্যবহারের কারণে। তাপমাত্রা বৃদ্ধিও এসব কারণে অব্যাহত থাকবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এর ফলে অন্যান্য পরিবর্তনের প্রভাব পরবর্তী সময়গুলোতে ক্রমশ বেশি করে পড়তে থাকবে। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর ব্যাপারে এবং তাপমাত্রা যা বেড়েছে তা স্থিতিশীল করার জন্যে এখনই দ্রুত বৈশ্বিক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নিয়ে তাই গোটা বিশ্ব তটস্থ। চারিদিকে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। গত ডিসেম্বরে কোপেনহেগেন বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে গোটা বিশ্বের মনোযোগ কেড়েছিল। বিশ্বের তাবৎ সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানেরা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবে ভেবে ২০০৯-এর ডিসেম্বর মাস জুড়েই কাটিয়েছেন কিছু নির্ঘুম রাত এবং চিন্তিত দিন। পরিবেশবাদীরা উৎকণ্ঠার সাথে অপেক্ষা করেছেন জলবায়ু সম্মেলনের সিদ্ধান্তের জন্য। জাতিসংঘের উদ্যোগে আয়োজিত ২০০৯ সালের ১৮ ডিসেম্বরে শেষ হওয়া এ সম্মেলনে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারের সম্মুখে প্রায় প্রতিদিনই বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের হাতকড়া পরিয়ে বসিয়ে রাখার ছবিও ছাপা হয়েছে পত্রপত্রিকায়। সম্ভবত ২০০৯ সালে কোথাও এতবড় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বের ১৯৩টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রায় ৪৫ হাজার প্রতিনিধি (সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে) এ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল। বাংলাদেশের মতো একটি গরিব দেশ, যেখানে ঘূর্ণিঝড়-আইলার আঘাতের ৬ মাস পর হাজার হাজার মানুষ এখনও বেঁড়িবাধের উপর বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রী ৯২ জন প্রতিনিধি নিয়ে এ সম্মেলনে অংশ নিয়েছিলেন। আর বেসরকারি পর্যায়ে কোপেনহেগেনে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের আরো প্রায় তিনশ প্রতিনিধি। এমনকি বেশকটি সংবাদপত্রও তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিদের সেখানে পাঠিয়েছে। বাংলাদেশ এ সম্মেলনকে যে কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছিল এটা তার বড় প্রমাণ।

কিন্তু এত গুরুত্ব আরোপের ফলাফলটা কী হল? বিশ্বজুড়ে এখন বিতর্ক চলছে জলবায়ু পরিবর্তনের সত্যিকার প্রভাব নিয়ে। অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উন্নত বিশ্বকে দায়ী করে মোটা অংকের ক্ষতিপূরণ দাবি করে বসে আছে। সত্য কি জানলেও কেউ মুখ খুলছে না সাহায্য পাবার কথা ভেবে। অনেকেই এখন মানছেন যে, জলবায়ু যে পরিবর্তিত হচ্ছে এ বিষয়ে সবাইকে একমত হতে বাধ্য করা হয়েছে। দেশে দেশে অতিরিক্ত শীত কিংবা গরমের প্রকোপ, বন্যা, অতিবৃষ্টি এর প্রভাবে হচ্ছে বলে যে প্রচার তা আসলে উদ্দেশ্যমূলক।

অনেক বিজ্ঞানী নিজেদের মতো করে তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে আলোচনা, এর কোনো ভিত্তি নেই। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন স্টিভ ম্যাককেইন। তিনি তার উপস্থাপিত তত্ত্বে বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে যেসব তত্ত্ব বিশ্ববাসীকে জানানো হয়েছে, তা পৃথিবীর সাধারণ প্রক্রিয়া। এটা অনেকটা একটা পদার্থের জীবনচক্রের

মতো। এ ছাড়া তিনি উত্তর গোলার্ধের বরফ গলে যাওয়ার তত্ত্বেও শঙ্কিত হওয়ার মতো কিছু নেই বলে জানিয়েছেন। ২০০৮ সালের এপ্রিলে একটি জনমত জরিপে দেখা যায় শতকরা ৩৪ শতাংশ মার্কিনি বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন একটি সাধারণ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া। এই সংখ্যা নিঃসন্দেহে এখন কয়েকগুণ বেড়েছে।

এখন দেখা যাক কী বলছেন এই নব্য জলবায়ু পরিবর্তনবিরোধীরা। জাতিসংঘের আইপিসিসির ৯৯৮ পৃষ্ঠার চতুর্থ এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের দশম অধ্যায়টির মূল কথা ছিল, বিশ্বের যে কোনো অংশের তুলনায় হিমালয়ের হিমবাহ গলছে দ্রুতগতিতে। হিমবাহ গলার হার অপরিবর্তিত থাকলে ২০৩৫ সালের মধ্যে সকল হিমবাহ গলে যাবে। এমনকি তার আগেও গলে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করেছিল যে, সত্যিই বোধ হয় বাংলাদেশের বিরাট অংশ অদূর ভবিষ্যতে পানির নিচে তলিয়ে যাবে। এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতেই ভবিষ্যদ্বাণী করা শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ আরো কয়েকটি দ্বীপরাষ্ট্র পানির নিচে তলিয়ে যাবে।

কিন্তু ক'দিন বাদেই বেরিয়ে এসেছে থলের বিড়াল। সিআরইউ-এর সার্ভার থেকে চুরি হওয়া ই-মেইল থেকে বিশ্ববাসী জানতে পেরেছে যে, আইপিসিসি'র বিজ্ঞানীদের 'সুচতুর' হবার পরামর্শ দিয়ে তাপমাত্রা 'কমে যাবার' রেকর্ডগুলো বাদ দিয়ে গ্রাফ তৈরি করতে বলা হয়েছিল– যাতে তাপমাত্রার রেখাটি উর্ধ্বমুখী হয় তার পরামর্শ দেয়া হয়েছিল। আইপিসিসি উষ্ণতার যে গ্রাফ তৈরি করেছিল তাতে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তাপমাত্রা 'ক্রমাগত বৃদ্ধি' দেখাতে পেরেছিল। কিন্তু ১৯৬১ সালের পর থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করে। তাপমাত্রা গ্রাফের রেখাটি তখন নিম্নমুখী হওয়া শুরু করে। এই রেখাটি তখন সেখানেই থামিয়ে দিয়ে কৌশলে আরো কিছু রেখার আড়ালে ঢেকে ফেলা হয়। নতুন রেখা দিয়ে আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি দেখানো শুরু হয়। এই গ্রাফটিও হ্যাকাররা চুরি করে এনেছে। ১৯৬১ সালের পর থেকে তাপমাত্রা কমে যাবার বিষয়টি আইপিসিসির তৃতীয় এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে গোপন করা হয়। ফাঁস হওয়া আরেকটি ই-মেইল থেকে জানা যায়, ২০০৫ সালে ফিল জোনস নামে একজন বিজ্ঞানী তাঁর অধঃস্তন এক জলবায়ু বিজ্ঞানীকে ই-মেইলে লিখেছিলেন, 'তাপমাত্রার রেকর্ডগুলো সার্চযোগ্য ওয়েবসাইটে দিবেন না। কে কোথা থেকে কে সার্চ দিয়ে বের করে ফেলবে তার ঠিক আছে?' ১৯৯৯ সালের ১৬ নভেম্বর ফিল জোনস তার সহকর্মীদের একটি ই-মেইল করেন যাতে 'তাপমাত্রা কমে যাবার রেকর্ডগুলো সুচতুরভাবে লুকাতে পারার' জন্য তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। অন্যান্য ই-মেইলের সঙ্গে এটিও হ্যাকাররা বের করে এনেছে। তবে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হবার পর ফিল জোনস পদত্যাগ করেছেন। কেলেঙ্কারি ফাঁস হবার পর তিনি লজ্জায় অপমানে আত্মহত্যার চিন্তা করেছিলেন বলে নিজেই সাংবাদিকদের জানিয়েছেন।

২০৩৫ সালের ডেডলাইনের মিথ্যাচারিতা ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। এই ডেডলাইনের 'জন্মদাতা' ভারতীয় বিজ্ঞানী ড. সৈয়দ ইকবাল হাসনাইন। গত ১৯

জানুয়ারি ভারতসহ কয়েকটি দেশের নামকরা পত্রিকায় তার সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। পত্রিকাগুলোর কাছে ড. হাসনাইন বেমালুম অস্বীকার করেছেন এমন ভবিষ্যদ্বাণীর কথা। তিনি বলেন, '১৯৯৯ সালে নিউ সায়েন্টিস্ট ম্যাগাজিনের সাংবাদিক ফ্রেন্ড পিয়ার্স একটি রিপোর্টের জন্য হিমালয়ের হিমবাহ সম্পর্কে আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমার এ কথা স্পষ্ট মনে আছে আমি বলেছিলাম, আগামী ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় এবং মধ্য হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহের 'পুরুত্ব কিছুটা কমে যেতে পারে'। আমার কথাকে ওই ম্যাগাজিনে ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, আমার কথার মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে কিংবা সকল হিমবাহ গলে যাবে এমন একটা কথাও ছিল না।'

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত কথাটি হচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি। শিল্পকারখানা বৃদ্ধির কারণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাড়ছে। একই সঙ্গে বাড়ছে বিশ্বের তাপমাত্রা। কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে প্রতিবছর পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ছে বলে যে দাবি করা হয়েছিল সেটা আসলে সঠিক নয়। জানা গেছে, শিল্প-কারখানার কার্বন দূষণের ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধির গল্প তারা ইচ্ছা করেই তৈরি করেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধির এবং কমে যাওয়ার নজির আছে। আধুনিক যুগ ও শিল্পায়ন শুরু হবার পর থেকে একটানা তাপমাত্রা বেড়েছে বলে আইপিসিসি দেখানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু এটি সর্বাংশে মিথ্যা। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা'র বিজ্ঞানী ডেভিড রিন্ড বলেন, পৃথিবীর বুকে তাপমাত্রা কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের আশপাশের বছরগুলোতেও এখনকার মতো তাপমাত্রা ছিল। তাই ধারণা করা হয় প্রাকৃতিক নিয়মেই তাপমাত্রা ওঠানামা করে। আইপিসিসি'র জন্য সবচেয়ে ঝামেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে মধ্যযুগটা। কারণ ওই সময়ের কোনো কোনো বছর এখনকার চেয়েও উষ্ণ ছিল! যে সময় পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণকারী কোনো যানবাহন কিংবা কল-কারখানা ছিল না, তখন কেন তাপমাত্রা বাড়ল–এই ব্যাখ্যা দেওয়ার ভয়ে সিআরইউ অনেক কিছু লুকানোর চেষ্টা করেছেন।

জলবায়ু নিয়ে বাংলাদেশের গবেষকরা বসেছিলেন না। ড. আতিক রহমান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্স স্টাডিজ জলবায়ু নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। জলবায়ু নিয়ে গবেষণাপত্র প্রকাশ করে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আন্তঃসরকার প্যানেল (আইপিসিসি) যে নোবেল পদক পেয়েছিল তিনিও তার অংশীদার। কারণ সেই গবেষণাপত্রের তিনি ও তার প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করেছেন। তখন তাঁর ভাষ্য ছিল একরকম। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখনকার ভাষ্য অন্যরকম। বলা যায় এখন তাদের মুখ অনেকটা বন্ধ। 'প্রথম আলো'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে আইপিসিসি'র সদস্য বাংলাদেশী গবেষক আতিক রহমান তখন বলেছিলেন, 'ছোট দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল এবং শুষ্কায়িত অঞ্চল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন মালদ্বীপ। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে মালদ্বীপ ডুবেই যাবে।' তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের সমুদ্রের উচ্চতা বাড়বে।' আইপিসিসি বলেছে, ১০০ বছরের

মধ্যে অর্থাৎ ২১০০ সাল নাগাদ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে ৮৬ সেন্টিমিটার অর্থাৎ ৩৩.৮ ইঞ্চি। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু দ্রুততরভাবে গলছে। অঙ্কে যে গতিতে বরফ গলবে ধরা হয়েছিল, তার চেয়েও অনেক বেশি দ্রুততর বেগে গলছে। হিমালয়ের মতো পর্বতমালাও গলছে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এক মিটার বা ৩৯.৩৭ ইঞ্চি হয়ে যেতে পারে। ২১০০ সালের অনেক আগেই, ৫০ বছরের মধ্যে এক মিটার বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ জমি লবণাক্ত পানি দ্বারা আবিষ্ট হয়ে যাবে। এতে ১৩ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার পরিমাণ প্রায় ২ কোটি। পানির নিচে ডুবে গেলে তাদের কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু ক'দিন বাদেই ২৩ এপ্রিল ২০১০ দৈনিক প্রথম আলো 'বাংলাদেশ ডুববে না' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, দক্ষিণাঞ্চল ধীরে ধীরে পানির নিচে যাবার কারণে বাংলাদেশের আয়তন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে এমন দাবি করেছিল আইপিসিসি। কিন্তু আসল ঘটনা হল বাংলাদেশের জমি দিন দিন বাড়ছে। ঐ প্রতিবেদনের এক অংশে দেখা যায়, আতিক রহমান এ ব্যাপারে বলেছেন 'বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে এর আগে পলি-ব্যবস্থাপনা তেমন গুরুত্ব পায়নি।'

হিমালয়ের হিমবাহ ২০৩৫ সালের মধ্যে গলে যাবার ব্যাপারে আইপিসিসি'র ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক অবিশ্বাস ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি নিয়ে যে তথ্য দিয়েছে সেটিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আইপিসিসিকে তাপমাত্রা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সি.আর.ইউ-এর প্রধান ফিল জোনস অনেক আগেই পদত্যাগ করেছেন। পদত্যাগের পর পূর্বের অবস্থান থেকে সরে গিয়ে বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জোনস বলেছিলেন, গত ১৫ বছর ধরে বিশ্ব-তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়নি। সত্য লুকানোর চেষ্টা ও মিথ্যা তথ্য দেয়ার অভিযোগে আইপিসিসি'র শীর্ষ পদে আসীন সবার পদত্যাগের দাবি এখন উঠেছে। মানুষ এখন জলবায়ুর পরিবর্তন প্রশ্নে বিভ্রান্ত। কিন্তু এই 'জলবায়ু জলবায়ু খেলা' কবে শেষ হবে তা এখনো কেউ বলতে পারছে না।

[লেখক : আহ্বায়ক, তেল-গ্যাস খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি। পেশায় প্রকৌশলী]

প্র ব ন্ধ

জলবায়ুর পরিবর্তন বা দুনিয়া গরম হয়ে যাবার রাজনীতি

ফ র হা দ ম জ হা র

দুনিয়া গরম হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাপার নিয়ে ধনী দেশগুলোর চিন্তার অন্ত নাই। তাদের বিজ্ঞানীরা বলছে আকাশ ফুটা হয়ে যাচ্ছে। 'ওজোন স্তর' নামের একটা ব্যাপার আছে– 'ওজোন' নামক একটি গ্যাসের স্তর– যা চাদরের মতো দুনিয়াকে ঢেকে রাখে বলে সূর্যের আলোয় পৃথিবী গরম হয়ে উঠতে পারে না। সূর্যের আলোর মধ্যে আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মির ৯৭ থেকে ৯৯ ভাগ ওজোন স্তর আটকিয়ে দেয়। যদি তারা সরাসরি পৃথিবী অবধি আসতে পারতো তাহলে পৃথিবীর খুবই ক্ষতি হোত। বিশেষত, বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রাণের ক্ষতি হোত খুব। কী মাত্রায় কতোটা ক্ষতি হোত সেই সব টেকনিকাল বিষয় নিয়ে তর্কবির্তকের শেষ নাই। তবে একটা কথা সত্যি, সাদা চামড়ার মানুষ যখন শুনল যে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির কারণে তাদের ফর্শা চামড়ার ক্যান্সার হতে পারে তখনই, বাপরে বাপ– হৈ চৈ বেধে গেল। নিজের ক্ষতি না হয়ে অন্য প্রাণের, অন্যান্য জীবের এমনকি অন্য রঙের মানুষদের কী হয় না হয়– তারা জাহান্নামে গেল কি দোজখে, তাতে কারো বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। চামড়ার ক্যান্সার হতে পারে, এটা শুনে বলাবাহুল্য ধনী দেশের মানুষগুলো ওজোন স্তর নিয়ে অতিশয় ভাবিত হওয়া শুরু করল।

ওজোন স্তর ফুটা হয়ে যাচ্ছে, এই কাহিনী বেশ পুরানা। আমরা যারা প্রাণ ও পরিবেশ নিয়ে দেশে বিদেশে খানিক কাজ করি তারা এই বিষয়টাকে খানিক সত্য, খানিক গুজব খানিক ধনী দেশগুলোর শয়তানি বলে উপেক্ষা করেছি। তবে শিল্পসভ্যতা ও 'আধুনিক' জীবনযাপনই ওজোন স্তর ফুটা হওয়া বা আকাশ ফুটা হবার প্রধান কারণ এই ব্যাপারে কারো কখনই কোনো সন্দেহ ছিল না। আকাশ ফুটা অর্থাৎ ওজোন স্তর ফুটা করে দেয় এমন গ্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে কার্বন ডাই আক্সাইড, মিথেন, সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, ইত্যাদি। কার্বন ডাই অক্সাইড শহর বা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার কুফল। অর্থাৎ আপনি আধুনিক শহর বা লোহালক্কড়, ইটপাথরের জীবন চাইবেন, গাড়ি চালাবেন চার-পাঁচটা– কিন্তু আশা করবেন প্রকৃতি আগের মতোই প্রাণরক্ষা ও বিকাশে সমান ভূমিকা রাখবে। তা হয় না। 'আধুনিকতা' মানেই আকাশ ফুটা করা,

আলট্রাভায়োলেট তেজে চামড়ার ক্যান্সার হওয়া, সর্বোপরি আবহাওয়ার পরিবর্তন ও পরিণতিতে ভয়াবহ বিপর্যয়। আকাশ ফুটা করার মতো জীবনযাপন করলে আকাশ ফুটা হবে না– এটা কি হয়? তেমনি আপনি ঠাণ্ডা পানি খেতে চান, ঘরে তিন-চারটা করে ফ্রিজ রাখবেন আর সেই ফ্রিজে ব্যবহার করবেন সিএফসি– তারপর আশা করবেন ওজোন স্তরে কোনো ক্ষতি হবে না– এটা হয় না।

কিন্তু ধনী দেশগুলো তাদের আত্মসমালোচনা করলো না। এমনকি তাদের জীবনযাপনে কোনো পরিবর্তন আনবার কথা একবারও ভাবল না। উল্টা তারা বলা শুরু করল গরিব দেশের কৃষক তাদের খাদ্য জোগাবার জন্য যে চাষাবাদ করে সেই কৃষিক্ষেত্রই নাকি মিথেন গ্যাস নামক একটি 'গ্রিনহাউস' গ্যাস উদ্‌গীরণের প্রধান কারণ। এখন কী করতে হবে? তাদের মিথেন গ্যাস কমাতে হবে। তার মানে কী? চাষাবাদ ছেড়ে দাও। গরুছাগল রাখা চলবে না। যদি কৃষিকাজ এবং কৃষিজীবনই ওজোন স্তর ফুটার প্রধান কারণ হয় তালে এটাই তো সিদ্ধান্ত। তখন প্রশ্ন উঠল গরিব মানুষ খাবে কী? তাছাড়া দুনিয়ার সবার জন্যই তো খাদ্য দরকার হবে? ধনী দেশগুলো উত্তর দিল– আমরা 'আধুনিক' পদ্ধতিতে খাদ্য উৎপাদন করব। কৃষি ও কৃষিব্যবস্থা ভেঙে দাও। সেখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুড প্রোডাকশান করুক বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। তৃতীয় দেশকে সেই খাদ্য কিনে নিতে হবে। কিন্তু কৃষিজমি থেকে গরুছাগল পোষার কারণে যে মিথেন গ্যাস হয় সেটা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। যাঁরা পাগল নন, কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাঁরা প্রশ্ন তুললেন, কোম্পানি প্রথমত বিনা পয়সায় মানুষদের খাদ্য দেবে না, তাছাড়া প্রকৃতি থেকে মানুষ যেভাবে নিজেরা খাদ্য উৎপাদন করছে– তাদেরই জীবন ধ্বংস করবার কথা বলা হচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর অছিলায়। ধনী দেশগুলো স্বীকার করলো আসলে তাই– আমরা এতো কালো বাদামি হলুদ বোঁচাওঁচা নাকওয়ালা মানুষজন দুনিয়াতে থাকুক চাই না। কিন্তু মানুষকে তো মেরে ফেলা যায় না। তখন বলা হোল অবশ্যই পারা যায়, কেন যাবে না? এই ধরনের কালো-বাদামি-হলুদ মানুষ যেন গর্ভে আসতে না পারে তার ব্যবস্থা করো। আছেই তো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ– অর্থাৎ গর্ভে আসার আগেই এমনকি ভ্রূণ আসার পরেও মানুষ হত্যার পরিকল্পনা। সেটা করো। তোমাদের সরকারগুলো তো খাওয়াতে পারবে না তাই সোৎসাহে আমাদের কথা মতো মেয়েদের পেটে আই ইউ ডি ঢুকিয়ে, বড়ি খাইয়ে, ডিপো প্রভেরা-নরপ্লান্ট ইঞ্জেকশান দিয়ে মানুষ মারছে। আমাদের ব্যবসাও হচ্ছে। কালো-বাদামি-হলুদ মানুষের সংখ্যা কমাও। জনসংখ্যা কর্মসূচি জোরদার করো। কালোবাদামি মানুষগুলো কমলে জমিগুলো আমরা সাদা মানুষরা আমাদের কাজে ব্যবহার করতে পারব।

গরিব দেশের গণমানুষের বিরুদ্ধে এই বর্ণবাদী রাজনীতি যখন আকাশ ফুটা হয়ে যাবার কেচ্ছার যোগ করে প্রচার শুরু হোল, বলাবাহুল্য, আমাদের মতো ত্যাড়া ধাঁচের লোকজনও পাল্টা প্রচারণা আরম্ভ করতে বাধ্য হোল। তাদের সঙ্গে যুক্ত হলো, ধনী দেশের সেই সব 'সাদা' মানুষ যাঁরা ঘোরতর ভাবে বর্ণবাদ বিরোধী। রক্ত বর্ণ দেশ

জাতের ঊর্ধ্বে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনে বিশ্বাসী। সাদা কালো বাদামি হলুদ রঙধনুর প্রতিবাদ, পাল্টা প্রচার শুরু হোল। পুরা আশির দশকই এই বিরোধিতায় কমবেশি উত্তাল ছিল। এটা পরিষ্কার হয়ে গেল ধনী দেশগুলো তাদের জীবনব্যবস্থা পাল্টাতে চায় না, উল্টা তৃতীয় বিশ্বের মানুষ ধ্বংস করতে চায়– তাদের কারণে বায়ুমণ্ডলে যে ক্ষতি হচ্ছে তার দোষ গরিব কৃষিপ্রধান দেশের ওপর চাপিয়ে দিতে চাইছে তারা। এই প্রচারণায় আমাদের অনেকেরই বন্ধু অনিল আগরওয়ালের নাম না নিলে অবিচার হবে। দুর্ভাগ্য অনিল ক্যান্সারে মারা গিয়েছেন কয়েক বছর আগে। কিন্তু গ্রিনহাউস গ্যাস প্রশ্নে শিল্পোন্নত দেশের পরিবেশ ও প্রাণধ্বংসকারী জীবনব্যবস্থার বিপরীতে কৃষিপ্রধান সমাজের পরিবেশ ও প্রাণরক্ষাকারী জীবনব্যবস্থা ও জীবনযাপনের স্বার্থের পার্থক্য বুঝিয়ে দেবার ক্ষেত্রে অনিল আগরওয়ালের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

জর্জ বুশ অবশ্য নিজেই এই কথা আত্মম্ভরিতার সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছেন। বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের জীবনব্যবস্থা নিয়ে কোনো প্রকার দর কষাকষি চলবে না। অর্থাৎ আমরা আমাদের জীবনযাপনের কিছুই বদলাব না। কিন্তু কৃষিপ্রধান গরিব দেশের মানুষকেই ধনীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের জীবনে আমূল বদল ঘটাতে হবে। গ্রিন হাউস গ্যাস কেন্দ্র করে পরিবেশ-পাপী শিল্পসর্বস্ব দেশের সঙ্গে এবং প্রাণ ও পরিবেশ লালনকারী উন্নত জীবনব্যবস্থার সঙ্গে এখানেই প্রবল রাজনৈতিক বিরোধের জায়গা। এই দিকটা যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে ধনী দেশগুলো জলবায়ুর পরিবর্তনের জন্য যে হাঁকডাক করছে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চিৎকারের মর্ম আমরা ধরতে পারব না। গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর একটা বড়ো পদক্ষেপ হতে পারে দুনিয়াকে আবার সবুজ করা। অর্থাৎ যতো ভূপৃষ্ঠ সবুজ থাকবে ততোই গাছপালা গ্রিনহাউস গ্যাস– যেমন, কার্বন ডাই আক্সাইড শুষে নিতে পারবে। এই ধরনের 'সবুজ'-কে বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন 'কার্বন সিংক' বা কার্বন শুষে নেবার ডোবা। এখন 'কার্বন সিংক' নিয়ে ধনী দেশগুলোর অবস্থান হচ্ছে যদি তারা তাদের নিজেদের জীবনব্যবস্থা না বদলিয়ে অন্য দেশ বা অন্যদের জায়গায় গাছপালা লাগাতে পারে– অর্থাৎ নিজের দেশে কিছু না করে অন্য দেশকে ভূপৃষ্ঠ 'সবুজ' করার দায় গছিয়ে দিতে পারে তাহলে এখন তারা পৃথিবীর যে দূষণ ঘটাচ্ছে সেই মাত্রায় তা চালিয়ে যেতে পারবে। একটি দেশের গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা যতোটুকু ছাড়িয়ে গেছে তাকে কমানোর পদক্ষেপ নিজ দেশে না নিয়ে অন্য দেশে কমানোর জন্য বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের প্রস্তাব ও পদক্ষেপ নিল তারা। এর নাম দেওয়া হোল 'কার্বন ট্রেড' বা কার্বন বাণিজ্য। এই বাণিজ্যের 'পণ্য' হচ্ছে পৃথিবী দূষিত করবার অধিকার ক্রয়। বিচিত্র ব্যাপার!

সেটা কেমন? যেমন পৃথিবীকে দূষিত করবার বা গ্রিনহাউস গ্যাস তৈরির মাত্রা বাংলাদেশে খুবই কম। কারণ, আমাদের যে জীবনব্যবস্থা তাতে পৃথিবী দূষণ করার ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা কম। যে-মাত্রায় বাংলাদেশ আকাশ ফুটা করবার গ্যাস কম ছাড়ছে সেই পরিমাণ পৃথিবী দূষণ করবার মাত্রা অন্য দেশের কাছে বাংলাদেশ বিক্রি

করতে পারে। সেটা ধনী দেশগুলো কিনে নেবে। যেহেতু বাংলাদেশ আকাশ ফুটা করা গ্যাস কম করে, অতএব তারা 'বাংলাদেশের দূষণের বরাদ্দ' ব্যবহার করে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে দূষিত করে যেতে পারবে। এই হোল কার্বন ট্রেড বা দুনিয়া দূষণ করবার বাণিজ্য।

তাহলে দেখা যাচ্ছে আকাশ ফুটা হয়ে যাচ্ছে এই চিৎকার ধনী দেশগুলো থেকে বিশাল শব্দে প্রকম্পিত করে তোলা সত্ত্বেও ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো নিজেদের জীবনযাত্রায় বা তাদের নগরায়ন ও জীবন পরিকল্পনায় গ্রিন হাউস গ্যাস কমাবার মতো কোনো উদ্যোগ নিতে চায় না। এই ধরনের ক্ষীণ যে উদ্যোগ 'কিয়োটো প্রটোকল' নামে গ্রহণ করা হয়েছে তা এতোই দুর্বল যে পরিবেশবাদীরা এটা থাকা না থাকা সমান বলে মনে করেন। বিশেষত যখন দুনিয়া দূষণকারী প্রধান অপরাধী যুক্তরাষ্ট্রই এই প্রটোকলে স্বাক্ষর করেনি।

পৃথিবীর তাপমাত্রা যদি বাড়ে তাহলে বিজ্ঞানীরা বলছেন মেরু অঞ্চলে তুষার বেশি বেশি গলবে এবং সমুদ্রের পানি বেড়ে গিয়ে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো প্লাবিত হয়ে যাবে। বাংলাদেশ নদনদীর দেশ, বঙ্গোপসাগরের মেয়ে বলা যায় বাংলাদেশকে, এই সাগর ছাড়া বাংলাদেশকে কল্পনাই করা যায় না। তাছাড়া পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা মিলে তিন স্রোতধারার যে মিলন ঘটিয়েছে বাংলাদেশে ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে তা অসাধারণ। বাংলাদেশ আসলেই পানির দেশ। যদি মেরু অঞ্চলের তুষার গলে সমুদ্রের পানি বাড়ে তাহলে লবণ-পানি এই দেশকে প্লাবিত করবে। সেটা হবে ভয়াবহ বিপর্যয়। এই কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে দেশে-বিদেশে যে সব কথাবার্তা হচ্ছে বাংলাদেশের নাম আসছে সেখানে বারবারই। ঠিকই, বাংলাদেশের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া ভয়ানক বিপদেরই কারণ হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ যে বিপর্যয় ভোগ করবে তার জন্য তারা দায়ী নয়, দায়ী শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলো। যে কারণে তারা বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস যোগ করছে তাদেরই উচিত সেই কারণ দূর করা। তাকে অবিলম্বে কমানো। কিন্তু তারা তা করতে রাজি নয়। আর এখানেই হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল কথা। ধনী দেশগুলো বাংলাদেশকে অর্থ ঋণ দিতে চায় যাতে উপকূলের মানুষগুলো এই ধরনের বিপর্যয় দাতাদের ভাষায় 'ধফধঢ়ঃ' করতে পারে। তার মানে বিপর্যয়ের মধ্যে তারা বসবাস করতে পারে। বিপর্যয় তৈরির কারণ যারা তারাই আবার এই বিপর্যয়ে বাংলাদেশের মানুষকে ঋণ দিয়ে উল্টা ব্যবসা করে নিতে চাইছে। সকল দায় তারা আমাদের ওপরই চাপিয়ে দিতে চায়।

বাংলাদেশের মানুষের এই সম্ভাব্য বিপর্যয় নিয়ে বিবিসির একটি নতুন ধরনের অনুষ্ঠানে জলবায়ুর পরিবর্তন নিয়ে কয়েকজনকে আলোচনার জন্য ডাকে। কিন্তু সেটা কোনো স্টুডিওতে নয়– একবারেই দুর্গম উপকূলবর্তী এলাকায়। মংলা থেকে স্পিডবোটে নদীর ওপারে নিয়ে যাওয়া হয় আমাদের। সেখানে নদীর পাশে বিশাল মঞ্চ ও স্টুডিও। এলাকার মানুষসহ আরো কিছু নির্বাচিত মানুষ দর্শক সারিতে।

আলোচকদের মডারেটর নানান প্রশ্ন করছেন। দর্শকদের কাছ থেকেও প্রশ্ন উঠছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এই ধরনের অনুষ্ঠানের নগদ উদ্দেশ্য। কিন্তু এটা করতে যে এলাহি কারবার তার ভালোমন্দের মূল্যায়ন নিশ্চয়ই বিবিসি করবে। কিন্তু এই ধরনের একটি আয়োজন এতো অদ্ভুত একটি জায়গায় অতি সাধারণ গ্রামের মানুষদের নিয়ে হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার একদমই নতুন। হজম করতে আরো সময় লাগবে। কিন্তু যে কথা বলতে প্রসঙ্গটি তুলেছি সেটা হলো গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গীরণ এবং জলবায়ুর পরিবর্তন এখন আবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এই বিষয়ে আমাদের আরো জানা দরকার এবং আমরা নিজেরা এই ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিতে পারি সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা পরিকল্পনা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন এর রাজনীতিটা বোঝা। যার কিছুটা আমি উপরে ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু এখন আমি আরেকটি ভয়াবহ বিপদ দেখছি। সেই বিপদের কথা বলে শেষ করব।

জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলার জন্য কী করা দরকার তার রাজনীতি বিচার করে আমরা দেখেছি ধনী দেশগুলো আমাদের পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিচ্ছে তারা কিছুই করবে না। কিংবা করবার কথাবার্তা চলবে, বাকোয়াজগিরি হবে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। এখন ২০০৬ সালে জর্জ বুশ বলে বসলেন এই সমস্যার সমাধান করতে হবে কারিগরি কায়দায়। সেটা কেমন? সেই কায়দাটির নাম হচ্ছে ভূগোল বদলানোর কারিগরি বা Geo-engineering। পৃথিবীতে দূষণ কমানো দূরে থাকুক, বরং আরো দূষিত করতে হবে সবকিছু। কী রকম! আকাশে (Stratosphere) সালফার কণা ফাটিয়ে দিয়ে এমন একটা সালফার স্তর তৈরি করা যাতে সূর্যের আলো দুনিয়াতে আর প্রবেশ করতে না পারে। বিশাল সমুদ্র টনকে টন লোহার কণিকা দিয়ে দূষিত করে দেওয়া যাতে সমুদ্রে এক ধরনের জলীয় উদ্ভিদ (Plankton) তৈরি করা যায়– যারা কার্বন ডাই অক্সাইড শুষে নিতে পারে। মেঘে রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো যাতে অসময় বা অমৌসুমেও বৃষ্টিপাত ঘটানো যায়। ইত্যাদি।

বহুজাতিক কর্পোরেশনাগুলো এতে মহা খুশি। কারণ হল, এই ধরনের কারিগরি ক্ষমতা একমাত্র অল্প কয়েকটি কোম্পানির হাতে। এই ধরনের বিশাল জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্প হাতে নেওয়া মানে বিশাল মুনাফা কামানোর সুযোগ। ইতোমধ্যে এইসব নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষাও করে ফেলেছে ধনী দেশগুলোর গবেষণা প্রকল্প ও কোম্পানি। যেমন: IRONEX 1, IRONEX 2। করছে US Office for Naval Research Ges US National Science Foundation। আরো আছে। যেমন, মেক্সিকোর CICESE Occanografia Fisica, Southern Ocean Iron Release Experiment (SOIRE) ইত্যাদি। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো দেখছে জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে মুনাফা কামানোর সুযোগ বিস্তর। অতএব তারা তাদের সরকারের সঙ্গে মিলে জলবায়ুর পরিবর্তনে বাংলাদেশের মতো দেশের যে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে তার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। বাংলাদেশে নদীভাঙা ঘরভাঙা অসহায় গরিব

মানুষদের দেখিয়ে প্রমাণ করা খুবই সহজ যে, আহারে! বন্যায় এই মানুষগুলোর কীই-না দুর্দশা হচ্ছে। এখন বাংলাদেশের বন্যার কারণ যে ফারাক্কা, ভারতের বাঁধ নির্মাণ, আমাদের নিজেদের উল্টাপাল্টা রাস্তাঘাট বানানো, চিংড়ি চাষের জন্য সুন্দরবন কেটে সাফ করা, বনাঞ্চল কমিয়ে ফেলা সেই সব আসল কথা না বলে বন্যার কারণ ও নদীর ভাঙনকে হঠাৎ জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বলে চালাবার চেষ্টা চলছে। যদি এই প্রচার সফল হয় তাহলে বাংলাদেশের মতো দেশের মানুষদের বাঁচানোর জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলো তো তৈরিই রয়েছে। যেমন আছে GreenSea Ventures Inc, কালিফোর্নিয়ার Planktos, কিম্বা সানফ্রানসিসকোর Climos। এইসব কোম্পানিকে তখন বলা হবে তোমরা টনকে টন লোহার চূর্ণ সমুদ্রে ফেলে দাও বা ইউরিয়া দাও সাগরে। অন্যেরা যদি তাদের সমুদ্রে ফেলতে না দেয় তো বঙ্গোপসাগরকে দূষিত করো। এতে জলজ উদ্ভিদ প্লাংক্টন তৈরি হোক, আর তারা কার্বন ডাই অক্সাইড বাতাস থেকে শুষে নিক। আর, এই ফাঁকে কোম্পানি মুনাফা কামিয়ে নিক।

আকাশ ফুটা হচ্ছে কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু আকাশ ফুটার কথা বলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিপর্যয়ের ধুয়া তুলে পৃথিবীকে আরো দূষিত করবার জন্য জর্জ বুশ ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যেভাবে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছে সেই সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যই এই লেখা। আমাদের দেশে তাদের এজেন্টের অভাব নাই বা অভাব ঘটবে না। আমাদের উদ্বিগ্নতা এবং বাংলাদেশের বিপদের কথা আমরা সেই কারণে ভুলে যাব না। ধনী দেশগুলোকে তাদের জীবনব্যবস্থা বদলাতে আমাদের বাধ্য করতেই হবে। তারা নিজেদের না বদলিয়ে পৃথিবীকে আরো দূষিত করবে– এটা কিছুতেই হতে দেওয়া যায় না। আর এই কাজ করতে গিয়ে আমরা যেন তাদের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রপাগান্ডার উপাদানে পরিণত না হই– এই হুঁশিয়ারি জানিয়ে দিচ্ছি সবাইকে।

দুই

কোপেনহেগেনের ঘোড়ার ডিম : বিশ্বব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে বিশাল আয়োজনের কপ ১৫ (Conference of the Parties 15) শেষ হয়েছে ১৮ ডিসেম্বর, জাতিসংঘের জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত পারস্পরিক সমঝোতার যে দলিল (United Nations Framework Convention on Climate Change) আছে তার অধীনে বিশ্বের ১৯২টি দেশের সরকারি প্রতিনিধি এবং ১২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকারপ্রধানের উপস্থিতিতে কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে মিলিত হয়ে কোনো ধরনের আইনগত বাধ্যবাধকতা ছাড়া একটি নিছক অঙ্গীকারনামা নিয়ে সান্ত্বনা পেতে হল।

এর নাম দেয়া হয়েছে কোপেনহেগেন অ্যাকর্ড। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই মন্তব্য করেছিলাম কোপেনহেগেনে জলবায়ুর বিকৃতি রোধ করার কথাকথিত সম্মেলনের ফলাফল হবে শূন্য। সাপ্তাহিক 'বুধবার' (৬ ডিসেম্বর ২০০৯) পত্রিকায় আমার লেখাটির

শিরোনামে লিখেছিলাম, সম্মেলন মূলত ঘোড়ার ডিম প্রসব করবে। বন্ধু সম্পাদক ঘোড়ার ডিম বা 'অশ্বডিম্ব' শব্দটি শিরোনামে রাখতে চাননি। তখন আমি তার কথা কবুল করেছি। তবে এখন অবশ্যই বলা যায়– কোপেনহেগেন একটি অশ্বডিম্ব প্রসব করেছে। সম্মেলনের আর কী ফলাফল হতে পারত? আসলে খোদ সম্মেলনটিই ছিল একটি অবাস্তব ব্যাপার। কেন? দুই-একটি কারণ পরীক্ষা করা যাক।

এক. একদিকে প্রত্যেকেই মানছে যে জীবাশ্মভিত্তিক সভ্যতার গোড়ায় গলদ দেখা দিয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে প্রাণ বিপন্ন। প্রাণের শর্ত ও প্রাণের ব্যবস্থাপনার প্রাকৃতিক সম্পর্কগুলো শতচ্ছিন্ন। যেভাবেই হোক এই গ্রহকে মানুষের বাসের জন্য নিরাপদ রাখতে হলে বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর কার্বন গ্যাসের নিঃসরণ বা নির্গমন বন্ধ করতে হবে। এ পরিস্থিতিতে সমঝোতা বা চুক্তি নিয়ে দরকষাকষির কী আছে? কিছুই নেই। আথচ সম্মেলনটি হল দেনদরবার দরকষাকষির চুক্তি। যাত্রীদের কারণে জাহাজ ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু যাত্রীরা নানা স্বার্থে ও রাজনীতিতে ভাগ হয়ে বলছে অমুকে এটা না করলে আমি এটা করব না, কিংবা আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছি কিনা সেটা অন্যরা তদারকি করতে পারবে না। আর আমরা যেমন বাংলাদেশ, ভাবছি ভিক্ষা চাইবার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত। আমরা ভিক্ষার ঝোলা নিয়ে হাজির হয়েছি। বলছি, আমরা তো আকাশ ফুটা করিনি, আমরা বরং ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব আমাদের টাকা দিতে হবে। অথচ আমাদের উন্নয়নের মডেল কিন্তু পাশ্চাত্যের জীবাশ্মভিত্তিক সভ্যতারই ছকে তৈরি।

দুই. পুরো সম্মেলনই হয়েছে মূলত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো কিভাবে জলবায়ু রক্ষার নামে আরও মুনাফা কামাতে পারবে সেই লক্ষ্যে। তারা টেকনোলজি দেবে আর আমরা সেই টেকনোলজি দিয়ে বিপদ মোকাবেলা করব। সেই টেকনোলজির ওপর আমার বুদ্ধিবৃত্তির সম্পত্তির অধিকার থাকবে। অর্থাৎ কোম্পানির পেটেন্ট করা টেকনোলজি আমাদের কিনতে হবে। সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও দৈনন্দিন জীবনযাপন এবং চর্চা কিভাবে জলবায়ুর পরিবর্তনে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকে তার কোনো খবর নেই।

ঐতিহাসিকভাবে কিভাবে জনগণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলা করেছে সেখান থেকে শেখার কথাবার্তা নেই। এসব জনগণ করবে না। করবে নাকি 'এক্সপার্ট' বা জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা।

তিন. জলবায়ুকে কৃতকৌশলগতভাবে বিকৃত করে তাকে কিভাবে 'জলবায়ু যুদ্ধ' পরিচালনা কাজে পরিচালনা করা যায় তার জন্যও কয়েকটি দেশের তৎপরতা– এই সম্মেলনের কোনো এজেন্ডা ছিল না।

তাকে আলোচনার বাইরে রাখা হয়েছে। অথচ ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় হো চি মিন ট্রেইলে কৃত্রিমভাবে অধিক বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে গেরিলাদের সাপ্লাই লাইন বন্ধ করার চেষ্টা করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রমাণ এখন হাতে আছে। সুনামি, আইলা বা অন্যান্য বিপর্যয়ের পেছনে জলবায়ুর বিকৃতি ঘটানোর কোনো পরীক্ষা আছে কিনা কে জানে! নৌশক্তি দিয়ে সমুদ্রের ওপর দখলদারি প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা এখন তীব্র।

জাপানের কিয়োটো শহরে যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে কার্বন নিঃসরণ বা নির্গমনের মাত্রা কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ধনী দেশগুলো। কোপেনহেগেন সম্মেলনেও কার্বন নির্গমনের মাত্রা কে কত কমাবে, এ তর্কবিতর্ক শেষ করতে না পেরে সম্মেলন শেষ করে সবাই বাড়ি ফিরেছেন। এ অঙ্গীকারনামাটুকুও এসেছে শেষ প্রান্তে এসে। প্রায় ভেস্তে যাওয়ার পর্যায়ে গিয়ে চারটি প্রভাবশালী দেশ চীন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া প্রস্তাবে সম্মতি দিলে এ অঙ্গীকারনামা গৃহীত হয়। এতে গরিব দেশগুলোর সমর্থন আছে কিনা তা কেউ জানার আর চেষ্টা করছে না। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনের যৌক্তিক পরিণতি ঘটেছে উল্লেখ করে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিসের ভিত্তিতে এ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন একমাত্র তিনিই জানেন। এ চুক্তিকে 'যৌক্তিক চুক্তি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে তলিয়ে যাওয়ার মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে আছে এমন একটি দেশ এ মন্তব্য করেছে। অথচ চুক্তিটির এমনই হাল যে ৩০ খণ্ড রুপার বিনিময়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বিক্রি করতে হবে। যেটা বিপজ্জনক সেটা হল এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলাদেশের পক্ষে আগামী দিনে দেনদরবার করার অবস্থানটুকু নষ্ট করলেন। এ সম্মেলনের বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতির জায়গা শুধু চুক্তি অর্জনে ব্যর্থতা নয়, বরং এ ধরনের অদূরদর্শী মন্তব্য।

প্রকৃতির ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণের ফলে জলবায়ুর অস্বাভাবিক বিকৃতির যে সংকট সারাবিশ্বে প্রকট হয়েছে সেই ক্ষেত্রে জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল সভ্যতার বিপরীতে নতুনভাবে ভবিষ্যৎ গড়ার ভাবনায় নেতৃত্ব দেয়া বা নিদেনপক্ষে অবদান রাখার বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের জন্য। ধনী-গরিব উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে সব দেশের জনগণের মধ্যে যে সংবেদনা তৈরি হয়েছে তাকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কাজে লাগাতে পারত। নতুন ধরনের পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশল অবলম্বনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব রাষ্ট্রসভায় নিজেকে হাজির করতে পারত। কিন্তু সেদিকে না গিয়ে বাংলাদেশ হাজির হয়েছিল ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে। এখন ভিক্ষুকের চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! বাংলাদেশ বলতে বাধ্য যে, যা হয়েছে সেটা যৌক্তিক। গরু মেরে, প্রভু গো, জুতা দান করেছেন। তাতেই আমরা খুশি। আমাদের জীবন ধন্য!

অথচ ভেনিজুয়েলার প্রতিনিধি বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের দালালি করে যে অঙ্গীকার হল সেটা জাতিসংঘের বিরুদ্ধে একটি ক্যু, একটি অভ্যুত্থান। কোপেনহেগেন সম্মেলন আরও একবার প্রমাণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের অধীন জাতিসংঘ এখন প্রায় অচল একটি প্রতিষ্ঠান। এটা খুবই শরমের ব্যাপার যে বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার গ্রিনরুমের কারসাজি করে যুক্তরাষ্ট্র নিজের 'নেতৃত্বে' গরিব দেশগুলোর সঙ্গে গাদ্দারি করার জন্য চারটি প্রভাবশালী দেশকে নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে একটি তথাকথিত চুক্তি বা অঙ্গীকারনামা করেছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্বন নির্গমনকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র এতদিন কিয়োটো প্রটোকলকেই স্বীকার করেনি, এখন সে নতুন চুক্তি করার জন্য নেতৃত্ব দিচ্ছে তা-ও আবার নব্য কার্বন

দূষণকারীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে! বারাক ওবামা তার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতেই কি কোপেনহেগেন যাওয়ার আগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছিলেন?

বাংলাদেশ কী পেয়েছে? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষতি হবে তার ৯০ ভাগই গরিব দেশগুলোর ভাগ্যে জুটবে। গরিব দেশগুলো অভিযোজন তহবিল (Adaptation Fund) গঠনের কথা বলে এসেছে এবং এই অঙ্গীকারনামায় আগামী তিন বছর উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ৩০ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য দরিদ্র দেশগুলোকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন ডলার সাহায্যের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আফ্রিকা, ক্ষুদ্র দীপপুঞ্জ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশ দাবি করেছে, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। খাপ খাওয়ানোর তহবিলের ১৫ শতাংশ পাওয়ার আশায় গুড়েবালি পড়তে পারে, কারণ আফ্রিকার শক্তিশালী অবস্থানের কারণে তহবিলের একটি বড় অংশ (প্রায় ৮৭ শতাংশ) সেখানে দিতেই হবে। কাজেই বাংলাদেশ সেদিক থেকে কোনো সুফল পাবে বলে আশা করা যায় না।

কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে প্রায় প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ ডেনমার্কের প্রতিবাদ করেছেন। বিশ্বের ১৯২টি দেশের সরকারি প্রতিনিধিরা যেমন কোপেনহেগেনের বেলা সেন্টারে জাতিসংঘের UNFCC সম্মেলনের অংশগ্রহণ করেছেন এবং কার্বন নির্গমনের মাত্রা কে কত কমাবে তাই নিয়ে দেন দরবার করছেন অন্যদিকে Klimaforum-09- The people's Climate Summit-এ ৬৭টি দেশের প্রায় ৫৩৮টি সংগঠনের প্রায় ১০ হাজার বেসরকারি প্রতিনিধি একত্রিত হয়েছেন। তারা জলবায়ু সংক্রান্ত আলোচনায় ইনসাফের (Climate Justice) স্লোগান দিয়েছেন। তাদের অনেকের ওপর পুলিশি হামলা আমরা টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছি। তাদের অপরাধ ছিল তারা বলেছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যা ঘটছে তা বদল করতে হলে বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন আনতে হবে, ব্যানারে লেখা ছিল 'System Change Not Climate Change' অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 'ইনসাফ' কথাটির মানে হবে, দুনিয়ার এখনকার অর্থনৈতিক অসাম্য ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আধিপত্য, শোষণ ও মুনাফাবাজি বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটারই আমূল পরিবর্তন।

ঠিকই। ব্যবস্থার বদল চাই, চাই জলবায়ুর বিকৃতি রোধের এটাই একমাত্র পথ। দুনিয়ার সংগ্রামী জনগণকে নিজেদের বাঁচানোর জন্য দুনিয়াজুড়ে গণঐক্যের ডাক দিয়েছে এটাই এই সম্মেলনে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক।

[লেখক: ফরহাদ মজহার: কবি ও দার্শনিক।]

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়: মোকাবেলা সহজ নয় তবে অসম্ভবও নয়

আ ই নু ন নি শা ত

[আজ ২১ মে ২০১০ তারিখ। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি ড.আইনুন নিশাত-এর। 'হালখাতা'র এবারের বিষয় **'বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব'**। এ বিষয়ে কিছু প্রশ্নের জবাব আজ আমরা জানতে চাইব ড. নিশাত-এর কাছ থেকে। জনাব নিশাত প্রাক্তন অধ্যাপক, পানিসম্পদ প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। তিনি International Union For Conservation Of Nature-Gi Country Representative ছিলেন দীর্ঘসময়। এছাড়া তিনি পরিবেশ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ করছেন। বর্তমানে তিনি ব্রাক ইউনিভার্সিটির ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা সম্পর্কে তাঁর রয়েছে দেশে-বিদেশের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা। প্রকৌশলী হওয়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে এক্ষেত্রে ড. নিশাতের রয়েছে বিশেষ আগ্রহ এবং সৃজনী দৃষ্টিভঙ্গী। কোপেনহেগেন আন্তর্জাতিক সম্মেলনসহ জলবায়ু বিষয়ে বিভিন্ন সভায় তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করছেন।]

হালখাতা

'বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা' বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই খুব আলোচিত একটি বিষয়। ভালোভাবে না জেনে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছেন এবং লিখছেন, এতে বহু রকম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আপনার কাছ থেকে প্রথমে জানতে চাই, বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টি আসলে কী?

আইনুন নিশাত

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্যাস হচ্ছে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এর বাইরে আরো অনেক গ্যাস রয়েছে। এর মধ্যে চারটি গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এই চারটি গ্যাস হচ্ছে– কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোস অক্সাইড ও সিএফসি বা ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। সূর্য থেকে পৃথিবীতে যে তাপ বিকিরণ হয় এই গ্যাসগুলো সেই তাপকে ধরে

রাখে। এই প্রক্রিয়াটি যদি না ঘটত তাহলে পৃথিবীতে দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম থাকত এবং রাতের বেলা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এই প্রক্রিয়া আছে বলেই পৃথিবী আজও বসবাসযোগ্য। এই গ্যাসগুলো বাতাসের দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে দুইশত আশি ভাগ থাকে। কিন্তু পৃথিবীতে কলকারখানা ও গাড়ি আসার পর থেকেই পৃথিবীর বাতাসে এই চারটি গ্যাসের পরিমাণ বিশেষ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যেতে থাকে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এটা ১৮৫০ থেকে এই গ্যাস বেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এই গ্যাস বাড়তে বাড়তে গত একশ বা দেড়শ বছরে এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে তিনশত নব্বই ভাগে। অর্থাৎ বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও নাইট্রোস অক্সাইড গ্যাসের পরিমাণ গত একশ, দেড়শ বছরে দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে একশ ভাগ বেড়ে গেছে।

ফলে সূর্যের বিকিরণ হওয়া তাপমাত্রাকে ঐ চারটি গ্যাস পৃথিবীতে আগের চেয়ে অনেক বেশি ধরে রাখছে। পৃথিবীর প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা অংক কষে আশংকা প্রকাশ করেছিলেন যে এতে করে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেড়ে যাবে। এখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপমাত্রা পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে সত্যিসত্যিই গড় তাপমাত্রা বেড়েছে। বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীতে বাতাসের যে গতিবিধি ছিল সেই গতিবিধিতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। কারণ তাপমাত্রাই বাতাসের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এখন পর্যন্ত লক্ষ করা যাচ্ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা এক ডিগ্রি পরিমাণ বেড়েছে এবং বিজ্ঞানীরাও মনে করছেন এটা আগামী একশত বছরে পাঁচ থেকে ছয় ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। তখন পৃথিবীর বাতাসের প্রবাহের ধারার মধ্যেও বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। এতে করে সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গতি এবং গতিপ্রকৃতি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ভীষণভাবে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। যেমন, যে অঞ্চলে যখন মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হত সে অঞ্চলে সেই সময়ে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত না হয়ে ভিন্ন সময়ে হবে। আবার যখন যে অঞ্চলে বৃষ্টি হত সেই অঞ্চলে সেই সময়ে বৃষ্টি না হয়ে অন্য সময়ে বৃষ্টি হবে। কিংবা যে অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হত সেখানে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হবেই না। আবার যে অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হত না সে অঞ্চলে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হবে। কিংবা যে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হত সে অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কমে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর পুরো বায়ুমণ্ডলের গতিধারা ভেঙে পড়বে। এতে করে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও জীবন যাপনের ওপরে বড় রকমের বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হবে।

হালখাতা

পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বায়ুমণ্ডল মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে, ভবিষ্যতে এই প্রভাব আরও প্রকট হবে। প্রশ্ন হল এই তাপমাত্রার বৃদ্ধি সমুদ্রের পানি ও পানির স্রোতের ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলছে?

আইনুন নিশাত

সমুদ্রে পানির যে প্রবাহ বা স্রোতের ধরন, পৃথিবীর উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সেই স্রোত-ধারার ওপরও প্রভাব পড়েছে। বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টিও অনুধাবন করেছেন একশ-দেড়শ বছর আগে। বর্তমানে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন আগামী একশ-দেড়শ বছর পরে পৃথিবীর উষ্ণতা পাঁচ-ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে সমুদ্রের পূর্বেকার স্রোত-ধারা ভেঙে পড়বে। অর্থাৎ বর্তমানে সমুদ্রের পানি যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, সমুদ্রের সেই পানি তখন ভিন্ন ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হবে। সমুদ্রের যেখানে স্রোতের তীব্রতা কম সেখানে তীব্রতা বেড়ে যাবে আবার যেখানে স্রোতের তীব্রতা নেই সেখানে তীব্র স্রোত বয়ে যাবে। এতে করে সামুদ্রিক জীববৈচিত্রে পরিবর্তন আসবে। মাছের আবাসস্থল বদলে যাবে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা কিংবা বিশেষজ্ঞরা কখন থেকে সিরিয়াসলি ভাবতে শুরু করলেন? তাদের প্রথম দিকের সেই ভাবনা সম্পর্কে কিছু বলুন...

আইনুন নিশাত

পৃথিবীতে কলকারখানা, গাড়ি বাড়ার কারণে যে চারটি গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে এবং এর ফলে বায়ুমণ্ডলের এবং সমুদ্রের ওপর যে প্রভাব পড়ছে, তাতে করে পৃথিবী মারাত্মকভাবে দূষিত হওয়া শুরু করে আশির দশকে। তখন বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকে একটি অংশ বিশেষ করে আমেরিকার উডস-হোল রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বিজ্ঞানীরা বললেন যে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার কারণে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠেছে। তখন বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব জুড়েই বড় ধরনের হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। তখন পৃথিবীর আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা তাদের পরিমাপক যন্ত্রের ডাটা নিয়ে অংক কষে দেখলেন সত্যি সত্যি পৃথিবীর তাপমাত্রা একশ-দেড়শ বছর আগের তুলনায় কিছুটা বেড়ে গেছে। আর একথা তো সবাই জানেন যে, তাপমাত্রায় পানির আয়তন বেড়ে যায়। ফলে অতিরিক্ত তাপমাত্রায় সমুদ্রের পানি ফুলে উঠেছে। এছাড়া আবহাওয়া-বিজ্ঞানীরা লক্ষ করলেন, একই জায়গায় প্রতিবছর সমান বৃষ্টিপাত হচ্ছে না; এক জায়গার বৃষ্টি চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়; ঋতু পরিবর্তনে দেখা গেল বড় ধরনের অসংলগ্নতা। যখন শীতকাল থাকার কথা তখনও শীতকাল আসছে না আবার যখন স্বাভাবিক গরম পড়ার কথা তখন সেখানে মাত্রাতিরিক্ত গরম পড়ছে। পৃথিবীতে যখন এগুলো বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমাণিত হল তখন বিজ্ঞানীদের মধ্য থেকেই একটি অংশ মনে করলেন এভাবে চলতে থাকলে এ শতাব্দী শেষে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাবে ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী মনে করলেন আগামী একশত বছরে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রা বাড়বে না। কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী মনে করলেন বাতাসের ক্ষতিকর

গ্যাসগুলোর পরিমাণ বেড়ে দশ লক্ষ ভাগের মধ্যে পাঁচশ বা ছয়শ ভাগে পৌঁছতে পারে। তখন তারা এ-ও বললেন যে এর ফলে জলবায়ুতে অকল্পনীয় বিরাট পরিবর্তন আসবে। অর্থাৎ এখন যেখানে যে সময়ে বৃষ্টি হয় তখন সেখানে বছরের সে সময়ে চরম খরা বিরাজ করবে। এক জায়গার বৃষ্টি অন্য জায়গায় গিয়ে পড়বে। আগে যেখানে বৃষ্টি কম হত বা হতই না সেখানে বৃষ্টির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। আগে যেখানে ঝিরঝির বৃষ্টি হত সেখানে হঠাৎ করে ঝুম বৃষ্টি হতে পারে। আরেকটি বিষয় হল সারা বছরে পৃথিবীতে যে পরিমাণ বৃষ্টি হত তার থেকে মোট বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেড়ে যেতে পারে; কিংবা মোট বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ঠিক থাকলেও বৃষ্টিপাতের ধরন বদলে গিয়ে বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা আরও একটি বিষয় প্রমাণ করে দেখালেন, পৃথিবীতে যে বড় বড় বরফখণ্ড রয়েছে, যেমন আইসল্যান্ড, গ্রিনল্যান্ড বা এন্টার্কটিকায় যে বরফরাজি রয়েছে– তা অতিরিক্ত উষ্ণায়ণের ফলে অধিক পরিমাণে গলে গিয়ে সমুদ্রে অতিরিক্ত পানি জমা করেছে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়ের এই বাস্তবতায় এদেশে কী ধরনের সমস্যা হচ্ছে এবং আরও কী ধরনের সমস্যা হতে পারে বলে আপনি একজন বাংলাদেশী হিসেবে মনে করেন?

আইনুন নিশাত

আমি একজন বাংলাদেশী হিসেবে, এদেশের সম্ভাব্য সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বলব, বাংলাদেশে বৃষ্টিকে কেন্দ্র করে যে কৃষিব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, সেই কৃষিব্যবস্থার মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে। দ্বিতীয়ত পানি ও বাতাস বাহিত রোগ-বালাই যেমন– ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগের প্রকোপ ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। কৃষি প্রসঙ্গে আবার আসা যাক; বাংলাদেশের ক্ষেত্রে মূল সমস্যাটা হবে এই কৃষির ক্ষেত্রেই। আগে মানুষ গান গাইত, 'আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই' এই গান গাইত পাট কিংবা আউশ ধান লাগানোর জন্য চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে বা বৈশাখের প্রথমে। আমন ধান আমরা লাগাতাম আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে অর্থাৎ জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত, কখনো আগস্ট-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে যেত। কিন্তু এখন আমরা যদি দু'হাজার নয় সালের অবস্থা দেখি, যেখানে জুন-জুলাই-আগস্টে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের অর্ধেক বৃষ্টিপাত হয়েছে। তা-ও আমাদের ভাগ্য ভালো সেপ্টেম্বরে কিছু বৃষ্টি হয়েছে, অক্টোবরে কিছু বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি ভারতের দিকে তাকাই সেখানের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার– এই অঞ্চলে সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়নি বলে এখানকার ফসলে বিপর্যয় ঘটেছিল। আবার গত বছরের তেইশে জুলাই দিনটিকে যদি দেখি, হঠাৎ করে একদিনে সাড়ে তিনশ থেকে সাড়ে চারশ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের হিসেবে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সেদিন বৃষ্টিপাত রেকর্ড

হয়েছে ৩৩৩ মি.মি.। আবার পানি উন্নয়ন বোর্ডের হিসাবে সেদিন বৃষ্টিপাত হয়েছে ৪৪৮ মি.মি.। এই যে একদিনে বিপুল পরিমাণে বৃষ্টি, এটা স্বাভাবিক নয়। সাধারণত পুরো জুলাই মাসে ৩৫০ থেকে ৪০০ মি.মি. বৃষ্টি স্বাভাবিক। সেখানে একদিনে সাড়ে তিনশ মি.মি. বৃষ্টিটা ভীষণভাবে অস্বাভাবিক। সে কারণে ঐ দিন ঢাকা শহরে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। একইভাবে চট্টগ্রামে ভূমিধ্বস হয়েছিল ২০০৭ সনের জুন মাসে। লোকে বলেছে যে, পাহাড় কেটে খাড়া করা হয়েছে বলে ভূমিধ্বস হয়েছে। কিন্তু পাহাড় তো এখনো আছে এবং খাড়া অবস্থাতেই আছে। ভূমিধ্বস তো হচ্ছে না। কারণ ওই দিন ছয় ঘণ্টার মধ্যে ৩৫০ মি.মি. বৃষ্টি হয়েছে। সেদিন "আকাশ ভেঙে পড়েছিল"। এখন আমরা যে ২০০৯ সালের কথা বললাম যে, এ বছরে মোট বৃষ্টি কম হয়েছে, এর কারণ কী? আমাদের হিসাব মতে তাপমাত্রা বাড়লে বাষ্পায়ন বাড়বে, বাষ্পায়ন বাড়লে মেঘ বাড়বে, মেঘ বাড়লে বৃষ্টিপাত বাড়বে। কাজেই মনে করা হচ্ছে যে, সার্বিক বৃষ্টিপাত বাড়বে এবং সেজন্য বন্যাও বাড়বে। কিন্তু প্রশ্ন হল, ২০০৯ সালে আমাদের এখানে বন্যা হল না কেন? এবং বৃষ্টি গেল কোথায়? আসলে গত বছর আমাদের বৃষ্টি গেছে করাচি। সিন্ধু, বেলুচিস্থান, রাজস্থান, গুজরাটে স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাহলে ওখানকার অতিরিক্ত বৃষ্টি আসল কোথা থেকে? এসব অঞ্চলের এই বাড়তি বৃষ্টিটাই আমাদের কম-আসা বৃষ্টি। প্রশ্ন হল এটা কেন ঘটছে, ঘটছে এই জন্য যে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করছে বাতাসের গতিকে, সেজন্য বাতাসের সঙ্গে মেঘের গতিপথও পরিবর্তিত হয়েছে। যার ফলে আগে যেখানে বৃষ্টিপাত হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল– এখন সেখানে মেঘের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়াতে বৃষ্টিপাতও হচ্ছে একজায়গার পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়। বৃষ্টিকালীন ওই বাতাসটা ভারত মহাসাগর থেকে এসে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মেঘালয়-অরুণাচল, আসাম-অরুণাচল হয়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু তার একটা বড় অংশ চলে গেছে পশ্চিম দিকে। এই যে জলবায়ুতে ঘটনাগুলো ঘটছে, এতে বাংলাদেশের কৃষিতে মহাবিপর্যয় নেমে আসবে। এসবই ঘটছে কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ার কারণে। ধরা যাক তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেল তাতে বাংলাদেশের মোট ধান উৎপাদন এখন যে-পরিমাণ হয় তার অর্ধেকে নেমে আসবে, আলু-গম ইত্যাদি ফসলের উৎপাদনও অর্ধেকে নেমে আসবে। কাজেই বাংলাদেশে বর্তমানে যে-কৃষিব্যবস্থা তথা খাদ্যে নিরাপত্তা আছে সেটা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে।

হালখাতা

আমরা তো জানি ঘূর্ণিঝড় সাধারণত পনের থেকে বিশ বছর পরপর আসে; বালাদেশে আমাদের ছোটবেলায় দাদা-দাদির কাছ থেকে যে-সব ঘূর্ণিঝড়ের গল্প শুনেছি সেগুলোও অনেক দিন পরপর হয়েছিল; অথচ ইদানিং সিডর, আইলা ও লাইলার মতো ঘূর্ণিঝড়গুলো প্রতি বছরই হচ্ছে। বাংলাদেশে বড় বড় ঝড়গুলো এত অল্প সময়ের ব্যবধানে হচ্ছে, এর কারণ কী?

আইনুন নিশাত

বৈশ্বিক উষ্ণতার বাড়ার আরো একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা বেড়ে যাওয়া, বাংলাদেশে এর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস এর ক্ষেত্রে আমরা যদি ১৯৬০ সাল থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত এই সময়কালকে পর্যবেক্ষণে আনি, তাহলে দেখব এই চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মোট পনের থেকে ষোলটি বড় বড় ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে। এছাড়া ২০০৭ থেকে ২০১০ এর মধ্যে পাঁচটি বড় ঘুর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগর থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই পাঁচটি ঘূর্ণিঝড় হল, ১. আইলা, ২. নার্গিস, ৩. রিজভি, ৪. সিডর এবং ৫. লাইলা আমাদের কপাল ভালো যে এর মধ্যে সবগুলো বাংলাদেশে আঘাত হানেনি। কথা হল বিশ -ত্রিশ বছর আগে বলে দেয়া যেত যে কখন বৃষ্টিপাত হবে, কখন কী ঘটবে। বলে দেয়া যেত যে জুন মাসের দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছয়-সাত তারিখ– এই সময়ের মধ্যে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে যাবেই। আমি বিশ বছর আগে এই বিষয়ে বাজি পর্যন্ত ধরতে পারতাম, এখন কিন্তু বলা যাচ্ছে না কখন বৃষ্টিপাত হবে, কখন ঝড় হবে– কখন কী ঘটবে। এর মূলে রয়েছে জলবায়ু বিপর্যয়।

হালখাতা

এই অনিয়মতান্ত্রিক ঝড় ও বৃষ্টির বিষয়টি তো পৃথিবী জুড়েই ঘটছে; কিন্তু বিশ্ববিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের নজরে বিষয়টি অফিসিয়াসি আসে কখন থেকে?

আইনুন নিশাত

এই বিষয়টিকে অফিসিয়ালি বিশ্ব নজরে নেয় ১৯৮৮ সালে। আন্তর্জাতিক সংস্থা "ডাব্লিও এম ও বা বিশ্বজলবায়ু সংস্থা" বিশ্বের সকল দেশকে নিয়ে বসে। বিশ্ব তখনো বিষয়টিকে সিরিয়াসভাবে নিয়েছিল। তবে এটিকে খুবই সিরিয়াসভাবে নেয়া হয়েছে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে। এখন প্রশ্ন হল, তাত্ত্বিকতার দিক থেকে বিষয়টি সিরিয়াসভাবে নিলেই তো হবে না, এর বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বের বিজ্ঞানীরা একমত হলেন যে, বিশ্বজুড়ে জলবায়ু বিপর্যয় ঘটেছে কিন্তু সকল দেশের রাষ্ট্রনায়কদেরও তো এ-বিষয়ে একমত হতে হবে।

হালখাতা

বিশ্বের জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের এক ধরনের অবদান আছে; কিন্তু বিভিন্ন দেশের নির্বাহীগণ যদি এবিষয়ে একমত না হন, তারা উদ্যোগ গ্রহণ না করেন, তা হলে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ফল দিয়ে কোনো কাজে আসবে না। এ-বিষয়ে আপনার মতামত কী?

আইনুন নিশাত

সম্প্রতি জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে– বিষয়টি প্রতিটি দেশের রাষ্ট্রনায়করা মেনে নিয়েছেন। এটিকে মোকাবেলা করার জন্য কী কী বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া দরকার সেটা বিজ্ঞানীরা অংক কষে বলে দিতে পারলেও সেই পদক্ষেপগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাবেন তো রাষ্ট্রনায়কেরা। কাজেই বিজ্ঞানীরা এই বিষয়টি নিয়ে হুল্লোড় বাঁধিয়ে দিলেন অথচ দেখা গেল এ-বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনায়করা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়ন করা সহজ বলে মনে করছেন না। তারপরও ১৯৮৮ সালে বিশ্বের সকল দেশের উপস্থিতিতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে তখন একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, যার নাম আইপিসিসি বা ইনার গার্ডেনসেন্ট্রাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের ১৯৪ টি দেশ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে যায়। তখন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, প্রতিটি রাষ্ট্র তার নির্বাচিত বিজ্ঞানী দ্বারা এ-বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাবে। তারা গবেষণা শুরু করে দিলেন। ১৯৯১ সালের দিকে সকল দেশের বিজ্ঞানীরা বলতে লাগলেন, বাতাসে যে কার্বন গ্যাস নিঃসরিত হচ্ছে– হয় সেই গ্যাসের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অন্যথায় নিঃসরিত গ্যাসকে এ্যাবজর্ব বা শোষণ করতে হবে। এখন বাস্তব সত্য হল বিশ্ব জুড়েই কলকারখানা ও গাড়ি বাড়ছে। দ্বিতীয়ত মানুষের লাকড়ি প্রয়োজন, ফার্নিচার প্রয়োজন, মানুষ বাড়ছে তাই বসতবাড়ি প্রয়োজন– ক্রমাগত বন কেটে বাড়ি বানাচ্ছে। কাজেই গাছ-পালার পরিমাণ মারাত্মকভাবে কমছে, বনভূমি কমছে।

হালখাতা

আগামী একশ বছরে জলবায়ুর পরিবর্তন কী মাত্রায় হতে পারে? এবং এর ফলে বিশ্বে কী কী প্রভাব দেখা দিতে পারে?

আইনুন নিশাত

একদিকে কারখানা ও গাড়ির ধোঁয়া বাড়ছে যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না অন্যদিকে গাছ-পালা কমছে যে-কারণে কার্বন গ্যাস এ্যাবজর্ব বা শোষণ করার ক্ষমতা কমছে। এই দুই কারণেই পৃথিবীতে গ্রিন-হাউস গ্যাস দিন দিন বেড়ে চলছে। ফলে পৃথিবী উষ্ণ হয়ে উঠছে। বিজ্ঞানীরা বলেলন যে, এসব কারণে আগামী একশ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা পাঁচ থেকে ছয় ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে। এবং তাপমাত্রা যদি এই হারে বাড়তে থাকে তাহলে সমুদ্রপাড়ে পানির উচ্চতা বেড়ে যেতে পারে। কতটা বাড়বে তা নিয়ে বিতর্ক এখনো আছে। আইপিসিসি প্রথমে ১৯৯১ সনে মনে করেছিলেন যে ৬ থেকে ৯ ফুট পর্যন্ত পানির উচ্চতা বাড়বে। ২০০৭ সনে তারা হিসাব বদলে বলছেন এটা ২ ফুটের মত হবে, কিছু বিজ্ঞানি এখনও ৩ ফুটের কথা বলছেন।

হালখাতা

কোনো কোনো বিজ্ঞানী তো মনে করেন, জলবায়ু পরিবর্তন কোনো সমস্যা নয়, যা কিছু ঘটছে তা স্বাভাবিকভাবেই প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই ঘটছে। অর্থাৎ বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পৃথিবী জুড়ে যে আলোচনার ঝড় উঠেছে, এ-বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতও রয়েছে, এ-ব্যপারে কিছু বলুন...

আইনুন নিশাত

সকল বিজ্ঞানি যখন উষ্ণায়নের প্রতিক্রিয়ার কথা বলছেন তখন কয়েকজন বিজ্ঞানী বিষয়টিকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন। তারা বললেন, জলবায়ু নিয়ে, বন্যা ও খরা নিয়ে যা-কিছু বলা হচ্ছে সেটা অনেকটাই অনুমাননির্ভর। এর মধ্যে আংকিক বা গাণিতিক প্রমাণ নেই; কাজেই এই সব তথ্য যৌক্তিকভাবে দাঁড়ানোর উপযোগী নয়। বরফ গলার বিষয়টি তো এমন নয় যে একবার বরফ গলে সব বরফ শেষ হয়ে যাবে! বরং প্রতি বছর শীতকালে বরফ জমছে আবার গরমকালে বরফ গলছে– কাজেই এটা স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে থেকেই ঘটছে। সুতরাং তাদের এই যুক্তির সামনে গ্রিন-হাউস গ্যাস বাড়া এবং সে-কারণে উষ্ণায়ণ বৃদ্ধি ও অন্যান্য বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গেল।

হালখাতা

ভিন্নমত ব্যক্ত হওয়ায় বিষয়টি নিশ্চয়ই এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে; সেই চ্যালেঞ্জও নিশ্চয়ই মোকাবেলা করা হয়েছে; কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে মোকাবেলা করার পর এর পরবর্তী বাস্তব দিকগুলো আসলে কী ছিল, সে-বিষয়ে যদি কিছু বলুন...

আইনুন নিশাত

সেই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করার পর বিশ্বের সকল বিজ্ঞানীরা একমত হলেন যে, গ্রিন-হাউস গ্যাস নিঃসরণ সত্যিই একটি বড় সমস্যা। এবং তারা নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রনায়কদের বোঝাতে সক্ষম হলেন এই সমস্যা আন্তর্জাতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। সেই লক্ষ্যে অতি দ্রুত একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন হল ১৯৯২ সালে। এই কনভেনশনকে বলা হয় ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ। "ফ্রেমওয়ার্ক" কথাটি বলা হল এই কারণে যে এই কনভেনশনে আইনগুলো চূড়ান্ত করা হয়নি শুধু একটি ফ্রেমওয়ার্ক দাঁড় করানো হয়েছে। তাহলে ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়টি কী? ফ্রেমওয়ার্ক-এর আওতায় অনেকগুলো বিষয়কে ঠিক করা হল; তার মধ্যে একটি হলো, গ্রিন-হাউস গ্রাসকে কমাতে হবে। যা তিনশ আশি থেকে কমিয়ে দুইশ আশি বা তার কাছাকাছিতে নামিয়ে আনতে হবে ইত্যাদি।

হালখাতা

আচ্ছা সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ঢাকার সমতলের মাটি কতটা উঁচু হবে? সিডরের মতো ঘূর্ণিঝড়ে যে জলোচ্ছ্বাস হয়ে থাকে তাতে কি ঢাকা প্লবিত হতে পারে?

আইনুন নিশাত

সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ঢাকা ২৫ ফুট উঁচু হবে। সিডরের মতো ঘটনার বিশ-বাইশ ফুট পর্যন্ত পানি উঁচু হয়ে আসতে পারে। তবে সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে ঢাকা ২৫০-৩০০ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত বিধায় এতোদূর পানি আসবে না।

হালখাতা

বাংলাদেশ যেহেতু সমুদ্র-উপকূলবর্তী একটি দেশ, সে-কারণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ছাড়াও সমুদ্রের পানির স্তর ফুলে দেশটি তলিয়ে যাবে– এমন আশঙ্কার কথা প্রচারিত আছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

আইনুন নিশাত

১৯৯০-৯১ সালে মনে করা হয়েছিল সমুদ্রের পানির স্তর ফুলে ১৫ ফুট পর্যন্ত বাড়বে; এখন গাণিতিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে আগামী একশ বছরে পানি বাড়বে সর্বোচ্চ ৬০ সে.মি. অর্থাৎ ২ ফুটের মতো। তার মানে একশ বছর পরে দেখা যাবে ২ ফুটের মতো পানি বাড়বে। গত একশ বছরে পানি বেড়েছে ৬ ইঞ্চি। কাজেই বাংলাদেশ তাতে ডুবে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। আগামী একশ বছরে যদি ২ ফুটও পানি বাড়ে, তাতে মালদ্বীপ তলিয়ে যাবে, কারণ মালদ্বীপের প্রায় পুরোভাগটাই সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে মাত্র দুই-তিন ফুট উঁচু।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সমগ্র উপকূল জুড়ে ১৫ ফুট উঁচু বাঁধ রয়েছে। যে সমস্ত দ্বীপে জলোচ্ছ্বাস-রোধক বাঁধ নেই, যেমন উড়ির চর বা নিঝুম দ্বীপ; সেগুলো ডুবে যেতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলে ১৫ ফুট উঁচু বাঁধ আছে যাকে বেড়িবাঁধ বলে। হয়তো জলোচ্ছ্বাসের কারণে এটাকে আরও উঁচু করতে হবে কিন্তু সমুদ্রের পানি সাধারণভাবে যা বাড়বে তার জন্য আমরা তলিয়ে গিয়ে উদ্বাস্তু হব না। আমরা উদ্বাস্তু হতে পারি যদি প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় হঠাৎ এসে বড় ধরনের আঘাত হানে। আর লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে উপকূলে কৃষি উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে, তাতে আগামী একশ বছরে উপকূল বসবাসের উপযোগী না-ও থাকতে পারে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন বা বিপর্যয় মোকাবেলার আলোচনায় একটি টার্ম বারে বারে ঘুরেফিরে আসে, সেটি হল 'মিটিগেশন'। সংক্ষেপে পরিষ্কার করে বলবেন কি 'মিটিগেশন' বিষয়টি আসলে কী?

আইনুন নিশাত

বাতাসে গ্রিন-হাউস গ্যাসের পরিমাণ কমিয়ে আনাকেই বলা হয় "মিটিগেশন"। এই মিটিগেশনের ব্যাখ্যা কোনো কোনো সাংবাদিক ভুলভাবে দিয়ে থাকেন; তারা প্রচার করেছেন গ্রিন-হাউস গ্যাসের কারণে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ কমানোই নাকি মিটিগেশন। কিন্তু বিষয়টি মোটেও তা নয়। বিশ্ব-উষ্ণায়নের ক্ষেত্রে মিটিগেশন হল যে-কারণে বিশ্ব-উষ্ণায়ন ঘটছে সেই কারণকে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ গ্রিন-হাউজ গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনাকেই মিটিগেশন বলে। এবং ১৯৯২ সালে পৃথিবীর উন্নত সাঁইত্রিশটি দেশ একসঙ্গে মেনে নিয়েছে যে, তারাই সবচেয়ে বেশি কার্বন গ্যাস নিঃসরণ করে। এর মধ্যে আছে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাতাশটি দেশসহ, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা। এসকল দেশের সম্মতিতে আলোচনার একটি ধাপ তখন শুরু হয়েছিল, গ্রিনহাউজ গ্যাস তারা কিভাবে কমাবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে; যে আলোচনাটি আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে ১৯৯৫ সালে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার আলোচনায় আরেকটি টার্মও বারে বারে ঘুরেফিরে আসে, সেটি হল 'অ্যাডাপটেশন'। 'অ্যাডাপটেশন'টাই-বা আসলে কী?

আইনুন নিশাত

গ্রিন-হাউস গ্যাস এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কমানো হল অ্যাডাপটেশন। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে আমরা যে ক্ষতির সম্মুখীন হব যেমন অতি গরমে কৃষিক্ষেত্র ব্যাহত হবে, বন্যা বড়াবে, খড়া বাড়বে, রোগবালাই বাড়বে, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত বাড়বে– এ সমস্ত বাড়ার কারণে আমাদের ধানের ফলন কমে যাবে। সেক্ষেত্রে অতি তাপমাত্রায়, অতি খরায়, অতি বন্যায়, অতি রোগবালাইর মধ্যে কিংবা লবণাক্ততার মধ্যে এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের মধ্যে যে উচ্চ ফলনশীল ধানের ফলন স্বাভাবিক থাকবে সেই ধরনের ধানের বীজ আবিষ্কার করতে হবে। যদি এই অতি তাপ, খরা, লবণাক্ততা, বন্যা সহ্য করার মতো ধান আবিষ্কার করতে না পারা যায় তাহলে ধানের ফলন কমে যাবে। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের প্রয়োজনেই এই সব প্রতিকূলতা সহ্যকারী উচ্চ ফলনশীল ধান যে-কোনো মূল্যে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। আবার মানুষের ম্যালেরিয়া বাড়বে, ডায়রিয়া বাড়বে এবং ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ বেড়ে যাবে। আমরা দেখেছি ফ্রান্সে বিশ হাজার লোক মারা গেছে তাপমাত্রা বাড়ার কারণে। কাজেই আমাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থাতে পরিবর্তন আনতে হবে। একইভাবে আমাদের কৃষিকাজেও পরিবর্তন আনতে হবে, সেচে পরিবর্তন আনতে হবে। এই যে পরিবর্তন আনতে হবে, এই পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের ব্যয় হবে। কিন্তু অনুন্নত দেশগুলোতে এই ব্যয়ের টাকা আসবে কোথা থেকে? তখন অনুন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোকে বলল, এই

টাকা তোমাদেরকে দিতে হবে। কারণ এই বিপর্যয়ের পেছনে প্রধান কারণ সেই গ্রিনহাউজ গ্যাস এবং সেই গ্যাসের অতি নিঃসরণের জন্য তোমরাই দায়ী। সুতরাং অনুন্নত দেশের বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে সেই অর্থ উন্নত দেশগুলো দিতে রাজিও হল কিন্তু উন্নত দেশগুলো বলল, আমরা এই অর্থ দেব তবে তোমাদের প্রমাণ করতে হবে যে, এটা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই হয়েছে। অনুন্নত দেশকে এই যে প্রক্রিয়া এবং দাবির ভিত্তিতে উন্নত দেশ অর্থ দিতে রাজি হল, এটাই হল অ্যাডাপটেশন। এটাকেই কোনো কোনো সাংবাদিক ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। তারা বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনুন্নত দেশে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ বাবদ উন্নত দেশের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে। আর এই ক্ষতিপূরণ দেওয়াই নাকি অ্যাডাপটেশন। অথচ অ্যাডাপটেশনের প্রকৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে কথিত ঐসব ব্যাখ্যার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আমাদের উচিত প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা পরিহার করা।

হালখাতা

'মিটিগেশন' ও 'অ্যাডাপটেশন' এর বাস্তবায়ন পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া তাহলে কী হবে? অর্থাৎ খানিকটা খুলে বলবেন কি, 'মিটিগেশন' ও 'অ্যাডাপটেশন'-এর আওতায় উদ্যোগগুলো বাস্তবভিত্তিক কী উপায়ে গৃহীত হবে?

আইনুন নিশাত

সেটা হল, আমরা জানি ২০০৯ সালের মে মাসে 'আইলা' ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হেনেছিল– এটা হতেই পারে– মে মাসে এ-ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের মতো একটি ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু তিন দিনের মাথায় বা সাত দিনের মধ্যে যদি আরেকটি ঘূর্ণিঝড় আসে কিংবা পনের দিনের মাথায় যদি আরেকটি ঘূর্ণিঝড় হয়– বুঝতে হবে এটা জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণেই সংঘটিত হয়েছে। বড় বড় ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত বিশ বছর পঁচিশ বছর পর পর আসে। বড় ঘূর্ণিঝড়গুলো এত ঘন-ঘন আসে না। ২০০৯-এ আইলা আসল ২০১০-এ লাইলা আসল– এত অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'টি বড় ঘূর্ণিঝড় আসার কথা নয়। এরপর যদি ২০১০-এ আরেকটা ঘূর্ণিঝড় আসে এবং ২০১১-তে আরেকটা ঘূর্ণিঝড় আসে– তাহলে তো বুঝতে হবে এটা জলবায়ুর বিপর্যয়ের কারণে হচ্ছে। এই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জলোচ্ছ্বাস হবে এবং সেটা স্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাসের চেয়ে পানির স্রোত অনেক উঁচু হয়ে ধাবিত হবে। স্বাভাবিক জলোচ্ছ্বাস হলে সাধরণত পাঁচ ফুট উঁচু হয়ে পানির স্রোত প্রবাহিত হয় এবং সেজন্য আমাদের পনের ফুট উঁচু বাঁধ নির্মাণ করা আছে। কিন্তু জলবায়ুগত কারণে যে বড় ঘূর্ণিঝড়গুলো ঘন-ঘন আসছে, সেই ঘূর্ণিঝড়ের কারণে সৃষ্ট জলোচ্ছ্বাসে পানির স্রোত অন্তত পনের ফুট উঁচু হয়ে ধাবিত হতে পারে। সে-জন্য আমাদের এখন বাঁধ নির্মাণ করতে হবে ন্যূনতম বিশ ফুট উঁচু করে। এই যে আগে যেখানে পনের ফুট উঁচু বাঁধ ছিল সেখানে বিশ ফুট উঁচু বাঁধের

কথা ভাবা হচ্ছে– এই অতিরিক্ত পাঁচ ফুট বাঁধের খরচটা উন্নত দেশ দিতে রাজি হয়েছে। এটাই হল অ্যাডাপটেশন। তারা বলছে, এই খরচ আমরা দেব কিন্তু কীভাবে দেব? সেই উপায় বের করার লক্ষ্যেই এখন নেগোসিয়েশন চলছে। ১৯৯২ সনে গ্রহীত কনভেনশনে বা জলবায়ু চুক্তিতে মিটিগেশন এবং অ্যাডাপটেশনের বিষয় বর্ণিত আছে। এই চুক্তির ধারাগুলো বাস্তবায়নে কার্বন ডাইঅক্সাইড নিঃসরণ কমাবে। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে সকল দেশের উপস্থিতিতে পর্যালোচনা করা হয়। ১৯৯২ সালে এই চুক্তির আওতায় প্রধান দুটি বিষয় ছিল মিটিগেশন ও অ্যাডাপটেশন। এই চুক্তিতে উন্নত অন্যান্য দেশ যেমন সই করেছিল একইভাবে যুক্তরাষ্ট্রও এতে সই করেছিল। ১৯৯৮ সালে কিওটো প্রোটকল হল। সেখানে বলা হল সারা দুনিয়া একত্রিত হয়ে ২০১২ সালের মধ্যে সামগ্রিক গ্রিহাউজ গ্যাসকে ৫ ভাগ কমাবে। এই ৫ ভাগ কমাতে গিয়ে পৃথিবীর উন্নত সাঁইত্রিশটি দেশের মধ্যে কারো ভাগে পড়ল ৭ ভাগ, কারো ভাগে ৫ ভাগ এবং কারো ভাগে ৪ ভাগ।

উন্নত প্রতিটি দেশকে নিয়ে যে-পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার চুক্তি করা হয়েছে সেই নির্ধারিত পরিমাণের মধ্যে উন্নত ঐ দেশ নিজে কিছু কমাবে এবং যে-অংশটুকু তারা কমাতে পারবে না, সেই অংশটুকু অনুন্নত দেশ কমাবে; অনুন্নত দেশে গ্রিন-হাউস গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে যে খরচটা হবে সেটা ঐ উন্নত দেশ দিয়ে দেবে। যেমন, আমাদের দেশে রাস্তাঘাটে যে বর্জ্য ফেলা হয়, কাঁচাবাজার বা হাসপাতালগুলোর যে বর্জ্য ফেলা হয়– সেগুলোকে প্রক্রিয়াজাত করে বায়ো-গ্যাস ও জৈবসার তৈরি করা সম্ভব এবং এভাবে ক্ষতিকর গ্রিন-হাউস গ্যাস হ্রাস করা সম্ভব। কিন্তু এই প্রক্রিয়াজাত করতে গিয়ে যে আর্থিক ব্যয় হবে সেটা উন্নত ঐ দেশ দিয়ে দেবে এবং এই প্রক্রিয়াতে বাংলাদেশে যে গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস পেল, সেই ক্রেডিট বা কৃতিত্বটুকু উন্নত দেশ কিনে নেবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারওয়ান বাজারে প্রতিদিন যে বর্জ্য জমা হয় সেগুলো প্রক্রিয়াজাত না করলে প্রতিদিন বিপুল পরিমাণ মিথেন গ্যাস নিঃসরিত হবে। এখন কোনো দেশ যদি এই বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যয়ের অর্থটা দিয়ে দেয় তাহলে দুটো কাজ হবে। প্রথমত এখন থেকে মিথেন গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ হবে। তাতে পৃথিবীতে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কিছুটা হলেও কমবে। অন্যদিকে এই বর্জ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের মধ্য দিয়ে যে বায়োগ্যাস তৈরি হবে সেটা আমাদের রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এবং অন্যদিকে এখান থেকে যে জৈব সার তৈরি হবে সেটা আমাদের চাষবাষের কাজে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং একদিকে সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ লাভবান হচ্ছে বায়োগ্যাস ও জৈবসার পেয়ে অন্যদিকে পৃথিবীতে কার্বনের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমবে। আর এই প্রক্রিয়াজাতকরণের অর্থ যদি কোনো ধনী এবং অধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশ দিয়ে দেয় তাহলে এখানে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পেল তার ক্রেডিট বা কৃতত্বটুকু পাবে ঐ ধনী এবং অধিক কার্বন নিঃসরণকারী দেশটি। অর্থাৎ ধনী দেশটি দরিদ্র দেশটির কাছ থেকে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কৃতিত্ব

কিনে নিল। এটাই হল আন্তর্জাতিক ব্যবসা বা বাণিজ্যের নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে এটাই মিটিগেশন। এবং ইতোমধ্যে কারওয়ান বাজারের সমস্ত বর্জ্য কিনে একটি কোম্পানি এই কাজটি করছে। যার পুরো খরচ দিচ্ছে নেদারল্যান্ড।

হালখাতা

মিটিগেশন ও অ্যাডাপটেশন-এর ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল দেশেরই তো সম্মতি থাকা জরুরি; তা না হলে যত ভালো পন্থাই বিজ্ঞানীরা বের করুক সেটা কোনো কাজে আসবে না। বলবেন কি মিটিগেশন ও অ্যাডাপটেশন-এর ক্ষেত্রে কোনো দেশের মতবিরোধ বা পিছুটান আছে কি না?

আইনুন নিশাত

কিওটো প্রোটকল পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ সই করে তা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিলেও বেঁকে বসল একটি দেশ। সেটা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সে বলল, আমি তোমাদের সবকিছু মানি কিন্তু আমাকে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর জন্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে সেটি আমার জন্য অত্যন্ত বেশি। কাজেই এটা আমি মানি না। এর কারণ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ সে দেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন, আমার দেশের নাগরিকদের এটা বলতে পারব না যে তোমরা গাড়ির ব্যবহার কমাও, বিদ্যুৎতের ব্যবহার কমাও। কেননা এখানে ভোটের একটা ব্যাপার রয়ে যায়। বুশ বললেন, এই বিষয়টি আমি দেশের জনগণকে বোঝাতে সমর্থ হব না। বুশের এই কথার সার্বিক যে তাৎপর্য দাঁড়াচ্ছে সেটা হল আমেরিকাবাসী দীর্ঘদিনের অভ্যস্ততার মধ্য দিয়ে যে অতি ভোগবাদী সমাজ গড়ে তুলেছে, সেই অতি ভোগের দিকটি কোনোভাবেই তারা হ্রাস করতে পারবে না। কিওটো প্রটোকল চুক্তি বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাপ্ত উন্নত দেশগুলো ঠিক করেছিল তারা ৫% কমাবে; কিন্তু আমরা এখন হিসাব করে দেখেছি তারা আসলে মোটের ওপর আরও বেশি অর্থাৎ ৭% কমাবে। তবে কিয়োটো প্রটোকল বাস্তবায়নকারী ৩৭টি দেশ বিশ্বের মাত্র ৩০ ভাগ গ্রিনহাউস গ্যাস উৎপাদন করে। অর্থাৎ বাকী ৭০ ভাগের ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। যারা গ্রিনহাউস গ্যাসের দায় স্বীকার করে নিয়েছে এবং চুক্তিতে সই করেছে তারা যদি চুক্তি অনুসারে কাজ না করে তাহলে তাদের দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এ নিয়ে হিসেবনিকেশ হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। ইতোমধ্যে গ্রিস, ক্রোয়শিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ সম্পর্কে হিসেবনিকেশ হয়েছে।

হালখাতা

যুক্তরাষ্ট্রের কথা বললেন, এরকম তো আরও ছোট বড় নানা আপত্তি-বিপত্তি আছেই, কিন্তু তাই বলে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই বন্ধ থাকছে না। এবার আপনার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে চাইছি, শত বাধা সত্ত্বেও কিভাবে, কী কী

সাংগঠনিক পদ্ধতি অবলম্বন করে বিশ্বজুড়ে গ্রিনহাউস কমানোর প্রচেষ্টা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

আইনুন নিশাত

কথা হল, বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা সহজ কাজ নয় তবে অসম্ভবও নয়। এটা সারা পৃথিবীর প্রতিটি দেশের যৌথপ্রয়াস। প্রতি বছর একেক দেশে আলোচনার জন্য বসা হচ্ছে এবং সেখানে ১৯৪টি দেশ উপস্থিত থাকে; এই ১৯৪টি দেশের মধ্যে জলবায়ু বিষয়ে নানান দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এই আলোচনার কতগুলো ধারা রয়েছে। প্রথম ধারা হচ্ছে *COP* অর্থাৎ Concern of Parties। শেষ সেশনের আলোচনাগুলো উচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ের হয়ে থাকে। এখানে সব দেশের মন্ত্রীরা আসেন এবং তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয় ধারা হচ্ছে অর্থাৎ Meeting of Parties। এখানে কিওটো প্রটোকলের বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। অর্থাৎ COP Ges MOP-এ জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রীয়ভাবে আলোচনা হয়ে থাকে। এর দুটো অঙ্গ সংস্থা আছে। এর একটা সাবসটা বা সাবসিডিয়ারি বডি অন টেকনোলজিক্যাল এ্যাসেসমেন্ট আর অন্যটি হল এসবিআই বা সাবসিডিয়ারি বডি অন ইমপ্লেমেনটেশন। অর্থাৎ কপ এবং মপ-এর সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়নের দায়িত্ব হল এসবিআই'র; সেখানে যে কারিগরি বিষয়গুলো আনা হল তার দায়িত্ব পালন করবে সাবসটা। প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসে কপ ও মপ এবং জুন মাসে সাবসটা ও এসবিআই-এর মিটিং বসে। যেমন এ বছর জুন মাসে হবে সাবসটা এবং এসবিআই'র মিটিং। এ বছর ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে ১৬ নম্বর কপ এবং ৬ নম্বর মপ। এ্যাডাপটেশন বা অভিযোজন-এর ক্ষেত্রে কী করতে হবে সেজন্য যে দিক-নির্দেশনাগুলো নির্ধারণ করা হয় নাইরোপিএ্যাকশন প্ল্যানে। তবে এখনোও প্রতিটি সম্মেলনে মূল ফোকাসটা থাকছে মিটিগেশন-এর ওপর। ২০০৭ সালে আইপিসিসি'র চতুর্থ রিপোর্ট চারটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। চারটি খণ্ডের একটি অ্যাডাপটেশন, এবং একটি মিটিগেশন, পলিসিস-এর ওপর।

হালখাতা

বর্তমানে কি আলোচনার ধারা বদলেছে?

আইনুন নিশাত

সামারি ফল পলিসিস খণ্ডটি আত্মপ্রকাশ করল ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৭ সালে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল বানকি মুন ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৭-এ সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের নিয়ে মিটিং করলেন। সেই মিটিং-এ বাংলাদেশের তৎকালিন রাষ্ট্র প্রধান যোগ দিয়েছিলেন। তিনি সেই সম্মেলনে অ্যাডাপটেশন-এর ব্যাপারে

বাংলাদেশের পক্ষে আলোচনা করেছিলেন। ২০০৭-এর ডিসেম্বর মাসে সিওপি এবং এমওপি অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ১৩ নম্বর সিওপি-তে 'বালী এ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি হয়। বালী এ্যাকশন প্ল্যানের মূল বক্তব্য হচ্ছে, পৃথিবী এখন বিশ্বজলবায়ু পরিবর্তন যেভাবে মোকাবেলা করছে এটা সঠিক হচ্ছে না, একে তরান্বিত করতে হবে এবং এর গতিটাকে আরও বাড়াতে হবে। এজন্য তারা ৫টি বিল্ডিং-ব্লক দাঁড় করাল। এর প্রথম বিল্ডিং-ব্লকে বলা হয়েছে 'ভিশন' বা সার্বিকভাবে আমাদের কি করতে হবে তা নিয়ে আবার চারটি বিল্ডিং ব্লক হল এডাপটেশন, মিটিগেশন অর্থায়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে। অর্থাৎ কোনো উদ্যোগ না নিলে যে আগামী একশ বছরে পৃথিবীর তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রি ৬ ডিগ্রি বেড়ে যেতে পারে এবং ২ ডিগ্রি তাপমাত্রা বেড়ে গেলেই আবহাওয়া-জলবায়ুতে প্রচণ্ড বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, প্রচণ্ড পরিমাণে খাদ্য-ঘাটতি দেখা দেবে; কাজেই তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি পর্যন্তও বাড়তে দেয়া যাবে না। ১৯৯২ সালে পৃথিবীর সকল দেশ মিলে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে, আমরা অন্তত ৩টি বিষয় অর্জন করতে চাই; এর মধ্যে প্রথমটি হল খাদ্য-নিরাপত্তা যাতে ব্যাহত না-হয়, জীব-বৈচিত্র্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না-হয় এবং তৃতীয়টি হল টেকসই উন্নয়ন যাতে ব্যহত না-হয়। এরপর ২০০৭ সালে গিয়ে আইসিসি-তে পৃথিবী বলল, খাদ্য-নিরাপত্তা ভীষণ রকম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছে যা আগামী বিশ-ত্রিশ বছর পরে এই খাদ্য-ঘাটতি মোকাবেলা করা পৃথিবীর ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। জীব-বৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। অর্থাৎ সেতু করা হচ্ছে কিন্তু ভেঙে যাচ্ছে, রাস্তা করা হচ্ছে জলোচ্ছ্বাস ও অন্যান্য কারণে রাস্তার মাটি ধুয়ে যাচ্ছে। কাজেই যে ৫টি বিল্ডিং-ব্লকের কথা বলা হল তার প্রথম ব্লকে একটা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যের কথা বলা হল। এবং বলা হল ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেনে যে সম্মেলন হবে, সেই সময়ের মধ্যে এই লক্ষে কর্মপন্থা চূড়ান্ত করতে হবে।

হালখাতা

কোপেনহেগেনের বিশ্বজলবায়ু সম্মেলন নিয়ে নানা রকম মতামত রয়েছে। কেউ কেউ প্রকৃত তথ্য না জেনে বা আংশিক জেনে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন কিংবা টিভিতে সাক্ষাৎকারও দিয়েছেন; এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে বেশ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কোপেনহেগেন সম্মেলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে বলে আমরা মিডিয়াতে জেনেছি; এবং এই সম্মেলনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে মূল সমন্বয়ের দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন, সেকারণে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই কোপেনহেগেনে প্রকৃত প্রস্তাবে কী ঘটেছিল?

আইনুন নিশাত

এখন তা হলে দেখা যাক কোপেনহেগেনে কী হয়েছে? আগেই বলে রাখি কোপেনহেগেন সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত হয় সেটা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়নি রাজনৈতিক কারণে। সঙ্গত কারণেই রাজনৈতিক দিকে আমি যাচ্ছি না। তবে সকল দেশের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হয়, আগামী এক-দেড়শ বছরে যে ৫/৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে, সেটা যেন কোনোভাবেই দুই ডিগ্রির বেশি না বাড়তে পারে, বরং সেটা দুই-এর নিচে রাখতে হবে। আর সম্ভব হলে সেটা যাতে দেড় ডিগ্রিতে স্থিত থাকে সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে। প্রশ্ন হল এই দেড় ডিগ্রির মধ্যে আনতে হলে আমাদের কী করতে হবে, সেই বিজ্ঞান কি পৃথিবীর জানা আছে? এর উত্তর হল জানা নেই। সে-কারণে সবাই দ্বিতীয় কথাটি বলেছেন, সেটা হল ২০১৫'র মধ্যে দেড় ডিগ্রিতে আনার জন্য আমাদের কী করতে হবে সেটা অন্তত আমরা নির্ধারণ করব। তবে এটা দুই ডিগ্রির মধ্যে অবশ্যই যেন অবস্থান করে। বাংলাদেশ কোপেনহেগেন সম্মেলনে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে এটা দুই ডিগ্রির বেশ নিচে থাকবে।

দ্বিতীয় বিল্ডিং-ব্লক হচ্ছে মিটিগেশন। মিটিগেশন-এর ক্ষেত্রে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর মধ্যে অনুন্নত দেশগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর কোনো দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ হিসাবে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর দায়িত্ব থেকে মুক্ত। তবে আমরা বলেছি যে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি ও অর্থায়ন পেলে আমরা মিটিগেশনে অংশ গ্রহনে সম্মত আছি। এখন বিতর্কটা বাঁধলো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে। ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিল এরকম উন্নয়নশীল দেশগুলো বলছে মিটিগেশন-এর শর্ত মোতাবেক তারা গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে রাজী নয়। উন্নত দেশগুলো কিন্তু তাদের দায় স্বীকার করে নিয়েছে ১৯৯২ সালেই। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে কয়লা, গ্যাস পোড়াচ্ছে, কারখানায় ধোয়া নির্গত হচ্ছে এটা তারা কমাতে নারাজ। ধরা যাক ভারত ও আমেরিকার কথা। ভারত যে-হারে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত করছে সেটা মোট পরিমাণের দিক থেকে হিসাব করলে আগামী পাঁচ বছরে যুক্তরাষ্ট্রকেও ছাড়িয়ে যাবে। এই হিসাব মাথাপিছু হিসাব করলে চলবে না, কারণ আমেরিকার তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা চারগুণ বেশি। এখন প্রশ্ন হল উন্নত দেশগুলো যদি দায় মেনে না-নিত তাহলে তাদেরকে দণ্ড দেয়া যেত কিন্তু তারা তো দায় মেনে নিয়েছে আগেই। এখন সমস্যা হল উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নিয়ে। উন্নত দেশগুলোর জন্য এখন ঠিক করতে হবে তারা কতটা নিঃসরণ কমাবে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে রাজি হচ্ছে না; এটা একটা সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

হালখাতা

আচ্ছা কোন দেশ কতটুকু গ্রিনহাউস গ্যাস কমাল সেটা বুঝবার উপায় কী?

আইনুন নিশাত

গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে কোনো দেশ বলল যে, আমরা ৫% কমিয়েছি– এটা বললেই হবে না। সেই দেশ আসলেই কমাল কি-না, কমালে প্রকৃত হিসাব মতে কতটুকু কমিয়েছে এটা পর্যবেক্ষণের জন্য নিরপেক্ষ তদন্তকারী দল আছে। এই দলের কাজ হল সার্বক্ষণিক পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণে রেখে নির্ণয় করা– কোন দেশ কী কী উপায়ে কতটা গ্রিনহাউস গ্যাস কমাল তা নিশ্চিত করা। তার আগে সর্বসম্মতিক্রমে এই গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

হালখাতা

উন্নত দেশগুলোর মধ্যে কোন কোন দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে বেশি সোচ্চার বলে আপনার মনে হয়েছে?

আইনুন নিশাত

উন্নত দেশগুলোর মধ্যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস কামানোর জন্য সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। নিজেদের দেশের মধ্যে এই গ্যাস কমানোর ক্ষেত্রে বলছে, তারা ২০২০ সনের মধ্যে ২০% গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে রাজী আছে। এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো সঠিকভাবে অংশ নিলে তারা তা ৩০ ভাগে উন্নিত করতে প্রস্তুত আছে।

উন্নত দেশগুলো ৩০% গ্রিনহাউস গ্যাস কমানোর যে কথা দিয়েছে তাতে বাগড়া বাধিয়েছে আরব দেশগুলো। তারা বলেছে গ্রিনহাউস গ্যাস কমানো মানে হচ্ছে জ্বালানি তেলের ব্যবহার কমানো এবং তেলের ব্যবহার কমে গেলে আরব দেশগুলোর তেল বিক্রি কমে যাবে। ফলে তাদের আয় কমে যাবে। অথচ পৃথিবী যে রসাতলে যাচ্ছে এই বিষয়টি আমাদের আরব ভাইয়েরা খুব একটা বুঝতে চাচ্ছেন না। এছাড়া সহযোগিতা করছে না যুক্তরাষ্ট্র। তারা মুখে সব কিছুই মেনে নিচ্ছে কিন্তু বলছে, আমরা গ্রিনহাউস গ্যাস কমাতে চাচ্ছি কিন্তু পারছি না। যুক্তরাষ্ট্র বলছে আমাদের জনগণ পণ্যের ব্যবহার কমালে তবেই-না আমরা উৎপাদন কমাব এবং উৎপাদন কম হলেই গ্রিনহাউস গ্যাস কম নিঃসরিত হবে। তাদের জনগণকে দিয়ে তারা পণ্যের ব্যবহার কমানোর চেষ্টা করছে কিন্তু এখনো পারছে না।

এছাড়া কোপেনহেগেনে যেটা হয়েছে সেটা হল, উন্নত দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবে তবে কমানোর হার কত হবে সেটা আলোচনার মাধ্যমে যে ঠিক হবে সেই তাগিদ তীব্রতা লাভ করেছে। উন্নয়নশীল দেশও গ্রিনহাউস গ্যাস কমাবে তবে কোন প্রক্রিয়ায় কমাবে সেটাও আলোচনার ভিত্তিতে ঠিক করা হবে। এর ফলে আশা করা হচ্ছে উন্নত দেশগুলোর কমানোর হার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর কমানোর কৌশল কী হবে সেটা ২০১০-এর ডিসেম্বরের মধ্যে পরবর্তী সম্মেলনে ঠিক করে ফেলা হবে।

হালখাতা

অ্যাডাপটেশন দ্রুত করার লক্ষ্যে ধনী দেশগুলো দরিদ্র দেশগুলোকে যে আর্থিক অনুদান দিচ্ছে এবং আরও অনুদান দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, বিষয়টি বাংলাদেশ কীভাবে দেখছে?

আইনুন নিশাত

বালী এ্যাকশন প্লানের চতুর্থ বিষয়টি হচ্ছে অর্থায়ন। অ্যাডাপটেশন দ্রুত করার লক্ষ্যে ২০১০, ২০১১ ও ২০১২ সালে উন্নত দেশগুলো ৩০ বিলিয়ন ডলার করে দেবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে। বাংলাদেশের মতো দেশগুলো আগ্রাধিকার চেয়েছিল এই অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ এতে বাধা দিয়েছে অনুন্নত দেশগুলো যাতে এতে অগ্রাধিকার না পায়। এতে উন্নত দেশগুলো অবশ্য বলেছে, আমরা অবশ্যই অনুন্নত দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দেব। এ-সব কিছুই কোপেনহেগেন সম্মেলনে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রস্তাবে সারা দুনিয়া রাজি হয়েছে, সেটা হল, ২০২০ সাল থেকে এই আর্থিক অনুদানের পরিমাণ বেড়ে ১০০ বিলিয়ন ডলার হবে। অবশ্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন চেয়েছিল এটা বেড়ে ১৫০ বিলিয়ন ডলার হোক। এখন প্রশ্ন হল, উন্নয়নশীল দেশ এবং অনুন্নত দেশগুলোর কি এই পরিমাণ টাকা যথপোযুক্তভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা আছে? আমার জবাব হল, নেই। এই বিষয়টি নিয়ে এখন আলোচনা হবে, এই টাকা কীভাবে দেয়া যেতে পারে, কীভাবে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে। এই টাকাটা কীভাবে উন্নত দেশগুলো দেবে সেই প্রক্রিয়া নিয়ে বিশ্ব এখনো দ্বিধাবিভক্ত। কিছুসংখ্যক উন্নত দেশ বলছে, যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যেমন বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএমএফ– এই প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে টাকাটা বণ্টন করা হোক। অন্যদিকে অনুন্নত দেশগুলোর বক্তব্য হচ্ছে, আমরা বিশ্বব্যাংক বা এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টাকাটা চাই না, কারণ তারা সঠিকভাবে টাকা বণ্টন করে না, তাদের কাজের মধ্যে দীর্ঘসূত্রিতা আছে এবং তারা বিভিন্ন ধরনের শর্ত দিয়ে টাকা ছাড় করতে দেরী করে। কাজেই এই টাকা বণ্টনের ক্ষেত্রে অন্য ধরনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সুস্পষ্ট। এডাপটেশন এর জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরাসরি অর্থায়নের পক্ষে অর্থাৎ এখানে জি-এইট বা বিশ্বব্যাংকের হস্তক্ষেপ চায় না। বাংলাদেশের জন্য এটা একটা সাহসী পদক্ষেপ। কারণ বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংকের ওপর এতটা নির্ভরশীল যে বিশ্বব্যাংক বা এ ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া এ দেশের জন্য কঠিন। তারপরও বিশ্বের দরবারে অন্যান্য অনুন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশ সুর মিলিয়ে বলেছে, এই টাকা বণ্টনের জন্য পৃথক ধরনের প্রতিষ্ঠান হতেই পারে তবে চাইলে বিশ্বব্যাংক সেখানে সহযোগিতা করতে পারে।

হালখাতা
বালী এ্যাকশন প্লান তো একটি বিষয়, জানতে চাচ্ছি অপর বিষয়টি কী?

আইনুন নিশাত
বিষয়টি হচ্ছে ট্রান্সফার অফ টেকনোলজী বা প্রযুক্তি হস্তান্তর। এই ট্রান্সফার অফ টেকনোলজী বা প্রযুক্তি হস্তান্তর-এর ক্ষেত্রে আমরা ছাড় চেয়েছি। যেমন একটি ছোট্ট উদাহরণ দেই, আমাদের একটি ছোট উইন্ড মিল আছে কুতুবদিয়ায়, সেখানে ২ কিলোওয়াট বা ৩ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। অথচ আমরা দেখেছি জার্মানি, হল্যান্ড, ডেনমার্কে ৫০০ থেকে ২৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ২৫০০ কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় এক একটি যন্ত্রের মাধ্যমে। প্রশ্ন হল, আমরা কেন ওই আধুনিক প্রযুক্তিটা পেতে পারি না? পাই না এই কারণে যে ওটার পেটেন্ট ভ্যালুটা হাই। কাজেই এই পেটেন্ট-এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই প্রযুক্তিটা যাতে আমরা সহজে পেতে পারি, সেই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে, তারা বলছে, হ্যাঁ এই প্রযুক্তিটা সহজলভ্য করা উচিত এবং এর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা চলছে।

হালখাতা
অ্যাডাপটেশন-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কি কোনো অর্জন এপর্যন্ত প্রতীয়মান হয়েছে, নাকি বিষয়টি এখনও আমাদের কাগজপত্রেই রয়ে গেছে?

আইনুন নিশাত
সে ক্ষেত্রে বলব, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন ধান আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শুধু আবিষ্কার করলেই তো হবে না, সেটাকে কৃষকের মাঝে পৌঁছে দিতে হবে। এভাবে এ্যাডাপটেশন-এর লক্ষ্যে নানাভাবে কাজ করে যাওয়া হচ্ছে।

হালখাতা
কোপেনহেগেন সম্মেলন নিয়ে অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে, এ-ধরনের সম্মেলনে কীভাবে কাজ হয়, নেগোসিয়েশনগুলো কী পদ্ধতিতে হয়, বিভিন্ন কমিটি কীভাবে কাজ করে– ইত্যাদি বিষয়গুলো ইলেকট্রনিক সুইফ্ট মিডিয়াতে জানা সম্ভব হয় না; এ-ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে জানতে চাই...

আইনুন নিশাত

বিশ্বকে একযোগে কাজ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণটিই প্রধান বাধা। সে-কারণে রাজনীতিক পর্যায়ে নেগোসিয়েশন চলছে। কোপেনহেগেনে দেখেছি ১৩০টি দেশের রাষ্ট্র-প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। ২৫টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা দরজা বন্ধ করে দর কষাকষি করেছেন ওবামার নেতৃত্বে; যার মধ্যে বাংলাদেশও ছিল। কোপেনহেগেনে এই পঁচিশের মধ্যে সকল রাষ্ট্র প্রধান স্থান পাননি। আর কিছু রাষ্ট্রপ্রধান আছেন, তারা রাজনৈতিক মতাদর্শিক ভিন্নতার কারণে স্বাভাবিকভাবেই এর মধ্যে থাকেননি। যেমন কিউবা কিংবা ভেনিজুয়েলা, এরা নিজেদের অবস্থান থেকে ওবামার উদ্যোগের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। আবার উন্নত বিশ্বের কিছু দেশ গোলমাল করেছে, তারা ৩০ বিলিয়ন ডলার অনুন্নত দেশকে দেয়ার প্রতিশ্রুতিতে ভেবেছিল অনুন্নত দেশগুলো সহজেই সবকিছু মেনে নেবে। কিন্তু উন্নয়নশীলদেশগুলো বিশেষ করে নিজেদের ওপর যে মিটিগেশনের চাপ আসছে এটাকে ঠেকানোর জন্যেই বেশ হৈ চৈ করেছে।

পৃথিবীর এতগুলো দেশ অর্থাৎ ১৯৪টি দেশ এই যে আলোচনার পর আলোচনা করে যাচ্ছে, এরা কি খুব সহজেই একমত হয়ে যেতে পারবে? ২০০৭ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত যে অগ্রগতি হয়েছে, আমি মনে করি এটা বিরাট অগ্রগতি। ২০০৯ তেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামা গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাসের ক্ষেত্রে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। বরং সবচেয়ে বেশি গোলমাল করেছেন চীনের প্রেসিডেন্ট; তিনি অনেক কিছুই মানতে চাননি।

হালখাতা

আলোচনার ধারা কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?

আইনুন নিশাত

সেখানে ওয়ার্কিং গ্রুপ আছে, আলোচনার পরে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের খসড়া তৈরি হয় এই ওয়ার্কিং গ্রুপের মাধ্যমে। এই ওয়ার্কিং গ্রুপের আগে আবার প্রাথমিক আলোচনা হয়। এই গ্রুপগুলো আবার কতগুলো ব্লকে বিভক্ত; এর একটি ব্লক হল জি-৭৭ ও চীন; এই গ্রুপে আছে ১৪০টি দেশ। আরেকটি গ্রুপ হল আম্ব্রেলা গ্রুপ; এখানে আছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া। আরেকটি গ্রুপ হল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। এবং এনভায়রনমেন্টাল ইনটেগিটি গ্রুপ মিলে মোট চারটি গ্রুপ।

জি-৭৭ গ্রুপের মধ্যে আবার ভাগ আছে; এখানকার আফ্রিকান গ্রুপ অনেক শক্তিশালী, নিজেদের কথাগুলো বলে বেশ জোরেসোরে। এখানে এশিয়ান গ্রুপের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। এছাড়া এখানে "স্মল আইল্যান্ড ডেভলপমেন্ট স্টেটস" বা সীড নামে একটি গ্রুপ আছে অত্যন্ত শক্তিশালী; কেননা এই সমস্ত দেশেরই অস্তিত্ব বেশি ঝুঁকিপূর্ণ; আগামী একশ বছর পরে এদেশগুলোর অনেকগুলিই সমুদ্রের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপও এসব দেশে বেশি। কাজেই এই দেশগুলো

এক ধরনের জোটবদ্ধতার মধ্যে আছে। তৃতীয় শক্তিশালী দেশ হচ্ছে এলডিসি; অনুন্নত দেশসমূহের একটি দল; আমি লক্ষ করছি এরা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কারণ স্মল আইল্যান্ড গ্রুপের অর্ধেকই হল এলডিসি গ্রুপ। আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই এলডিসি গ্রুপের। অন্যভাবে বলা যায় এলডিসির অধিকাংশ সদস্য আফ্রিকার সঙ্গে ওঠাবসা করতে ভালোবাসে। সিডস-এর সঙ্গে ওঠাবসা করতে ভালোবাসে। আইল্যান্ড স্টেটের মধ্যেও তো সবগুলো সমান না। যেমন, সিঙ্গাপুরও দ্বীপ মরিসাসও দ্বীপ, ইন্দোনেশিয়াও দ্বীপ; কিন্তু দরিদ্র যে দ্বীপ-দেশগুলো আছে; যেমন জামাইকা বা আরুবা– এগুলো নিয়ে একটি দল আছে। এছাড়া বেসিক গ্রুপ নামে আরেকটি নতুন গ্রুপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে– অর্থাৎ ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারত, চীন ইত্যাদি দেশ মিলে এই গ্রুপ তৈরি হওয়ার পথে। আরও একটি গ্রুপ হতে পারে, যেটা ইমার্জ করছে যার নাম হচ্ছে এমভিসি; এরা মোস্ট ভালনারেবল কান্ট্রিস। ২০১০-এর মে মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকাতে এরকম ১০টি দেশের একটি সম্মেলন হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন বা বিপর্যয় মোকাবেলা সংক্রান্ত সম্মেলনগুলোতে মূল আলোচনা হয় এই গ্রুপগুলোর মধ্যে। সুতরাং নেগোসিয়েশনের এই ধরনটা বুঝতে হবে। অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা গ্রুপ নিজেদের অবস্থান তৈরি করে এবং এরপর মূল প্ল্যানারিতে বা সভায় যায়; যেখানে নোগোশিয়েট করে সম্মত দলিলে পৌঁছতে চেষ্টা করে। কাজেই এলডিসি গ্রুপের অবস্থান বেসিক গ্রুপের অবস্থানের সঙ্গে মেলে না আবার আফ্রিকান দেশগুলো মনে করে তাদের চাওয়াগুলো অনেক বেশি জরুরি, তাদের খরা বন্যা ইত্যাদির কারণে দারিদ্র্য সবচেয়ে বেশি।

হালখাতা

পৃথিবী জুড়েই বাম-চিন্তাধারার মানুষেরা দার্শনিকভাবে পুঁজিবাদী বিশ্বের এ-ধরনের উদ্যোগের বিরোধিতা করছে। আবার সুশীল সমাজের লোকজন হয়তো ভিন্ন চিন্তা থেকে এর এক ধরনের বিরোধিতা করে; আবার এনজিওগুলো একটি অংশ এই প্রক্রিয়ার সমালোচনা করছে, প্রশ্ন হল আপনি বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে উল্লিখিত বিরোধিতাগুলোকে কীভাবে দেখেন?

আইনুন নিশাত

এখন যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, সারা পৃথিবীতেই বিশেষ করে রাজনীতিক মহলে এবং সব ধরনের প্রকাশমাধ্যমে জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার ধারাগুলো যেভাবে আলোচিত ও প্রকাশিত হয়, সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেগোসিয়েশন-রুমে আলোচনাটা যে ধারায় প্রবাহিত হয় সেই ধারা মোতাবেক হয় না। এর মূল কারণটা হচ্ছে এক্ষেত্রে আমরা যাদেরকে দৃশ্যমান দেখি তাদের প্রায় সকলেই হচ্ছে এক্টিভিস্ট। এই এক্টিভিস্টদের মূল আলোচনার ধারে কাছেও আসতে দেয়া হয়

না। এদের ২০/৩০ কিলোমিটার দূরে আটকে রাখা হয়। ধরা যাক্, যদি ঢাকায় মূল আলোচনা হয় তাহলে এক্টিভিস্টদের কাউকে নারায়ণগঞ্জ, কাউকে সাভার কাউকে টঙ্গীতে আটকে রাখা হয়েছে। ওখানে বসেই তারা লম্ফঝম্ফ করে, হৈ চৈ করে, গালাগালি করে। এদের মধ্যে অনেকেরই আবার রাজনৈতিক অবস্থান আছে। যারা একটু বামপন্থি তারা যুক্তরাষ্ট্রকে গালাগালি করবেই, যারা আবার যুক্তরাষ্ট্রপন্থি তারা চাইবে এটাকে পণ্য বানিয়ে বাজারজাত করতে। কাজেই মূল আলোচনার বাইরে যাদেরকে আমরা হৈ চৈ করতে দেখি তাদের এই হৈ চৈ-এর প্রয়োজন আছে। তারা মূল আলোচনাকে এক ধরনের চাপসৃষ্টি করছে। কিন্তু এরা যেহেতু মূল আলোচনা কক্ষের ধারেকাছেও নেই সে কারণে মূল আলোচনার ওপর এরা সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক কোনো প্রভাব রাখে না। তবে এদের দ্বারা দীর্ঘ-দূরবর্তী এবং দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব হয়তো রাখতেও পারে। দ্বিতীয়ত, ঐ রকম ২০/৩০ কিলোমিটার দূরে সুশীল সমাজের অনেক প্রতিনিধি এবং অনেক এনজিও হৈ চৈ করছে, বহু গরম গরম কথা বলছে; এরা বলে থাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে; প্রশ্ন হল, কে কাকে ক্ষতিপূরণ দেবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি কম ক্ষতি হচ্ছে? ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, তুষারঝড়– এ ধরনের দুর্যোগ দেশটিতে তো লেগেই থাকে! একেকটা বড় তুষারঝড় যখন হয় তখন ১০/১৫ দিনের জন্য সবকিছু বন্ধ ঘোষণা করতে হয়। এবং তাদের বহু দুর্যোগ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হয়েছে তার প্রমাণ পাচ্ছে বলেই তারা সিরিয়াস হচ্ছে। এখন একটা ব্যাপার তো আছেই যে, যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ইউরোপের দেশগুলো, জাপান কিংবা অস্ট্রেলিয়া– এদের হয়তো একটা বড় ক্ষতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা আছে। যেমন, ২০০৭-এ অস্ট্রেলিয়া খুবই সিরিয়াস হয়ে গেল জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার ব্যাপারে। এর আগে কিন্তু অস্ট্রেলিয়া জলবায়ু নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামাত না। কারণ হল, অস্ট্রেলিয়া প্রতি বছর ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন গম উৎপাদন করে কিন্তু জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে সে-বছর অস্ট্রেলিয়ায় মাত্র ৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন গম উৎপাদিত হয়েছিল। তখন যাদের পয়সা ছিল তারা ভিয়েতনাম-থাইল্যান্ড থেকে চাল-গম কিনে নিয়ে গেছে। কিন্তু ২০০৭-এ বাংলাদেশেও জলবায়ুগত কারণে উৎপাদন কমে যাওয়ায় চালের বাজারে খুব খারাপ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

হালখাতা

সম্মেলন কক্ষে, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে আগত নানা দেশের প্রতিনিধিরা শুধু যেতে পারেন, সেই কক্ষটিতে সম্মেলনকেন্দ্রিক কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে। আমরা জেনেছি বেশ কিছু ধাপে সে কাজগুলো হয়, সেই ধাপগুলো সম্পর্কে কিছু বলুন...

আইনুন নিশাত

সম্মেলনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো লেয়ার লক্ষণীয়। এর মধ্যে একটি লেয়ার হল যে, অনেক দূরে হৈ চৈ হচ্ছে, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হচ্ছে, বড় বড় কথা হচ্ছে ইত্যাদি।

দ্বিতীয় লেয়ারটি হচ্ছে, সম্মেলন কক্ষের আশ-পাশে একটি গ্রুপের লোকজন হৈ চৈ করছে যাদেরকে সম্মেলন কক্ষের ভেতরে আসতে দেয়া হচ্ছে না। তৃতীয়ত, সভাকক্ষের ভেতরে টেকনিক্যাল আলোচনা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জ্ঞানভিত্তিক আলোচনা হচ্ছে, জ্ঞানের আদান-প্রদান হচ্ছে, রাষ্ট্রদূতরা সেখানে বসছেন– । চতুর্থত হচ্ছে, সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে– প্রতি আধা ঘণ্টা পরপর সংবাদ সম্মেলন হচ্ছে, সেই সম্মেলনে কেউ না কেউ কিছু কথা তুলে ধরছে। এরপরই হচ্ছে সভাকক্ষের একেবারে ভেতরে কী হচ্ছে;

সভাকক্ষের একেবারে ভেতরে একটা হল রাষ্ট্রীয় উঁচু পর্যায়ের মন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রতিনিধিদের মধ্যে দলগতভাবে আলোচনা হচ্ছে, করিডোরে আলোচনা হচ্ছে; কাজেই আমি বলতে চেষ্টা করছি, বিশ্বের সকল দেশ যার যার স্বার্থ সে-তো দেখবেই, আর কোনো দেশ কাউকে কোনো কথা দিলে সেটা তো রাখতে হবে– সুতরাং কোপেনহেগেনে হয়তো আরও অনেক বেশি সফলতা আসতে পারত; সেই আকাঙ্ক্ষিত সফলতা আসেনি রাজনৈতিক কারণে। এই কোপেনহেগেনকেই সামনে ধরে কানকুনে ২০১০-এর ডিসেম্বরের সম্মেলনে কতটা অর্জিত হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। বড় কথা হচ্ছে এটা একটা ধারাবাহিক বিষয়, তাই কানকুনই শেষ কথা নয়, তার পরের সম্মেলন হবে ২০১১-তে জোহান্স বার্গে। ২০১২-তে হবে সম্ভবত কোরিয়াতে। সম্মেলনের ভেতর দিয়ে মূল কাজকে প্রতি বছর এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়কে মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলুন...

আইনুন নিশাত

সারা বিশ্বই জলবায়ু বিপর্যয়ের ব্যাপারে চিন্তিত, এটা শুধু বাংলাদেশের একক কোনো সমস্যা নয়। সমস্যার সমাধানও কেবল বাংলাদেশ-কেন্দ্রিক নয়। তবে বাংলাদেশের এ-বিষয়ক প্রস্তুতি ও কর্মকাণ্ড বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে, বাংলাদেশ ২০০৯ সালে ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে, সেটাকে কেবিনেট-এ অনুমোদিত হয়েছে এবং জাতীয় দলিল হিসেবে সেটি গেজেটেড হয়েছে। এখন কোনো বিজ্ঞলোক যদি এটিকে মানতে না-চান তাহলে আমার তো কিছু করার নেই, আমি তো এটা রাষ্ট্রীয় দলিল হিসেবেই গ্রহণ করছি।

আমাদের "ক্লাইমেট এ্যাকশন প্ল্যানে"-এ ছয়টি বিল্ডিং ব্লক আছে; প্রথমেই সেখানে বলা হয়েছে, আমাদের খাদ্য-নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য-নিরাপত্তা এবং জীবিকা-নিরাপত্তা করতে হবে; সেটা অ্যাডাপটেশনের মাধ্যমে করা সম্ভব হবে। দ্বিতীয়ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে এবং সেটা মোকাবেলার প্রস্তুতি জোরদার করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে; সেক্ষেত্রে উপকূলীয় বাঁধ, বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ

ইত্যাদি রয়েছে। চতুর্থত বলেছি, এসবের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ইত্যাদি কাজগুলো করতে হবে। পঞ্চমত "নো কার্বন" উন্নয়ন পদ্ধতি অর্থাৎ মিটিগেশন-এর সর্বাত্মক সুবিধাটুকু আমরা নিতে চাই। এবং ষষ্ঠ বিষয়টি হল প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি। বাংলাদেশ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিজের তহবিল থেকে অর্থায়ন করেছে, বাংলাদেশই হল একমাত্র দেশ যে তার বার্ষিক বাজেট খাতে সাতশ কোটি টাকা বা ১০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে। ২০০৯-এ ১০০ মিলিয়ন এবং ২০১০ এর ১০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ২০০ মিলিয়ন ডলার বা ১০০০ কোটি টাকা এবং এই টাকাটা এখন ব্যয় হওয়া শুরু হয়েছে। এছাড়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য তারা ১১০ মিলিয়ন ডলার দিয়েছে।।

হালখাতা
এই পরিমাণ টাকা কি যথেষ্ট?

আইনুন নিশাত
মোটেই না, আমাদের হিসাব হচ্ছে যে আগামী ১০ বৎসরে অন্তত ১০ মিলিয়ন ডলার লাগবে। এখন পর্যন্ত যে টাকা পাওয়া গেছে তা দিয়ে প্রাথমিক কাজ শুরু করা হচ্ছে।

হালখাতা
হালখাতার পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই কৃতজ্ঞতা, ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যেও হালখাতাকে সময় দেয়ার কারণে।

আইনুন নিশাত
হালখাতাকেও ধন্যবাদ।

টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

কা জী খ লী কু জ্জ মা ন আ হ ম দ

টেক্সই উন্নয়নের ধারণা

টেক্সই উন্নয়নের ধারণায় মোদ্দা বিষয় হচ্ছে, মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবিক মৌলিক চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা করা এবং তা এমনভাবে করা যাতে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং পৃথিবীর জীবন-সহায়ক প্রাকৃতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াসমূহ বিদ্যমান ও কার্যকর থাকে। প্রচলিত ব্যবস্থায় অর্থনীতির সঙ্গে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব এবং বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু টেক্সই উন্নয়ন ধারণা এ সকল দ্বন্দ্বের নিরসন ও বিষয়গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নিবিষ্ট। বর্তমান প্রজন্মকে এমনভাবে তাদের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনসমূহ মেটাতে হবে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মসমূহ ওদের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন যথাযথভাবে মেটাতে পারে। একই সাথে বর্তমান প্রজন্মের সকলেই যাতে ন্যায্যভাবে সকল অগ্রগতির অংশীদার হতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

এই ধারণাগুলোর প্রেক্ষিতে টেকসই উন্নয়নের তিনটি স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়েছে: অর্থনৈতিক, মানবিক/সামাজিক, এবং পরিবেশগত। তিনটি প্রক্রিয়াকে সমন্বিত নীতি-কাঠামোর আওতায় এগিয়ে নিতে হবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি দারিদ্র্য নিরসনসহ উন্নততর জীবনমানের জন্য প্রয়োজন। তবে মানবিক/সামাজিক বিধিব্যবস্থা এমন হতে হবে যাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সকলেই ন্যায্যভাবে অংশীদার হতে পারে, ন্যায্যভাবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এবং সকলের মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সমৃদ্ধ হয়, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সকল মানুষ সার্বিকভাবে উন্নততর জীবনযাপনের সুযোগ পায়। এই আর্থ-সামাজিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশ অবশ্যই যথাযথভাবে সংরক্ষিত হতে হবে। অন্যথায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি মুখ থুবড়ে পড়বে এবং নানা প্রকার দূষণে মানুষের জীবন হয়ে উঠবে অতিষ্ঠ, জর্জরিত। এছাড়াও পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

টেক্সই উন্নয়ন যেখানে লক্ষ্য সেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাপনা থেকে আলাদা করে বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই। অর্থাৎ একটি সমন্বিত নীতিকাঠামোর আওতায় অর্থনৈতিক সামাজিক ও পরিবেশগত প্রক্রিয়াগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা টানাপোড়েন সৃষ্টি হবে এবং উন্নয়ন টেক্সই হবে না।

টেক্সই উন্নয়নের পথে বিরাজমান সংকট

সাম্প্রতিক সময়ে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে তবে এর অধিকাংশই উন্নত বিশ্বে। অবশ্য অনেক উন্নয়নশীল দেশে, এমনকি অনেক স্বল্প-আয়ের দেশেও উল্লেখযোগ্য হারে অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে। তবে পাশাপাশি সর্বত্র বৈষম্য বেড়েছে প্রকটভাবে। উন্নত দেশসমূহ এবং অতিদরিদ্র দেশসমূহের মধ্যে এবং কি উন্নত, কি মধ্যআয়ের, কি স্বল্পআয়ের সকল দেশে অভ্যন্তরীণভাবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হয়েছে, আরো হচ্ছে। আর প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, শিল্প উৎপাদনে, কৃষি উৎপাদনে, বিদ্যুৎ উৎপাদনে ও বিতরণে, বিভিন্ন প্রকার পরিবহনে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল প্রক্রিয়া এবং যে ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে এবং হচ্ছে তার ফলে বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জিভূত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার গ্রিনহাউজ গ্যাস। এর ফলে পৃথিবীর উষ্ণতা এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে চলেছে। এছাড়াও বিশেষ করে অনুন্নত দেশসমূহে বাতাস দূষণ, পানি দূষণ ও পারিপার্শ্বিকতা দূষণ ব্যাপকভাবে বাড়ছে। কাজেই বর্তমান বাস্তবতা হল: আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি হয়েছে এবং হচ্ছে, কিন্তু অর্থনৈতিক মানবিক/সামাজিক উন্নয়নে বৈষম্য প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে, পরিবেশের ভারসাম্য দ্রুত বিনষ্ট হচ্ছে এবং জলবায়ু অনভিপ্রেত পথে দ্রুত ও গভীরভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

এই বাস্তবতা থেকে মুক্তির পথপরিক্রমা নির্ধারণের মৌলিক উপাদানসমূহ টেক্সই উন্নয়ন ধারণায় বিদ্যমান। টেক্সই উন্নয়নের পথ নির্মাণে বিশ্বব্যবস্থা সকল দেশের ন্যায্য অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি দেশকে সেখানে বিরাজমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-পরিবেশগত বাস্তবতার আলোকে নীতি নির্ধারণ এবং কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। তবে উন্নয়নশীল, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষেত্রে যথাযথ আন্তর্জাতিক আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক বিষয় হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউজ গ্যাস পুঞ্জিভবনের কারণে জলবায়ু পরিবর্তন অর্থাৎ পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও সমুদ্রস্ফীতি এবং এর ব্যাপক বিরূপ প্রভাব। এ বিষয়ে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্যানেল-এর (Intergovernmental Panel on Climate Change) বা আইপিসিসির (IPCC) **চতুর্থ মূল্যায়ন**। টেক্সই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই আইপিসিসির **চতুর্থ মূল্যায়ন** থেকে প্রথমে কিছু তথ্য

উপস্থাপন করব, তারপর স্টার্ন (ঘরপযড়ষধং ঝঃবৎহ) রিপোর্ট থেকে কিছু বক্তব্য সংযোজন করা এবং তারপর যথাক্রমে বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-পরিবেশগত বাস্তবতা ও ২০০৭ সালে ঘটে যাওয়া দুটি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং টেক্সই উন্নয়ন সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব। উল্লেখ্য আইপিসিসির পূর্ববর্তী মূল্যায়নগুলো যথাক্রমে ২০০১ (তৃতীয় মূল্যায়ন), ১৯৯৫ (দ্বিতীয় মূল্যায়ন); এবং ১৯৯০-এ (প্রথম মূল্যায়ন) সমাপ্ত করা হয়েছিল।

আইপিসিসি চতুর্থ মূল্যায়ন

মূল্যায়নটি মূলত তিনখণ্ডে সম্পন্ন করা হয়েছে। সারাবিশ্ব থেকে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়ে গঠিত তিনটি ওয়ার্কিং গ্রুপ এই মূল্যায়নটি তৈরি করে। গ্রুপগুলো যথাক্রমে: ওয়ার্কিং গ্রুপ-১, জলবায়ু পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা (The physical science basis); ওয়ার্কিং গ্রুপ-২, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং উদ্ভূত ঝুঁকিসমূহ এবং পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো অর্থাৎ ঝুঁকিসমূহ থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ (Climate change impacts, adaptation and vulnerability); এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ-৩– গ্রিনহাউজ গ্যাসের উৎসারণ নিয়ন্ত্রণ (Mitigation of climate change)। বিশেষজ্ঞরা এসকল রিপোর্ট তৈরি করেন তবে এগুলো গৃহীত হতে হয় সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সরকার দ্বারা। তাই একটি রিপোর্ট তৈরি হওয়ার পর সরকারসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একত্র হয়ে তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে পরিবর্তন-পরিমার্জন করে রিপোর্টটি গ্রহণ করেন। বিশেষজ্ঞরা এই পর্যায়েও প্রয়োজনীয় সহায়তা দিয়ে থাকেন। এসকল মূল্যায়ন প্রস্তুত করা হয় বিশ্বজোড়া সম্পাদিত উচ্চমানসম্পন্ন সংশ্লিষ্ট গবেষণাকর্মের ওপর ভিত্তি করে। চতুর্থ মূল্যায়নের ওয়ার্কিং গ্রুপ-১ এর রিপোর্টটি ফেব্রুয়ারি ২০০৭, ওয়ার্কিং গ্রুপ-২-এর রিপোর্টটি এপ্রিল ২০০৬, এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ-৩ এর রিপোর্টটি মে ২০০৭-এ সরকারসমূহ দ্বারা গৃহীত হয়। এছাড়াও কয়েকটি বিশেষ রিপোর্টও প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রথমে **চতুর্থ মূল্যায়নের** দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উপসংহার উল্লেখ করছি। পরে **এই মূল্যায়ন** থেকে অন্যান্য কিছু তথ্য ও উপসংহার তুলে ধরব।

এক, ২০০১ সালে সম্পন্ন **তৃতীয় মূল্যায়নে** বলা হয়েছিল যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে উঁচু মাত্রার ঝুঁকির সম্মুখীন কেননা এই দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবের প্রথম সারিতে রয়েছে এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার ক্ষমতা তাদের খুবই সীমিত। এই সিদ্ধান্ত **চতুর্থ মূল্যায়নে** আরো জোরালো স্বীকৃতি পেয়েছে। **চতুর্থ মূল্যায়নে** আরো বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হচ্ছে এবং এর বিপদসংকুল প্রভাব দ্রুততর গতিতে এগিয়ে আসছে।

দুই, বায়ুমণ্ডলে নির্গত গ্রিনহাউজ গ্যাস দ্রুত স্থিতিশীল করা গেলেও মানুষ কর্তৃক এযাবৎ উৎসারিত গ্রিনহাউজ গ্যাসের ফলেই বৈশ্বিক উষ্ণতা এই শতাব্দী বা তারও

বেশি সময় ধরে বাড়তে থকবে (কেননা, জলবায়ু বিবর্তন প্রক্রিয়াসমূহের একে অপরকে প্রভাবিত করার ক্রিয়াকর্ম দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে)। কিন্তু মূল্যায়নে দেখা যায় যে, গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণ আগামী অনেক দশক ধরে বাড়তে থাকবে (এ সম্বন্ধে পরে কিছু তথ্য দেয়া হবে)।

এবার চতুর্থ মূল্যায়নের ওয়ার্কিং গ্রুপ–১ এর রিপোর্ট থেকে কিছু তথ্য নিম্নে দেয়া গেল–

সময়কাল	গড় বৈশ্বিক উষ্ণায়ন	গড় সমুদ্রস্ফীতি
১৯৮০-১৯৯৯ থেকে ২০৯০-২০৯৯ নাগাদ	১.৮ ডিগ্রি ৪.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস	১৮ সেন্টিমিটার–৫৯ সেন্টিমিটার

দেখা যাচ্ছে যে, বিগত শতাব্দীর শেষের দিকের তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদই বৈশ্বিক গড় উষ্ণতা ১.৮° থেকে ৪.০° সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে যাচ্ছে, এমনকি এই বৃদ্ধি ৬.৪° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। এই প্রাক্কলন সারা বিশ্বের গড়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মাত্রার উষ্ণায়ন ঘটতেই পারে।

বিংশ শতাব্দীতে (শুরু থেকে শেষ নাগাদ) বৈশ্বিক উষ্ণতা ০.৬° ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে। সেই তুলনায় বর্তমান শতাব্দীতে প্রাক্কলিত উষ্ণতা বৃদ্ধি অনেক বেশি ও দ্রুততর। একইভাবে সমুদ্রস্ফীতিও এই শতাব্দী ধরে বাড়তে থাকবে যা বিগত শতাব্দীর শেষ দিকের তুলনায় বর্তমান শতাব্দীর শেষ নাগাদ ১৮ সেন্টিমিটার থেকে ৫৯ সেন্টিমিটার হবে বলে মূল্যায়ন করা হয়েছে।

চতুর্থ মূল্যায়নের **ওয়ার্কিং গ্রুপ-২**-এর রিপোর্ট বিবেচনা করার আগে সঙ্গত কারণে এর **ওয়ার্কিং গ্রুপ-৩**-এর রিপোর্টের দিকে দৃষ্টি দেয়া যায়। নানা প্রাপ্ত তথ্য, অনেক বিশ্লেষণ ও ব্যাপক মতৈক্যের ভিত্তিতে **ওয়ার্কিং গ্রুপ-৩**-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, শিল্প বিপ্লব-পূর্ব সময় থেকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বাড়ছে তবে ১৯৭০ থেকে ২০০৪ সময়ে তা ৭০ শতাংশ বেড়েছে। আর এই বৃদ্ধি মানুষ কর্তৃক পরিচালিত নানা কর্মকাণ্ডের কারণে প্রধানত ঘটেছে।

বিভিন্ন রকমের গ্রিনহাউজ গ্যাসের উৎসারণ বিভিন্ন হারে বেড়েছে এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক/অবকাঠামোগত/সামাজিক খাত থেকে উৎসারিত গ্যাসও বিভিন্ন হারে বেড়েছে। খাত হিসাবে জ্বালানিখাত থেকে সরাসরি গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণের হার সবচেয়ে বেশি। ১৯৭০-২০০৪ সময়ে তা ১৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তারপর রয়েছে পরিবহন (১২০ শতাংশ), শিল্প (৬৫ শতাংশ) এবং ভূমি ব্যবহার ও ভূমি ব্যবহারে পরিবর্তন এবং বন ব্যবহার (৪০ শতাংশ)। কৃষি ও নির্মাণে ১৯৭০ থেকে ১৯৯০ সময়ে সরাসরি গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বেড়েছে যথাক্রমে ২৭ শতাংশ ও ২৬ শতাংশ তবে পরবর্তী সময়ে আর তেমন বাড়েনি। কিন্তু নির্মাণে যেহেতু প্রচুর পরিমাণ জ্বালানি

ব্যবহৃত হয়, নির্মাণখাত থেকে নির্গত মোট গ্রিনহাউজ গ্যাস এ-খাত থেকে এর সরাসরি নির্গমন থেকে অনেক বেশি।

ওজনবেষ্টনী (Ozone layer) হ্রাসকারী গ্যাসসমূহের নির্গমন মন্ট্রিয়ল চুক্তি অনুসরণের ফলে ১৯৯০ থেকে ২০০৪ সাল নাগাদ প্রায় ২০ শতাংশ কমেছে এবং বিভিন্ন দেশে জলবায়ু-পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা, জ্বালানি-নিরাপত্তা বিধানসহ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করায় অনেক দেশে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ কিছু কমেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মোট হ্রাস এত কম হয়েছে যে তা বৈশ্বিক গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখেনি।

দেশে দেশে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণ হ্রাস এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে গৃহীত নীতি এবং কার্যক্রম-এর সার্বিক মূল্যায়ন (সংশ্লিষ্ট নানা তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সেই আলোকে প্রতিষ্ঠিত মতৈক্যের ভিত্তিতে তৈরি) থেকে দেখা যায় যে, আগামী দশক-দশক ধরে গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন উল্লেখযোগ্য হারে বাড়তে থাকবে। অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি আরো প্রকট ও দীর্ঘমেয়াদি হবে। অবশ্য যেসকল দেশ অধিকহারে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎক্ষেপণ করে সেসকল দেশ যদি খুব দ্রুত গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে তবে দীর্ঘমেয়াদে গ্রিনহাউজ গ্যাস পরিস্থিতি ও উদ্ভূত বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধির হার অনেকটা নিয়ন্ত্রণে আসা সম্ভব। এবার **ওয়ার্কি গ্রুপ-২**-এর রিপোর্টের দিকে নজর দেয়া যাক। আগেই বলা হয়েছে, এর বিষয়বস্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকি এবং উদ্ভূত অবস্থার মোকাবেলা করা। **তৃতীয় মূল্যায়নে** সিদ্ধান্ড় টানা হয় যে, জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ (natural systems) ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড (human systems) দু'য়ের ওপরই এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।[১]

চতুর্থ মূল্যায়নে এই সিদ্ধান্ত জোরালোভাবে সমর্থন করা হয়েছে। তদুপরি বিভিন্ন মহাদেশ এবং প্রায় সকল মহাসাগর সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই মূল্যায়নে বলা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে পরিবর্তন, বিশেষ করে উষ্ণতাবৃদ্ধি বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটছে।

এই রিপোর্ট (অর্থাৎ চতুর্থ মূল্যায়নের ওয়ার্কিং গ্রুপ-২-এর রিপোর্ট) থেকে আরো জানা গেছে:

সর্বত্রই জমাটবাঁধা বরফ দ্রুত আক্রান্ত হচ্ছে এবং ক্রমবর্ধমানভাবে গলে যাচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোতে ঝুঁকি বাড়ছে। পাহাড়গুলোতে ধস নামছে এবং মেরু অঞ্চলগুলোতে ও সমুদ্রে জমাটবাঁধা বরফে পরিবর্তন ঘটছে।

দ্রুত বরফ গলে যাওয়া এবং বৃষ্টির প্রকোপ বাড়ার কারণে জলপ্রবাহের উচ্চতার পর্যায় এবং সময় বদলে যাচ্ছে; হ্রদ এবং নদীর জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে বদলে যাচ্ছে

জলের গুণগত মানের কাঠামোও; এবং ক্রমবর্ধমান উষ্ণতাবৃদ্ধি ও সমুদ্রস্ফীতির ফলে উপকূলীয় এলাকাসমূহ উচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন এবং জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হচ্ছে।

কৃষি (খাদ্য, শস্য, আঁশ ইত্যাদি) বন সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শিল্প উৎপাদন, মানুষের স্বাস্থ্য, বাসস্থানসহ আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঝুঁকি ক্রমবর্ধমান। দক্ষিণ এশিয়ায় তা ইতিমধ্যেই উচ্চমাত্রায় পৌঁছে গেছে।

মোদ্দা কথা, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মানুষের জীবনধারণ বিভিন্ন ধরনের বিরূপ প্রভাবের মুখোমুখি এবং তা আগামী দিনগুলোতে বাড়তেই থাকবে, বিশেষ করে যদি অর্থনৈতিক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড এবং মানুষের জীবন-যাপন যেভাবে চলে আসছে সেভাবেই চলতে থাকে।

এছাড়া, এই রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত নিম্নোক্ত তথ্য ও উপসংহারের দিকে নজর দিলে (যথাযথ ব্যবস্থা না করা হলে) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কী পরিমাণ ভয়াবহ হতে পারে তা প্রতীয়মান হবে:

বৈশ্বিক উষ্ণতা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেলে আরো ১২০ কোটি পর্যন্ত মানুষ এশিয়ায় এবং আরো ২৫ কোটি পর্যন্ত মানুষ আফ্রিকায় পানি-স্বল্পতার মুখোমুখি হতে পারে। এছাড়াও ভারতে ভুট্টা ও গমের উৎপাদনশীলতা ৫ শতাংশের মতো কমে যাবে।

যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়ে তবে চীনে চালের উৎপাদনশীলতা ১২ শতাংশ কমে যাবে, এশিয়ায় ২০ লাখের মতো মানুষ উপকূলীয় বন্যার মুখোমুখি হবে এবং এশিয়া ও আফ্রিকায় আরো ১৬০ কোটি পর্যন্ত মানুষ পানি-স্বল্পতার মুখোমুখি হতে পারে। উষ্ণতা আরো বেশি হলে সমস্যাগুলো আরো প্রকট হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সহস্রাব্দ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি পৃথিবীর সেই সমস্ত এলাকায় বিশদভাবে দেখা দিবে যেখানে বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান (যেমন ভূমির মান অবনয়ন, বিশ্বায়ন-উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক সমস্যা, এমনিতেই নানান ধরনের অসুখ-বিসুখের প্রাদুর্ভাব রয়েছে, অর্থনৈতিক অতি-দুর্বলতা, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা এবং অব্যবস্থা, ইত্যাদি)।

উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার লক্ষ্যে জরুরি পদক্ষেপসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত দিকনির্দেশনা এই রিপোর্ট থেকে পাওয়া যায়:

জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ (adaptation) খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য। বাংলাদেশের মতো জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব-আক্রান্ত প্রথম সারির দেশগুলোর জন্যও তো রয়েছেই, কেননা গ্রিনহাউজ গ্যাসের উৎসারণ যদি আজই বন্ধ করে দেয়া যেতে পারে তবুও বৈশ্বিক উষ্ণতা আরো দীর্ঘদিন ধরে বেড়ে চলবে।

একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর লক্ষ্যে উপযোগী বিভিন্ন পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন এবং অপরদিকে অবশ্যই গ্রিনহাউজ গ্যাসের উৎসারণ দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা জরুরি যাতে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া আরো গুরুতর রূপ ধারণ না করে এবং যথাসময় তা নিয়ন্ত্রণে আসে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি এখনই জোরালোভাবে শুরু না করা হলে এই শতাব্দীর শেষ নাগাদ গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে।
একথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, জলবায়ু সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পরিকল্পনা সহস্রাব্দ লক্ষ্যসমূহ অর্জনের নিমিত্তে নীতিমালা ও পরিকল্পনা ওতপ্রোতভাবে পরস্পর সম্পর্কিত। টেকসই উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত উন্নয়ন একসূত্রে গ্রথিত হতে হবে। এর মূল সুর সকল প্রকার উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নানা ঝুঁকির যথাযথ মূল্যায়ন এবং সেগুলোর নিরসনে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ।

চতুর্থ মূল্যায়নের ওয়ার্কিং গ্রুপ-২-

এর রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত উপর্যুক্ত তথ্য ও দিক-নির্দেশসমূহের ভিত্তিতে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে, বিশ্ববাসীকে একযোগে একদিকে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার মাধ্যমে ঝুঁকির মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যথাযথ নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশগুলোর সহস্রাব্দ লক্ষ্যসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য যাতে অর্জিত হতে পারে তার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিমাণ ও কাঠামো জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে হবে।
অপরদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় স্থানীয় জনগোষ্ঠী যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। সেজন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং একই সঙ্গে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যাতে দ্রুত ঘটে সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত স্টার্ন রিপোর্ট

যুক্তরাজ্যে স্টার্ন (Nicholas Stern) রিভিউ থেকে শিক্ষণীয় রয়েছে। এই রিভিউতে খাপ-খাওয়ানোর (এডাপটেশনের) ওপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে:

অতি দরিদ্র দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন, জলবায়ু-ব্যবস্থাপনা উন্নয়ননীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে এবং উন্নত দেশসমূহ তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র দেশগুলোকে উন্নয়ন সহায়তা দিতে হবে। আরো বলা হয়েছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত-এর ওপর আঞ্চলিক তথ্য সংগ্রহ ও উন্নয়নে এবং বন্যা ও খরা সত্ত্বেও ফলন ভালো হবে এরকম শস্যের উদ্ভাবনে গবেষণা পরিচালনায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশের বাস্তবতা

আগেই বলা হয়েছে টেকসই উন্নয়নের তিনটি মূল স্তম্ভ (অর্থনৈতিক, সামাজিক/মানবিক, পরিবেশগত) রয়েছে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক/মানবিক বিবেচনা

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত ১০/১২ বছর ধরে গড়ে বছরে ৫.৪ শতাংশ হারে জাতীয় উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য এবং কয়েকটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশ বাদ দিলে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্জন অন্যান্য সকল উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বেশি। তবে পাশাপাশি বৈষম্য প্রকটভাবে বেড়েছে। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, বৈষম্য পরিমাপক GINI coefficient আয়ের ক্ষেত্রে ২০০০ সালে ছিল ০.৪৫১ যা ২০০৫ সালে ০.৪৬৭-এ উন্নীত হয়েছে অর্থাৎ আয়বৈষম্য ৫ বছরে অনেক বেড়ে গেছে।২.ক্রয়ক্ষমতায়-ভারসাম্য-সম্পন্ন (Purchasing Power Parity—PPP) এক মার্কিন ডলারের কম মাথাপিছু দৈনিক আয়ে (অর্থাৎ বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ২২ মার্কিন সেন্ট যা বাংলাদেশী ১৫ টাকার কম মাথাপিছু দৈনিক আয়ে) জীবন-যাপন করতে বাধ্য এরকম অতিদরিদ্র মানুষের অনুপাত এদেশে ৩৬ শতাংশ। আর ভারসাম্য-সম্পন্ন দুই ডলার বা ৩০ টাকার কম মাথাপিছু দৈনিক আয়ে জীবন-যাপন করতে হয় প্রায় ৮৩ শতাংশ মানুষের। এই হিসেব ২০০০ সালের। পরবর্তীতে কিছুটা উন্নতি হলেও প্রাপ্ত অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে,এক্ষেত্রে তেমন অগ্রগতি ঘটেনি।[৩] বলাবাহুল্য মানব-মর্যাদায় বিভিন্ন ধরনের ও পর্যায়ের ঘাটতি রয়েছে এই বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর, বিশেষ করে অতিদরিদ্রদের জন্য সারাটি জীবনই ঘানিটানা আর ভোগান্তির নামান্তর মাত্র। সমসুযোগের সমাজ সৃষ্টির তাগিদ আমাদের সংবিধানে থাকলেও এদেশে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি প্রকটভাবে নানাস্তরে বিভাজিত সমাজ। অর্থাৎ এদেশে একটি নয় অনেক সমাজ রয়েছে। বাংলাদেশের সমাজকে পিরামিডের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বিশাল দারিদ্র্য, পিছিয়েপড়া এবং মানবমর্যাদা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অবস্থান পিরামিডের নিচের অংশে। এর উপরে একে একে যাদের অবস্থা ক্রমান্বয়ে ভালো সেই সকল ক্রমে ছোট হয়ে আসা গোষ্ঠীর অবস্থান এবং চূড়ায় অবস্থান সমাজের একটি ক্ষুদ্র ধনী-অভিজাত-সামাজিক-রাজনৈতিক-প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর। এ ধরনের সমাজ টেকসই নয়। টেকসই সমাজ সৃষ্টির জন্য

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহ সকলের ন্যায্য অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে রচিত ও বিবর্তিত হওয়া জরুরি। তাই সকলের জন্য সমসুযোগ, মানবধিকার ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে হবে। অবশ্যই প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাত্রা আরও অনেক বাড়াতে হবে। দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার উদাহরণ টানলে দেখা যায় যে, এ সকল দেশ দীর্ঘ সময় ধরে প্রবৃদ্ধির হার ৯-১০ শতাংশ বা তারও বেশি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। ভারতেও প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দারিদ্র্যনিরসন ও সামাজিক উন্নতির অর্থনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রবৃদ্ধি ৮-১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং তা ধরে রাখতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে সকল মূল সমস্যার সম্মুখীন সেগুলো হল নিম্নরূপ:

● বিনিয়োগের জন্য সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎসের ক্ষেত্রেই। রাজস্ব আদায় জাতীয় আয়ের মাত্র ১০ দশমিক ৫০ শতাংশ। বর্তমানে বৈদেশিক সরাসরি বিনিয়োগ বছরে জাতীয় আয়ের এক-শতাংশের অর্ধেক বা তারও কম এবং বিদেশি ঋণ ও সাহায্য নিট হিসেবে প্রায় একই পর্যায়ের। বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে একমাত্র উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হচ্ছে বিদেশে কর্মরত এদেশের শ্রমজীবী মানুষ দ্বারা প্রেরিত অর্থ। আর তা এ বছরে ৬০০ কোটি ডলারে পৌঁছে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে; যা জাতীয় আয়ের প্রায় ৯-১০ শতাংশ।

বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সংখ্যা নগণ্য থেকে গেছে। পুরো রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের অধিক আসে মাত্র পাঁচটি পণ্য-গ্রুপ থেকে যথা: বোনা পোশাকসহ তৈরি পোশাক, হিমায়িত মাছ, চামড়া, কাঁচা পাট ও পাটজাত পণ্য এবং ফার্নেস তেল। শুধু তৈরি ও বোনা পোশাক থেকেই আসে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ। বিপরীতে আমদানির তালিকা বিশাল যেমন তেল ও তেলজাত পণ্য, যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, শিল্পের জন্য কাঁচামাল, খাদ্য-শস্য এবং বহুবিধ ভোগ্যপণ্য। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি থাকে বিশাল।

আরো একটি প্রকট সমস্যা হচ্ছে জ্বালানিসমস্যা। দেশে ব্যবহৃত মোট জ্বালানির ৬৫ শতাংশ জৈবজ্বালানি ও ৩৫ শতাংশ বাণিজ্যিক (প্রাকৃতিক গ্যাস ২৫%, তেল ৮%, জলবিদ্যুৎ ২%, কয়লা সামান্য)। দেশে ব্যবহৃত মাথাপিছু মাত্র ১৫৩ তেলসম কিলোগ্রাম বা (২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী)। এই হার বিশ্বের অন্যতম সর্বনিম্ন এবং দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বনিম্ন যেখানে নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নেপাল। আর বিদ্যুৎখাতের দিকে তাকালে এক ভয়াবহ চিত্র দেখা যায়। সব মিলে জ্বালানি খাত হযবরল অবস্থায় আছে। এখনো পর্যন্ত বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে একটি সমন্বিত জ্বালানিনীতি রচিত ও গৃহীত হয়নি। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে আর্থ-সামাজিক সব ধরনের উন্নয়ন থমকে যাবে।

দেশে সকল পর্যায়ে মানবদক্ষতা নিম্নমানের বা যথাযথ স্তরের নয় বলে বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং তৎপরতা প্রকটভাবে বিঘ্নিত। সংখ্যার দিক থেকে শিক্ষার প্রসার উল্লেখযোগ্য হলেও মানের দিক থেকে প্রাথমিক পর্যায় থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অতি নিম্নমানের থেকে গেছে। পাশাপাশি দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ

ন্যূনতম স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা-ব্যবস্থা খুবই সীমিত আর যা আছে তা-ও মূলত অকার্যকর কেননা হাসপাতাল থাকলেও ওষুধ থাকে না বা ডাক্তার থাকেন না বা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়াও যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরীক্ষা/নিরীক্ষা করার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সাধারণত নেই, আর থাকলেও অতি নিম্নমানের। দারিদ্র্যের কারণে বেসরকারি খাত থেকে চিকিৎসা নিতে পারেন না সাধারণ মানুষ, আর অবশ্যই বিদেশে যেতে পারেন না যা মুষ্টিমেয় ধনী ব্যক্তিবর্গ করতে পারেন। ফলে সাধারণ মানুষ নানান রোগে ভোগেন। কাজেই অশিক্ষিত, স্বল্পশিক্ষিত বা অতি নিম্নমানের কিছু শিক্ষাগ্রহণকারী স্বাস্থ্যহীন মানুষ না নিজের জন্য, না দেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে উপযুক্ত অবদান রাখতে পারেন। আবার উপরের দিকে দক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে অর্থনৈতিক ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের পক্ষে কাজ করার ক্ষেত্রেও রয়েছে বড় ধরনের ক্ষমতার ঘাটতি। আরো দু'টি সমস্যা হচ্ছে বর্ষাকালে বন্যার প্রকোপ যা কয়েক বছর পরপর বিধ্বংসী রূপ ধারণ করে এবং শুকনো মৌসুমে পানির ব্যাপক অভাব। দুই ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে উৎপাদন বিনষ্ট হয় বা বিঘ্নিত হয়। পানিনীতি এবং জাতীয় পানিব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গৃহীত হলেও এখাতে উন্নতির লক্ষ্যে সম্ভাব্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য উল্লিখিত সমস্যাগুলো সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি যথাযথ অগ্রাধিকার নির্ণয় করা সাপেক্ষে প্রাপ্ত সম্পদের দুর্নীতিমুক্ত সুব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, টেক্সই উন্নয়নের জন্য অর্থনেতিক উন্নয়ন জরুরি তবে এই উন্নয়ন ন্যায্যভাবে সকলের মধ্যে সুবণ্টিত হতে হবে। সে জন্য নারী-পুরুষ-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের যথাযথ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। যেখানে সংখ্যায় ক্ষুদ্র একটি শ্রেণী সকল রকমের সুবিধা ভোগ করে এবং সম্পদের সিংহভাগ নিজেদের দখলে নিয়ে নেয় আর অপরপ্রান্তে থাকে হতদরিদ্র বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠী সেই সমাজ টেক্সই হতে পারে না। ন্যায্যভাবে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াসমূহের পুনর্বিন্যাস তাই জরুরি। কাজেই দরিদ্রদের জন্য শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নিশ্চিত করতে হবে সকলের জন্য মানবাধিকার ও আইনের শাসন। সকলের জন্য, বিশেষ করে পিছিয়ে-পড়া মানুষের জন্য নিশ্চিত করতে হবে টেকসই কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি যথাযথ সামাজিক চুক্তির আওতায় বেসরকারি উদ্যোগকেও উৎসাহিত করতে হবে। পিছিয়ে-পড়া মানুষের অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল খাতকে উৎসাহিত করতে হবে এবং সহযোগিতা দিতে হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: কৃষি, কৃষিসহায়ক ও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প; শহুরে ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় এবং অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ড; মৌলিক অবকাঠামো (বিদ্যুৎ, পানি, টেলিযোগাযোগ, যাতায়াত); এবং বাজার ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ। তেমনি উন্নত প্রযুক্তি বিশেষ করে তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধি করে দ্রুত

পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ব্যবস্থাও করতে হবে। টেক্সই উন্নয়নের তৃতীয় স্তম্ভ সুষ্ঠু ব্যবহার সাপেক্ষে প্রাকৃতিক পরিবেশ-সংরক্ষণ বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে যে, এক্ষেত্রে বর্তমান সময়ে সবচেয়ে আলোচিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জলবায়ু পরিবর্তন এবং আইপিসিসির **চতুর্থ মূল্যায়ন**-এর ভিত্তিতে বৈশ্বিক পর্যায়ে এর নানা দিক নিয়েও আগে আলোচনা করা হয়েছে। এখন এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাস্তবতা এবং জলবায়ু পরিবর্তন-ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে। আইপিসিসির রিপোর্টে সাধারণত দেশভিত্তিক নির্দিষ্ট আলোচনা তেমন থাকে না, অঞ্চলভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা এবং উপসংহার থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাক্কলিত বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক প্রভাব কিভাবে কোনো দেশে রূপলাভ করবে তা সেদেশে বিরাজমান বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে হবে। আইপিসিসির **চতুর্থ মূল্যায়নের ওয়ার্কিং গ্রুপ-২**-এর রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে, সবকিছু যেমন চলছে তেমন চলতে থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রাক্কলিত জয়বায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিম্নোক্তভাবে পড়বে:

হিমালয়ের জমাটবাঁধা বরফ দ্রুত গলার কারণে প্রাথমিকভাবে বন্যার প্রকোপ বাড়বে এবং পাথর-ধসও বাড়বে। তবে ২-৩ দশক পর যখন জমাটবাঁধা বরফ অনেক কমে যাবে তখন সংশ্লিষ্ট নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ কমে যাবে।

মিঠাপানির প্রাপ্যতা বিশেষ করে বড় বড় নদী অববাহিকায় (যেমন: গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা) জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কমে যাবে। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে পানির চাহিদা বেড়ে যাওয়ার কারণে অসংখ্য মানুষ পানি-সংকটে পড়তে পারে।

উপকূলীয় এলাকাগুলোর জন্য সমুদ্র থেকে জলোচ্ছ্বাসের ফলে বন্যার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যাবে।

একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শস্যের উৎপাদনশীলতা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। এই বিষয়টি জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং নগর সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিবেচনায় নিলে এটি পরিষ্কার যে, ক্ষুধার ঝুঁকি কোনো কোনো দেশে অতি উঁচুমাত্রায় থাকবে। বিভিন্ন প্রকার পানি ও জীবাণুবাহিত রোগের কারণে স্বাস্থ্যহানি ও মৃত্যু উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যেতে পারে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বড় বড় এই তিনটি নদী-অববাহিকার সর্বনিম্নে বাংলাদেশের অবস্থান এবং দেশের বিশাল অংশ সমুদ্রপিঠ থেকে সামান্য উপরে অবস্থিত। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিম্নাঞ্চল ব্যাপক এবং বন্যার সময় নদীভাঙ্গন ব্যাপক আকারে ঘটে থাকে। পূর্ব-হিমালয় অঞ্চলে বছরে যত পানি প্রবাহিত হয় তার ৯০ শতাংশের অধিক বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। তাই বন্যার প্রবণতা এমনিতে বাংলাদেশে বেশি আর জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত বেড়ে গেলে এবং আগামী কয়েক দশক ধরে হিমালয়ে জমাটবাঁধা বরফ দ্রুত গলতে থাকলে বাংলাদেশে বিধ্বংসী বন্যার প্রকোপ যে অনেক বেড়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়াও সমুদ্রস্ফীতির কারণে বাংলাদেশের

ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা স্থায়ীভাবে প্লাবিত হয়ে যেতে পারে এবং লবণাক্ততা দেশের অভ্যন্তরে অনেকদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে।

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জোরালোভাবে ধারণা করা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব-আক্রান্ত একটি প্রথম সারির দেশ বাংলাদেশ আগামী কয়েক দশকের মধ্যে ২° ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি উষ্ণতাবৃদ্ধি এবং ৪৫° সেন্টিমিটার সমুদ্রস্ফীতির মুখোমুখি হতে পারে। সবকিছু যেমন চলছে তেমন চলতে থাকলে এর পরিণতি দেশের জন্য ভয়াবহ হবে। স্থায়ীভাবে প্লাবিত ও লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে দেশের ব্যাপক উপকূলীয় এলাকা ও অন্যান্য নিম্নাঞ্চল বসবাস এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ততা হারাবে। এসব এলাকার মানুষ শুধু যে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের কবলে পড়বে তা-ই নয় বরং তারা উদ্বাস্তুর কাতারে যোগদান করতে বাধ্য হবে।

বিধ্বংসী বন্যার প্রকোপ বাড়লে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও বাড়বে। বাড়িঘর, মাঠের শস্য, এবং ছোট ছোট শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাস্তাঘাট, টেলিযোগাযোগ ও স্কুল-কলেজসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো। বাংলাদেশে বড় বড় বন্যা সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, বন্যার সময় পানি ও জীবাণুবাহিত নানা রোগের (ম্যালেরিয়া, ডায়রিয়া, চর্মরোগ ইত্যাদি) ব্যাপক প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটে আর ব্যাপক ভাবে স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে যার ফলে সংশ্লিষ্ট মানুষেরা কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এ সকল গবেষণা থেকে এ-ও দেখা গেছে যে, বিধ্বংসী বন্যার ফলে অতিদরিদ্র মানুষ নিঃস্ব হয়ে যান, দরিদ্ররা অতিদরিদ্র হয়ে যান, এবং অনেক অদরিদ্র দরিদ্রদের স্তরে নেমে যান। কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাত ও বন্যার প্রকোপ বেড়ে গেলে বিশাল জনগোষ্ঠীর ভোগান্তি বিস্তর বাড়বে যদি-না যথাসময়ে যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় এবং তাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ব্যবস্থা করা হয়।

জীববৈচিত্র্য ব্যাপকভাবে বিনষ্ট হলে প্রাকৃতিক পরিবেশে ঝুঁকি বাড়বে এবং শস্য, মৎস্য, বনাঞ্চল ও পশু উৎপাদনে সমস্যা প্রকটতর হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আইপিসিসি-র **চতুর্থ মূল্যায়ন** অনুসারে দক্ষিণ এশিয়ায় শস্যের উৎপাদনশীলতা ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে। ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বাংলাদেশের বাস্তবতার কারণে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হিসেবে স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা বাংলাদেশেরই বেশি। অর্থাৎ এই শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত শস্যের উৎপাদনশীলতা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে কমে যেতে পারে। এ ছাড়াও এমনিতেই বছরে ভূমির অন্যান্য ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে দেশে মোট কৃষিজমির পরিমাণ প্রায় ১% হারে কমে যাচ্ছে। তদুপরি, সমুদ্রস্ফীতি ও লবণাক্ততার কারণে যদি দেশের কৃষিজমি আর কৃষিকাজে এক উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যবহার করা না যায় তবে সব মিলিয়ে দেশে এক ভয়াবহ খাদ্যসংকট সৃষ্টি হবে।

সুন্দরবনে বিশ্ব উত্তরাধিকার (World Heritage) সাইট এবং রামসার (Ramsar) সাইট রয়েছে। এগুলো সংরক্ষণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারাবদ্ধ কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পুরো সুন্দরবন সাংঘাতিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল খরা-প্রবণ। এই অঞ্চলের অনেক এলাকায় অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের প্রকট অভাব থাকায় অসংখ্য মানুষ মঙ্গা-আক্রান্ত। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই এলাকায় খরার প্রকোপ বাড়তে পারে এবং ফলে অবস্থার আরও অবনতি হতে পারে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে হিমালয়ে জমাটবাঁধা বরফ দ্রুত গলে যাচ্ছে এবং এরফলে শুষ্কমৌসুমে আঞ্চলিক নদীগুলোতে পানিপ্রবাহ প্রাথমিকভাবে বাড়বে কিন্তু পরে তা দ্রুত কমে যাবে এবং পানীয় জল, সেচ, জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে সংকট সৃষ্টি করবে অথবা বাড়াবে। বাংলাদেশের জন্য এর পরিণতি ভয়াবহ হতে পারে। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল যা দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (যেখানে দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ বাস করে) ইতোমধ্যেই পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যাপকভাবে বিপর্যস্ত। গঙ্গা থেকে প্রাপ্ত পানি আরো কমে গেলে এই অঞ্চলে সংকট আরো তীব্র হবে। অবশ্য গঙ্গা দিয়ে শুষ্কমৌসুমে এখন যে পানি আসে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে তা ধাবিত করার কোনো ব্যবস্থা গঙ্গায় না থাকায় তার অধিকাংশই বঙ্গোপসাগরে চলে যায়। ভবিষ্যতে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সংকট আরো তীব্রতর হতে পারে যদি দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়।

২০০৭ সালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২০০৭ সালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া পরপর দুটো বড় বন্যা এবং তারপর ১৫ নভেম্বর তারিখে অত্যন্ত শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় সিডর কি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে নাকি সাধারণ প্রাকৃতিক বিবর্তনের অনুষঙ্গ? এই দুটো বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড় যে সময়ে ঘটেছে বাংলাদেশে বছরের এই সময়ে সাধারণভাবে এরকম দুর্যোগ ঘটতে পারে। তাই এটি একেবারে নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না যে, এই বিধ্বংসী প্রাকৃতিক ঘটনাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই ঘটেছে। তবে একথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে, এগুলোর সঙ্গে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। কেননা একই বছরে তিন-তিনটি বিধ্বংসী প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশেই ঘটেছে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে অসময়ে বা অধিক জোরালো বৃষ্টিপাত হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে, ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটছে। পাশাপাশি দ্রুত জমাটবাঁধা বরফ সর্বত্র গলে যাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনাকে একসাথে বিবেচনা করলে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন যে দ্রুততর হচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পৃথিবীর সর্বত্র যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু সংক্রান্ত প্যানেল (আইপিসিসি)-

এর অভিক্ষেপণের মিল রয়েছে। এটি প্রায় নিশ্চিত যে, ভবিষ্যতে এধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরও ঘনঘন এবং আরো বিধ্বংসীরূপে আবির্ভূত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন দেশে। কেননা, বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি আরো গতি পাচ্ছে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও বাস্তবতা, অত্যন্ত ঘনবসতি, দারিদ্র্য, মানব-দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা, বিনিয়োগ করার মতো সম্পদের স্বল্পতা ইত্যাদি কারণে বৈশ্বিক জলবায়ু-পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি দুর্যোগ-আক্রান্ত হতে পারে যেসকল দেশ সেগুলোর প্রথম সারিতে বাংলাদেশ রয়েছে।

উপসংহার

টেক্সই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ সমন্বিত নীতি-কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হতে হবে। নিম্নে বৈশ্বিক পর্যায়ে ও বাংলাদেশের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অনেকগুলো পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হল যেগুলো অবশ্যই সমন্বিত ব্যবস্থায় বাস্তবায়ন করতে হবে।

বৈশ্বিক পর্যায়

বিশ্বব্যবস্থায় আর্থ-সামাজিক সাম্য

টেক্সই বৈশ্বিক উন্নয়নের স্বার্থে উন্নত এবং অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে প্রকট বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যবস্থায় যথাযথ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। সেই লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, জাতিসংঘের অন্যান্য সকল সংস্থা এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সকল প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করা প্রয়োজন। অসম বিশ্বায়নের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন ন্যায্য রীতিনীতি ও কাঠামো এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। অবশ্যই এ সকল দেশকে দেশি-বিদেশি সম্পদ আহরণে ও ব্যবহারে তাদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। একই সাথে প্রত্যেকটি দেশকে অংশীদারিত্বমূলক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে তারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে পারে যার মধ্যে অবশ্যই সকল নাগরিকের ন্যায্য অংশীদারিত্ব থাকতে হবে।

লক্ষ্য জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ হলেও উন্নত দেশসমূহের বার্ষিক সহায়তা সম্প্রতি তাদের মোট বার্ষিক আয়ের মাত্র ০.৩০-০.৩২ শতাংশে পৌঁছে (তা-ও আফ্রিকায় ঋণ মওকুফ অন্তর্ভুক্ত করে)। এক্ষেত্রে অগ্রগতি জরুরি, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে টেক্সই উন্নয়নের স্বার্থে। কেননা সম্পদ ও প্রযুক্তির অভাবে তারা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং জলবায়ু পরিবর্তন-ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা

পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং সমুদ্রস্ফীতি বাড়ছে, ফলে মানুষ ক্রমবর্ধমান নানা সংকটের মুখোমুখি। কী করণীয়? প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণ এবং ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে বাস্তবভিত্তিক এই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে যে, আর কালক্ষেপণ না করে একই সাথে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনার ব্যবস্থা (mitigatioহ) জোরদার করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব থেকে উদ্ভূত বাস্তবতার সঙ্গে খাপখাইয়ে উত্তরণের (ধফধঢ়ঃধঃরড়হ) লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখনই গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তার জন্য বৈশ্বিকভাবে অর্থসংকুলান করা সম্ভব বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটলে পরবর্তীতে অবস্থা আরো জটিল হবে এবং ব্যয়ভার দ্রুত বাড়তে থাকবে। উন্নত দেশসমূহ বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মূলত দায়ী এবং এখনও ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ করে চলেছে। এছাড়া বর্তমানে দ্রুত উন্নয়নশীল, বিশেষ করে শিল্পায়নে অগ্রসর বড় বড় দেশসমূহে (যেমন চীন, ব্রাজিল ও ভারত) গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণ দ্রুত বাড়ছে। এসকল উন্নয়নশীল এবং অবশ্যই উন্নত দেশসমূহকে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। অন্যান্য সকল দেশকেও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে গ্রিনহাউজ গ্যাস উৎসারণ কমানোর লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে।

কিয়োটো (Kyoto) প্রটোকল বাস্তবে কোনো কাজে আসেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রটোকল থেকে বেরিয়ে যায়। এছাড়া ২০১২ সালে এই প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। ডিসেম্বর ২০০৭-এ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে ২০০৯ সালের মধ্যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা এবং উন্নত বিশ্ব থেকে অর্থ ও প্রযুক্তি অনুন্নত বিশ্বে স্থানান্তরের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে একটি নতুন সমঝোতা তৈরি করার রোডম্যাপ গৃহীত হয়েছে। সকল দেশের, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্বের সদিচ্ছা থাকলে তা সম্ভব হতে পারে। যদি একটি ভালো চুক্তি গৃহীতও হয় তারপরও কথা থাকে এই যে, বিশ্ববাসী সকলের স্বার্থে, গোটা পৃথিবীকে ভয়াবহ প্রাকৃতিক ঝুঁকি থেকে সংরক্ষণের স্বার্থে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করার লক্ষ্যে সকল ভুক্তভোগী দেশকে, বিশেষভাবে দরিদ্র দেশসমূহকে গবেষণা-ভিত্তিক যথাযথ কার্যক্রম দ্রুত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো, বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলো যাতে এক্ষেত্রে বিশেষ করে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে সে জন্য উন্নত বিশ্বকে যথাযথ অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা দিতে হবে।

বাংলাদেশ

আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সাম্য

বাংলাদেশকে টেকসই অগ্রগতি ও উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে হবে অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থার যথাযথ মূল্যায়নভিত্তিক রচিত সমন্বিত নীতিকাঠামোর আওতায় টেকসই উন্নয়নের পথ নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় একদিকে জোর দিতে হবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর অর্থাৎ বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, বিরাজমান বাস্তবতার আলোকে উৎপাদন প্যাটার্ন, উৎপাদন ও বিতরণে দক্ষতা, অপচয় ও দুর্নীতিরোধ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে সামাজিক উন্নয়নের ওপর জোর দিতে হবে অর্থাৎ দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমিয়ে আনা, অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, সাধারণ মানুষের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবার ওপর যথাযথ গুরুত্ব দেয়া এবং যাতে সকল মানুষ সকল রকমের সেবা ন্যায্যভাবে পেতে পারে তার ওপর জোর দিতে হবে। এছাড়াও স্থানীয় পর্যায়ে যথাযথ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। আর এই প্রক্রিয়ার আওতায় সাধারণ মানুষের কর্মদক্ষতা ও সুযোগ-সুবিধা এমনভাবে বর্ধিত করতে হবে যাতে তারা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় নিজেরা যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সংকট অদূর ভবিষ্যতে দ্রুত ঘনীভূত হবে বলে দেখা যায়। কাজেই এক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণে কালক্ষেপণের সুযোগ আর বাংলাদেশের সামনে নেই।

জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার ব্যবস্থা গ্রহণ (adaptation) একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এটি একটি প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি; বিদ্যমান অবস্থার যথাযথ মূল্যায়ন এবং সেই ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার আওতায় নীতিনির্ধারণ, কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং যে কর্মকাণ্ড হাতে নেয়া হয় সময়ে সময়ে তার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে যাতে প্রয়োজনে ভুল পথ পরিহার করে সঠিক পথে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়।

জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা ক্ষমতা যে সকল বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: বাস্তবতার যথাযথ মূল্যায়ন, প্রয়োজনীয় তথ্যের প্রাপ্তি, অর্থনৈতিক সঙ্গতি, মানবদক্ষতা, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির প্রাপ্যতা, যথাযথ আইনি ব্যবস্থা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক গ্রহণযোগ্যতা এবং যারা ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তাদের সময়ের বিবেচনা (অর্থাৎ শুধু স্বল্পমেয়াদে নয়, দীর্ঘমেয়াদে চিন্তা-ভাবনা তাদের মধ্যে থাকতে হবে)।

এসকল বিষয় বিবেচনায় নিলে দেখা যাবে যে, বাংলাদেশে খাপ-খাওয়ানোর সক্ষমতা খুবই নিচু পর্যায়ের।

অতি দ্রুত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এই সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে না পারলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বিন্যাসে অগ্রগতি ঘটবে না। ফলে বাংলাদেশ বর্তমানে যে নানান ঝুঁকির সম্মুখীন তা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে আরো বৃদ্ধি পাবে। গভীর সংকটের এই পদধ্বনি আমাদের আমলে নিতেই হবে আর উত্তরণের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় যে কালোমেঘ ঘনিয়ে আসছে দেখা যাচ্ছে তা সময়ে দেশের জন্য সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনঘন হতে পারে তাই একটি বড় আকারের (ধরা যাক প্রাথমিকভাবে ১৫,০০০-২০,০০০ কোটি টাকার) দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিল গঠন করা যেতে পারে। পরবর্তীতে এটি আরো বাড়ানো যেতে পারে। এতে সরকার, দেশের সম্পদশালী মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা দানকারীরা অর্থ প্রদান করতে পারেন। এধরনের একটি তহবিল থাকলে দেশি-বিদেশি অনুদানের মুখাপেক্ষী না থেকে দুর্যোগ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার-ত্রাণ-পুনর্বাসন কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা যাবে। উন্নয়ন বাজেট কাটছাঁট করারও প্রয়োজন না হতে পারে। তবে একবার এই তহবিল থেকে যে অর্থ ব্যবহার করা হবে তা যত শিগগির সম্ভব পূরণ করে নিতে হবে।

তথ্য সূত্র

১.প্রাকৃতিক পরিবেশের আওতায় আছেঃ Natural systems at risk include glaciers, coral reefs and atolls, mangroves, boreal and tropical forests, polar and alpine ecosystems, prairie wetlands, and remnant native grasslands.

২. আর্থ-সামাজিক পরিবেশের আওতায় আছেঃ Human systems that are sensitive to climate change include mainly water resources; agriculture (especially food security) and forestry; coastal zones and marine systems (fisheries); human settlements, energy, and industry; insurance and other financial services; and human health. The vulnerability of these systems varies with geographic location, time, and social economic and environmental conditions.

৩. অর্থমন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৭, ঢাকা, জুন ২০০৭ (পৃ: ১৫১)

* UNDP Human Development Report 2006, UNDP, New York থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে বাংলাদেশে মার্কিন ডলারে জাতীয় মাথাপিছু আয় ৪০৬ ডলার এবং ppp ডলারে তা ১৮৭০। অর্থাৎ এক ppp ডলার=২২ মার্কিন সেন্ট

[লেখক: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং চেয়ারম্যান, পল্লী-কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।]

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশ: আমাদের করণীয়

আ তি ক র হ্ মা ন

জনসংখ্যার আধিক্য, সম্পদের অপ্রতুলতা, দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের ছোট এই দেশটির এবং দেশের মানুষের উন্নয়নের পথে বড় অন্তরায় হয়ে কাজ করছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আমাদের এ অবস্থাকে আরো সঙ্কটপূর্ণ করে তুলছে। জলবায়ু পরিবর্তন যদিও বৈশ্বিক একটি বিষয় তবুও এর প্রভাব অঞ্চলভিত্তিক ও স্থানীয়ভাবে সবচেয়ে বেশি পড়ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দরিদ্র মানুষ, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে বাংলাদেশ একটি অন্যতম বিপন্ন দেশ।

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও উত্তরে বরফ আবৃত বিশাল হিমালয় পর্বত। ভৌগোলিক এই অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মারাত্মক এক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বহমান আন্তঃদেশীয় বড় নদী, সমতল প্লাবনভূমি ও দীর্ঘ উপকূলীয় এলাকা এ ঝুঁকির মাত্রাকে আরো তীব্র করেছে। অন্যদিকে আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতার ফলে এ অভিঘাতের সাথে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাও আমাদের সীমিত। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে জলবায়ু পরির্তনের প্রভাব ও জলবায়ু

পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– দীর্ঘমেয়াদি ও পৌনঃপুনিক বন্যা, ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, উত্তরাঞ্চলে তীব্র খরা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা দিনে দিনে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এ সকল দুর্যোগ আমাদের পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রাকৃতিক সম্পদকে ধ্বংস করছে এবং এর ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঋতু পরিবর্তন ও বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়ে দেখা দেবে যা এরই মধ্যে অনুভূত হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে বাংলাদেশে অদূর ভবিষ্যতে প্রতিবছরই দীর্ঘায়িত ও ব্যাপক বন্যা দেখা দেবে। আবার শুষ্ক মৌসুমে অনাবৃষ্টি ও খরার প্রকোপ বেড়ে যাবে যা ইতিমধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। আবার উপকূলীয় অঞ্চল বলে বিবেচিত নয় এমন অভ্যন্তরীণ অঞ্চলেও বর্তমানে লবণাক্ততার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এসবের সরাসরি প্রভাব পড়ছে কৃষিখাত তথা খাদ্য-নিরাপত্তার ওপর। পাশাপাশি খাবার পানি, মানবস্বাস্থ্য ও সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একদিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কৃষিখাতই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অনাবৃষ্টি যেমন কৃষিকাজ ও উৎপাদনকে ব্যাহত করে প্রকৃতিনির্ভর কৃষকদেরকে দিশেহারা করে দিচ্ছে অন্যদিকে অতিবৃষ্টিজনিত আকস্মিক বন্যা, জলাবদ্ধতাও কৃষি-উৎপাদনকেও বাধাগ্রস্ত করছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় এলাকার একটি বড় অঞ্চল জুড়ে কৃষিকাজ ও উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। মিষ্টি পানির অভাবে এসব এলাকায় মিঠাপানির মাছসহ লবণসহিষ্ণু নয় এমন গাছ ও জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। বড় বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানলে কৃষি-উৎপাদন বিপর্যস্ত হয়ে খাদ্য-নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের অন্য যে খাতটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেটি হল নিরাপদ খাবার পানি ও জনস্বাস্থ্য। খরাপ্রবণ অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে খাবার পানির অভাবে মানুষের হাহাকারের চিত্র পত্রিকায় আমরা দেখেছি। উপকূলের মানুষ সারাবছরই পানযোগ্য মিষ্টি পানির অভাবে ভুগছে। এ সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। খাদ্যঘাটতি এবং খাবার পানির অভাব মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর চরম নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

জলবায়ু-পরিবর্তন বিষয়ক আন্তঃসরকার বিজ্ঞান পরিষদ হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার কিছু অংশ সমুদ্রের পানিতে ডুবে যাবে এবং এ অঞ্চলে স্থায়ী জলাবদ্ধতা দেখা দেবে। এর ফলে অসংখ্য পরিবার তাদের জীবিকা ও আবাসন হারাবে। তারা বড় বড় নগরগুলোতে অভিবাসী হবে এবং কাজ, উপার্জন ও মৌলিক সেবাহীন অবস্থায় অমানবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হবে। আবার দীর্ঘায়িত ও বড় বড় বন্যার ফলে নদীভাঙন বেড়ে যাবে। এর ফলেও উদ্বাস্তু পরিবারের সংখ্যা বাড়বে,

যা কেবল তাদেরকেই অমানবিক জীবন যাপনের দিকে ঠেলে দেবে না বরং নগর অর্থনীতি, আবাসন ও পরিসেবা খাতসমূহকে মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করবে।
এসকল বিষয় বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রধান খাতসমূহ যেমন– কৃষি, খাদ্য, পানি, জীবন-জীবিকা, আবাসন ইত্যাদিকে আরো সঙ্কটাপন্ন করে তুলবে। ফলাফল স্বরূপ আমাদের দরিদ্র জনগোষ্ঠী আরো দরিদ্র হবে, সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য ও খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতা বাড়বে। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে।

অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারের নীতি ও কৌশল

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। তাই জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় দু'টি দিক বিবেচনা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটি হল জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ কার্বন গ্যাস নির্গমন কমানো। অন্যটি হল সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত করা বা অভিযোজনে সক্ষম হয়ে ওঠা। কার্বন গ্যাস নির্গমন নিরসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান হল– বাংলাদেশ এমনিতেই খুব কম কার্বন গ্যাস নির্গমন করছে। এক্ষেত্রে কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশগুলোর দায়দয়িত্ব বেশি। তাই বর্তমান প্রেক্ষাপটে কার্বন গ্যাস নির্গমন পৃথিবীর সহনীয় মাত্রায় রাখতে বাংলাদেশের ভূমিকা হবে অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাথে একত্রিত হয়ে ধনী দেশগুলোর ওপর চাপ অব্যাহত রাখা।

বাংলাদেশ সরকার এরই মধ্যে অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সাথে মিলিত হয়ে উন্নত দেশগুলোর সাথে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আরো শক্তিশালী ভূমিকা রাখার জন্য আমাদের সরকারকে দক্ষ লোকবল বৃদ্ধি ও আরো সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। পাশাপাশি স্বল্পোন্নত, আঞ্চলিক ও ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের জোটগুলোকে আরো কার্যকর ও সুসংগঠিত করে এগিয়ে যেতে হবে যাতে ধনী দেশগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বিশেষ করে কার্বন নিঃসরণ কমাতে ও অভিযোজন সহায়তা দিতে নীতিগত ও আইনগতভাবে বাধ্য হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের এই বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের জন্য অভিযোজন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে পরিচিতি থাকায় এক্ষেত্রে আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অভিঘাত মোকাবেলায় সেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা যথেষ্ট নয়। যদি আমরা সক্ষমভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের এ ব্যাপক অভিঘাতকে মোকাবেলা করতে না পারি তবে আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত উন্নয়ন উদ্যোগ বিশেষত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি ব্যাহত হবে। তাই সরকার ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে এদিকটিতে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। সকল উন্নয়ন প্রকল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য অভিঘাত বিবেচনা করে তার পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়গুলোকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আশার কথা হল বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেমন– জাতীয় অভিযোজন কর্মকৌশল (National Adaptation Programme of Action– NAPA) প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে আছে জরুরি ও তাৎক্ষণিক কিছু কর্মপরিকল্পনা। কিন্তু সুদূরপ্রসারী ফল পেতে হলে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টির সমন্বয় ঘটাতে হবে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক একটি কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে যা Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) নামে পরিচিত। এখন আমাদেরকে সাবধান হতে হবে যেন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নেই আমাদের কর্মউদ্যোগ থেমে না থাকে বরং এর সঠিক বাস্তবায়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

BCCSAP-তে ছয়টি বিষয়কে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যা হচ্ছে– ১. খাদ্য-নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা ও জনস্বাস্থ্য; ২. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৩. অবকাঠামো উন্নয়ন ৪. গবেষণা ও জ্ঞানের সম্প্রসারণ; ৫. কার্বন নির্গমন কমানো ও কম কার্বন-নির্ভর অর্থনৈতিক উন্নয়ন; ৬. সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ। এগুলোকে বলা হচ্ছে ছয়টি স্তম্ভ। এই ছয় স্তম্ভের আওতায় কতকগুলো কর্মকাণ্ডের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে যেমন– জীবন-জীবিকা রক্ষায় বিপন্ন জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি; খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে জলবায়ু অভিযোজনে সক্ষম কৃষি ও ফসল উৎপাদন ব্যবস্থাপনা; স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা। একই সাথে নিরাপদ খাবার পানি ও উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত করা; দুর্যোগ প্রস্তুতিতে সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; অবকাঠামোর উন্নয়ন ঘটানো; জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ ও সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি বিবেচনা করে নতুন অবকাঠামো নির্মাণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার ও জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া। এখন জরুরি কাজ হচ্ছে বাংলাদেশে ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়গুলোর ওপর মাঠপর্যায়ে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়া।

সরকারের পরিবেশ বিভাগের আওতায় একটি ক্লাইমেট সেল স্থাপিত হয়েছে। এটি একটি ভালো দিক কিন্তু এটির কর্মকাণ্ড খুবই সীমিত। সরকারের অভ্যন্তরে স্থাপিত এই সেলটির সুফল পেতে হলে এটিকে আরো শক্তিশালী করতে হবে। এর কর্মের ব্যাপ্তি বাড়াতে হবে যাতে করে এটি সরকারের অন্য বিভাগগুলোকেও প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে জলবায়ু অভিযোজন বিষয় সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সাথে বিশেষ করে কৃষি, পানি, জনস্বাস্থ্য এবং দারিদ্র্য নিরসন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

জরুরি করণীয়

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও জনগণের ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিগুলোকে কতটা সক্ষমতার সাথে কমাতে পারব তার ওপর। আমাদের দেশে জলবায়ু বিষয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজ করছেন এমন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটি বাড়তি সুবিধা। এখন আমাদের

সরকারের উচিত হবে এটাকে কাজে লাগানো। জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশকে কিছু জরুরি পদক্ষেপ এখনি নিতে হবে। যেমন;

১. সরকারি মন্ত্রণালয়সমূহের যেমন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

২. NAPA ও BCCSAP-এর দ্রুত ও সঠিক বাস্তবায়ন করা।

৩. অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও জ্ঞানগত সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পদ ও স্থানীয় জ্ঞানকে গুরুত্ব সহকারে কাজে লাগাতে হবে।

৪. এসংক্রান্ত উদ্যোগ গ্রহণে সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ও ধনী দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।

৫. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য দায়ী দেশগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। জলবায়ু-উদ্বাস্তু

ইস্যুটিকে এ আলোচনায় সামনে নিয়ে আসতে হবে।

৬. এই সকল কাজ সঠিকভাবে করার লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৭. সকল উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও তথ্যের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং

৮. জলবায়ুবান্ধব উন্নয়ন পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

এসকল পদক্ষেপের মাধ্যমে সকল উন্নয়ন নীতিমালা, কর্মকাণ্ড ও প্রকল্পকে জলবায়ু-সহিষ্ণু করে তুলতে হবে। আগামী দিনগুলোতে আমাদের কাজ হবে যে সকল পরিকল্পনা আমাদের হাতে আছে সেগুলো দ্রুত ও সঠিক বাস্তবায়ন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ও সমন্বিত নতুন উদ্যোগ গ্রহণ। চ্যালেঞ্জ হল যে আমাদেরকে একই সাথে দারিদ্র্য নিরসন, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন এবং জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলা করতে হবে।

এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকার, ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহকে একযোগে কাজ করতে হবে। বাংলা নববর্ষের সূচনালগ্নে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, জলবায়ুর অভিঘাত মোকাবেলায় সক্ষম ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়াই আমাদের প্রত্যাশা।

[লেখক : নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস), আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিবেশ বিজ্ঞানী। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে লেখককে সহযোগিতা করেছেন ড. দ্বিজেন মল্লিক, গবেষক, বিসিএএস ও জাকিয়া নাজনীন, গবেষণা সহযোগী, বিসিএএস।]

জলবায়ু বিপর্যয়: অভ্যন্তরীণ করণীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

মো. আব্দুল মতিন

মূল কথা

আমরা জানি যে, পৃথিবীর যে সব দেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, বাংলাদেশ তার অন্যতম অথচ সেই পরিবর্তন ডেকে আনার পেছনে বাংলাদেশের তেমন কোনো ভূমিকা নেই। বাংলাদেশ যেসব ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার চ্যালেঞ্জ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সূচিত শিল্পবিপ্লবের পর থেকে বিগত প্রায় আড়াইশ বছর যাবত শিল্পায়িত দেশসমূহ কর্তৃক ক্রমাগতভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গীরণই পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ। এই পুঞ্জিভূত উদ্‌গীরণে বাংলাদেশের অংশ প্রায় শূন্যের কোঠায়। বর্তমানে শিল্পায়িত দেশসমূহের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়মান দেশসমূহের গ্যাস উদ্‌গীরণ জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাকে আরও প্রকট করেছে।

যদিও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই গ্যাস উদ্‌গীরণের পরিমাণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার একটি প্রয়াস জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের

ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের আওতায় অগ্রসরমান রয়েছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ইতিমধ্যে গ্যাস ঘনত্ব বেশ বেশি এবং যেহেতু এই ঘনত্ব হ্রাস একটি সময়সাপেক্ষ বিষয়, এবং গ্যাস উদ্‌গীরণ হ্রাসের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আগামী বেশ কিছুকাল ধরে এই ঘনত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে, সেহেতু কিছুটা পরিমাণ জলবায়ু পরিবর্তন আজ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দুই ধরনের তৎপরতা সংঘটিত হচ্ছে। একটি হল, গ্যাস উদ্‌গীরণের পরিমাণ 'হ্রাসকরণ' (mitigation); আর দ্বিতীয় হল, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য 'অভিযোজন' (adaption)। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সেহেতু এই উভয় ইস্যুতেই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের একটা বিশেষ ভূমিকা রাখার সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে। যেহেতু বাংলাদেশ দ্বারা উদ্‌গীরিত গ্যাসের পরিমাণ নিতান্ত স্বল্প, এবং নিম্ন মাথাপিছু আয়ের কারণে এদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত তীব্র, সেহেতু বাংলাদেশের ওপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্যাস হ্রাসকরণের চাপ প্রবল নয়। গ্যাস উৎপাদন হ্রাসকরণের চাপের সম্মুখীন হয়ে শিল্পায়িত দেশসমূহ অনেক সময় বিভিন্ন কৌশল, ছল-চাতুরি, ও ফাঁকির আশ্রয় নেয় এবং সে উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশের মতো যেসব উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদেরকে অভিযোজনের জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহায়তা প্রদানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি নীতিগতভাবে স্বীকৃত। এযাবৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা মহলে অভিযোজনমূলক বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির দিকেই মনোযোগ বেশি নিবদ্ধ রেখেছে। কিন্তু কেবলমাত্র বৈদেশিক সাহায্য লাভের মাধ্যমেই বাংলাদেশের পক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অভিযোজনের মতো কঠিন কাজটি সম্পাদন করা সম্ভব নয়। এজন্য যেটা প্রয়োজন তা হল বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশলের একটি সামগ্রিক পুনর্নিরীক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ নীতিমালার পুনর্বিন্যাস।

আন্তঃরাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেল বা IPCC কর্তৃক পরিবেশিত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক অনুসিদ্ধান্তসমূহ সাধারণভাবে বিশ্ব-পরিধিতে প্রযোজ্য হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ভেদে এসইসব অনুসিদ্ধান্তের তারতম্য হতে পারে। সেজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের আঙ্গিকে বাংলাদেশের স্থানীয় পরিস্থিতি নিয়ে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ একাধিক ধারায় আক্রান্ত হবে। প্রথমত, সাম্প্রতিক একটি ভিন্নমত থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এটি বলা যায় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিমজ্জিত হবে এবং তার ফলে একটা বিরাটসংখ্যক মানুষ বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়বে। দ্বিতীয়ত, সামুদ্রিক পানির লবণাক্ততা বাংলাদেশের আরো গভীরে প্রবেশ করে এদেশের বিস্তীর্ণ

এলাকাজুড়ে কৃষি ও জীবন-জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত করবে। তৃতীয়ত, উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে একদিকে হিমালয়ের তুষার-প্রবাহসমূহ গলে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশের নদ-নদী শীতকালে সম্পূর্ণ শুষ্ক হয়ে পড়বে, অন্যদিকে গ্রীষ্মকালে বায়ুতে আর্দ্রতাবৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে প্লাবনের মাত্রা তীব্রতর হবে। চতুর্থত, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, প্রভৃতি চরম আবহাওয়ামূলক ঘটনার (extreme weather events) সংখ্যা ও মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। পঞ্চমত, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিভিন্ন রোগ, শোক, মহামারী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাবে। সব মিলিয়ে, জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতি ও জনজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনবে। জলবায়ু পরিবর্তনের এইসব বিভিন্ন ধারার বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করা একটা দুরূহ কাজ, এবং এই কাজ সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতিমালার বিভিন্ন দিকেরই সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন।

এতকাল যাবত বাংলাদেশে নদ-নদীসমূহের প্রতি যে পন্থাটি অনুসরণ করা হয়েছে, সেটি হল "বেড়ীবাধ পন্থা" বা "অবরোধ-পন্থা" (Cordon Approach)। এই পন্থার ফলে প্লাবনভূমিকে নদীখাত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এবং তার ফলে একদিকে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে প্লাবনভূমি পলিমাটিভরণ ও নদীর স্বাভাবিক প্লাবনের অন্যান্য সুফল থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এবং সর্বোপরি জলাবদ্ধতার প্রসার ঘটেছে। নদ-নদীর প্রতি অনুসৃত অবরোধ পন্থা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবকে তীব্রতর করবে। বাংলাদেশের বড় অংশটিই একটি বদ্বীপ, এবং ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এই বদ্বীপের সবচেয়ে বড় বর্ম হল হিমালয়-প্রসূত নদ-নদী দ্বারা সংঘটিত পলিমাটিভরণ। বেড়ীবাঁধ বা অবরোধ পন্থা পলিমাটিভরণের এই প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এই বর্মকে দুর্বল করে দেয়। বেঁড়ীবাধ পন্থা বর্ষাকালে প্লাবনভূমিতে বিস্তৃত পানি ধরে রাখার মাধ্যমে শীতকালে নদ-নদীর শুষ্কতার সমস্যা মোকাবেলার প্রচেষ্টাকেও বাধাগ্রস্থ করে। একই কারণে অবরোধ পন্থা জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট লবণাক্ততা অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। "অবরোধ পন্থার" বিভিন্ন কুফলের আলোকে গবেষকরা বাংলাদেশের জন্য নদ-নদীর প্রতি "উন্মুক্ত পন্থা" (Open Approach)-র প্রস্তাব করেছেন। এই পন্থানদী খাত ও প্লাবনভূমির স্বাভাবিক সম্পর্ককে অটুট রাখে ও আরও প্রসারিত করে। এর ফলে পলিমাটিভরণের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বর্মকে অক্ষুণ্ন রাখে। তদুপরি, উন্মুক্ত পন্থা প্লাবনভূমির বর্ষাকালে বিস্তৃত নদ-নদীর পানি ধরে রেখে শীতকালে নদ-নদীতে পানিপ্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার প্রচেষ্টাকে সুগম করে। একই সাথে তা সামুদ্রিক লবণাক্ততার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সহায়তা করে। সব মিলিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে নদ-নদীর প্রতি অনুসৃত পন্থার পরিবর্তনই হল বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কাজ। এই পরিবর্তনের মাধ্যমেই জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট তিনটি মূল বিরূপ প্রভাব যথা

নিমজ্জন, বর্ধিত লবণাক্ততা ও নদ-নদীর চরমভাবাপন্নতার, বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে নদ-নদীর প্রতি পন্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি আও বহুবিধ তৎপরতায় নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হল দেশের বনসম্পদের সংরক্ষণ ও দেশে বনায়নের পরিধি বৃদ্ধি। বনায়ন বাতাসের কার্বন হ্রাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্থা। বন রক্ষা ও বনের পরিধি বিস্তারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গীরণ হ্রাসকরণের প্রচেষ্টাতেও অবদান রাখতে পারে। বন রক্ষা ও বনের প্রসার বৃদ্ধি গ্যাস হ্রাসকরণের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে বাংলাদেশের অভিযোজনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। "সিডর" (SIDR) ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এই ঘূর্ণিঝড়-সৃষ্ট জানমালের ক্ষয়ক্ষতি আরও বহুগুণ হত যদি-না উপকূলীয় সুন্দরবন সিডরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষকে আচ্ছাদন যোগাত। যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামীতে সিডরের মতো ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও শক্তিমত্তা আরও বৃদ্ধি পাবে, সেহেতু উপকূলীয় বন রক্ষা ও প্রসার বাংলাদেশের জন্য একটি জরুরি কর্তব্য। বন রক্ষা ও বনের পরিধি বিস্তার বাংলাদেশের বনাঞ্চলে বসবাসকারী অদিবাসীদের ন্যায়সংগত স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণের জন্যও সহায়ক।

উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট চরম প্রাকৃতিক ঘটনাবলির অভিঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য রক্ষা ও প্রসারের পাশাপাশি বাংলাদেশের আরও অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৯১ সনের ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে আগাম সংকেত প্রদান, সম্ভাব্য আক্রান্ত মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে স্থানান্তর, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশি কিছু অগ্রগতি অর্জন করেছে। কিন্তু এসব অগ্রগতি যথেষ্ট নয়, এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলের সংখ্যা ও মানের বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। উপকূলীয় এলাকার আবাসিক ধরনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনাও প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন কী কী ধারায় এবং কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নিয়ে ব্যাপক সমীক্ষা প্রয়োজন। এসব সমীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে জলবায়ু পরিবর্তনের মুখে বাংলাদেশে কৃষি অভিযোজনের একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। যেসব খাতের নীতিমালা জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে পুনর্নিরীক্ষিত ও পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে জ্বালানিখাত অন্যতম। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য আগামীতে বাংলাদেশকে তার বিদ্যুত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করতে হবে। এই সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্বনবিমুক্ত নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশে সৌরশক্তি ব্যবহারের বিপুল সম্ভাবনা বিদ্যমান। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে স্বল্পমাপের গৃহস্থালি বিদ্যুত চাহিদা মেটাতে সৌরশক্তি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিধিতে কার্বন হ্রাসকরণের প্রক্রিয়ায় শামিল হতে পারে এবং "স্বল্প কার্বন ব্যবহারকারী প্রবৃদ্ধির" (low carbon growth) দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে। টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেমন বাংলাদেশের গ্রামের ও সাধারণ মানুষ একটা উল্লম্ফনের মাধ্যমে স-তার টেলিফোনের (Landphone) স্তর অতিক্রম করে সরাসরি বেতার, অথবা মোবাইল ফোনের স্তরে পৌঁচেছেন, তেমনি তারা সৌরশক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে অনবায়নযোগ্য জ্বালানির স্তর অতিক্রম করে সরাসরি নবায়নযোগ্য জ্বালানির স্তরে উপনীত হতে পারেন। সৌরশক্তি ব্যবহার জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য উপযোগী হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের শিল্প বিকাশেও সহায়ক হতে পারে। স্বল্পমাপের সৌরবিদ্যুত ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ, যথা সুইচ, কেবল, ইত্যাদি এখন বাংলাদেশেই উৎপাদিত হয়। সোলার প্যানেল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উন্নত মানের বালুকণাও প্রচুর পরিমাণে লভ্য। সুতরাং, সরকারি নীতিমালা সঠিক হলে অচিরেই বাংলাদেশে সোলার প্যানেল উৎপাদনও সম্ভব। সুতরাং, সৌরশক্তির ব্যবহার বাংলাদেশে পোশাকশিল্পের মতো একটা নতুন শিল্পখাতের জন্ম দিতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতের ব্যাপক পরিবর্তন প্রয়োজন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ইতিমধ্যে যেসব রোগ ও মহামারীর বিস্তার ঘটার সম্ভাবনা, সেসবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ও মোকাবেলার সক্ষমতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কী কী নতুন রোগ ও মহামারীর আর্বিভাব হতে পারে, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় গবেষণা ও সমীক্ষার উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

জনসংখ্যার বিশাল আকার ও উচ্চ ঘনত্ব বাংলাদেশের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকিকে ঘোরতর করেছে, কেননা কোটি কোটি মানুষ আক্রান্ত হবে। তদুপরি, জনসংখ্যার বিশাল আকার নিয়ত দেশের জল, জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ বৃদ্ধি করছে, মানুষকে দুরারোগ্যপূর্ণ এলাকায় বসতি স্থাপনে বাধ্য করছে, বনের পরিধি হ্রাস করছে, এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সম্মুখে বাংলাদেশকে আরও অসহায় করে দিচ্ছে। বিগত সময়কালে জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছিল, যার ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু এই হ্রাসকৃত হারও বাংলাদেশের জন্য অত্যধিক, এবং আরও উদ্বেগের বিষয় যে, সাম্প্রতিককালে আত্ম-সন্তুষ্টি, অবহেলা, ভ্রান্ত-নীতি, এবং প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রচেষ্টার অভাবে জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি স্তিমিত হয়ে পড়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে অধোগতি দেখা দিয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি সফলভাবে মোকাবেলার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও জনসংখ্যার হ্রাস বাংলাদেশের একটি অত্যাবশ্যক করণীয়।

সাধারণভাবে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সম্ভাব্য বিভিন্ন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও প্রসারিত করা আজ বিশেষভাবে প্রয়োজন।

যদিও জলবায়ু পরিবর্তন সকলের জন্যই একটি সমস্যা, তা সত্ত্বেও দেশের দরিদ্র মানুষ এর দ্বারা বেশি আক্রান্ত হবে, যাদের এই পরিবর্তন মোকাবেলার সক্ষমতাও অনেক কম। সে কারণে প্রয়োজনীয় সচেতনতার অভাবে, ও অসম বিতরণমূলক উন্নয়ন কৌশলের কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জলবায়ু বৈষম্যের (climate apartheid)-র উদ্ভব ঘটতে পারে।

জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীরা বিশেষত তাদের মধ্যে যারা পৃথিবীর উন্নত, শিল্পায়িত দেশসমূহে বসবাস করছেন, তারা সেসব দেশের জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা বাংলাদেশ ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশসমূহ যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে, সে বিষয়ে সচেতন করে তোলার ক্ষেত্রে একটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত বিমূর্ত ধারণাটির পেছনে একটি সুনির্দিষ্ট মুখাবয়ব সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে বাংলাদেশের স্বার্থ ও অবস্থান জোরের সাথে তুলে ধরতে পারেন।

করণীয়ঃ

ক. আন্তর্জাতিক পর্যায়েঃ

০১. উন্নত দেশসমূহকে গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্‌গীরণ হ্রাস করে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ করার লক্ষ্যে জরুরি ও জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে।

০২. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তাল-বাহানা ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বোঝা শেষ পর্যন্ত উন্নয়নশীল ওপর চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা থেকে উন্নত দেশসমূহকে বিরত থাকতে হবে।

০৩. বাংলাদেশসহ অন্যান্য যেসব উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদেরকে সর্বাত্মক ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, এবং বাংলাদেশকে অবশ্যই অভিযোজনের লক্ষ্যে প্রাপ্য তার ন্যায্য প্রাপ্য সহযোগিতা আদায় করতে হবে।

০৪. যেসব উন্নত শিল্পায়িত দেশের কার্বন উদ্‌গীরণ জলবায়ু পরিবর্তন ও সমুদ্র-পৃষ্ঠের উচ্চতা ডেকে এনেছে, সেসব দেশে বাংলাদেশে নিমজ্জনের কারণে যে কোটি কোটি মানুষ বাস্তুহারা ও জীবিকাহারা হয়ে পড়বেন তাদের অভিবাসনের সুযোগ দিতে হবে।

০৫. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য অভিযোজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রাপ্য যেসব সাহায্য তহবিল, তা বাংলাদেশের হাতে সরাসরি ন্যস্ত করতে হবে।

০৬. বিশ্ব-পরিধিতে অভিযোজনের প্রয়াসের কেন্দ্র বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, কেননা অভিযোজনের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকাই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

০৭. বিশ্ব-পরিধিতে, বিশেষত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো কনভেনশনের UNFCCC আওতায় অগ্রসরমান প্রক্রিয়ায়, জলবায়ু পরিবর্তন রোধের দাবিতে বাংলাদেশকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

০৮. জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যুতে জলবায়ু পরিবর্তন দ্বারা ভুক্তভোগী অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশসমূহের মধ্যে যারা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে অধিকতর যুক্তিসংগত দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে, তাদের সাথে বিভিন্ন জোটবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশকে উদ্যোগী হতে হবে।

খ. অভ্যন্তরীণ পর্যায়েঃ

০১. জলবায়ু পরিবর্তনের আঙ্গিকে বাংলাদেশের স্থানীয় পরিস্থিতি নিয়ে আরও গবেষণার আয়োজন করতে হবে, এবং সেসব গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বাংলাদেশের কৌশল নির্ধারণ কতে হবে।

০২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল ও অভ্যন্তরীণ নীতিমালার একটি সামগ্রিক পুনর্নিরীক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

০৩. জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যাকে অবাধ বাজার-মূলক নীতিমালার একটি নেতিবাচক ফলশ্রুতি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং এই সমস্যা মোকাবেলায় অবাধ বাজারমূলক নীতিমালার ওপর নির্ভর না করে একটি সমন্বিত সামাজিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং সরকারকে সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দিতে হবে।

০৪. জলবায়ু পরিবর্তনের তিনটি বড় বিপদ, তথা নিমজ্জন, বর্ধিত লবণাক্ততা, ও নদ-নদীর চরমভাবাপন্নতা, মোকাবেলার জন্য নদ-নদীর প্রতি অবরোধ পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মুক্ত পন্থা গ্রহণ করতে হবে। বর্ষাকালের পানি ধরে রেখে তা শীতকালে ব্যবহারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে ও দেশের নদ-নদীর সারা বছরের নাব্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

০৫. জলবায়ু পরিবর্তনের আলোকে বাংলাদেশের কৃষিখাতের কী কী পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন তা প্রয়োজনীয় গবেষণার মাধ্যমে চিহ্নিত করে বাস্তবায়িত করতে হবে। বিশেষত, এমন সব শস্য ও কৃষিপণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দিতে হবে, যা লবণাক্ততা দ্বারা কিংবা অতিবন্যা বা অতিখরা দ্বারা কম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

০৬. দেশের জ্বালানি ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব অনবায়নযোগ্য জ্বালানির বদলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর জোর দিতে হবে। বিশেষত, সৌরশক্তির প্রাচুর্যের প্রেক্ষিতে দেশে সৌরশক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে, এবং জ্বালানি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সৌরশক্তি উৎপাদনজনিত একটি নতুন শিল্পখাত বিকাশের উদ্যোগ নিতে হবে।

০৭. অনবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা কম উদগীরণের লক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে ও অনবায়নযোগ্য জ্বালানি, বিশেষত কয়লা উত্তোলনের ক্ষেত্রে দেশের পরিবেশ রক্ষার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

০৮. জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সকল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে তরুণ সম্প্রদায় ও আগামী প্রজন্ম এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারে এবং করণীয় সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

০৯. জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর গবেষণার ওপর জোর দিতে হবে এবং সে লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক পৃথক বিভাগ অথবা গবেষণা ইউনিট খোলার উদ্যোগ নিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ের ওপর গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সনের বাজেটে যে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন, তা ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হবে, এবং এই অর্থের উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের ভেতর জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণায় ব্যবহার করতে হবে।

১০. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের ওপর যে প্রভাব পড়বে তার জন্য দেশকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। সেই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ নিতে হবে। দেশের চিকিৎসাবিদ্যা ও চিকিৎসক ও নার্সদের প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচিতে জনস্বাস্থ্যের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১১. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও জনসংখ্যার আকার হ্রাসের প্রয়োজনীয়তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হবে, ও জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে পূর্বার্জিত সাফল্য-সঞ্জাত সকল প্রকার আত্মসন্তুষ্টি পরিত্যাগ করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ ও জনসংখ্যার আকার হ্রাসের লক্ষ্যে পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

১২. বাংলাদেশের সকল নাগরিককে জনসংখ্যা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সরকারি উদ্যোগের প্রতি সহযোগিতা প্রদান করতে হবে, এবং সরকারি উদ্যোগের অপেক্ষা না করে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

১৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেন জলবায়ু বৈষম্যের (climate apartheid)-র উদ্ভব না ঘটে, সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে, এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশের সামাজিক বিতরণের দিক থেকে একটি সুষম উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ করতে হবে।

শেষ কথা

জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলার জন্য দেশের স্বাসী ও প্রবাসী, বিশেষজ্ঞ ও কর্মী, সরকার ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ, রাজনীতিবিদ ও সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পেশার মানুষ, সংস্কৃতিসেবী, মিডিয়াকর্মী, তথা বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষকে নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

একটি জাতির জীবনে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বিভিন্ন ইস্যু সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দেয়। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ইস্যুই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সাহসের সাথে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে সেই চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করেছে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আশা করি যে, বাংলাদেশের জনগণ আবারও ঐক্যবদ্ধভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এগিয়ে যাবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে সরকারকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। বেসরকারি সংস্থাসমূহকেও এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ইস্যু সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেশের মিডিয়া, তথা সংবাদপত্র, টেলিভিশন, ইত্যাদির বিশেষ ভূমিকা জোরদার করতে হবে। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সকলেই এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিজ নিজ ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসবেন, এটাই সকলের প্রত্যাশা।

[বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্ক (বেন) আয়োজিত জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশের উন্নয়ন কৌশল: অভ্যন্তরীণ করণীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা" বিষয়ক সম্মেলন ২০০৯-এ গৃহীত ঘোষণার আলোকে রচিত]

[লেখক: সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)]

প্র ব ন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন: গরম আলোচনার পেছনের কথা

ফ রী দা আ ক্তা র

গত প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া এবং এর ফলে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের মানুষের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক মহলে আলাপ আলোচনায় চলে এসেছে। আমরা এখন খুব সহজভাবে জলবায়ু পরিবর্তন কথাটি উচ্চারণ করছি, যা এই কিছুদিন আগেও অপরিচিত ছিল। এখন জলবায়ু পরিবর্তন ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন পড়ে না, কারণ মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারছে। তবে জলবায়ু পরিবর্তন অন্যান্য উন্নয়ন পরিভাষার মতোই ইংরেজি Climate Change-এর অনুবাদ হয়েই এসেছে। ইংরেজিতেও এই দুটি শব্দ একত্রে কখনোই ছিল না, এটাও তৈরি করা হয়েছে। আগে Climate ছিল কিন্তু এর সাথে হয়ে Change ছিল না। এখন মনে হয় Climate বললেই Change ও বলতে হবে। বাংলায়ও তাই। জলবায়ু আগেই জেনেছি কিন্তু তার সাথে জুড়ে যাওয়া পরিবর্তন এখন জানছি। এরই সাথে আরো একটি পরিচিত আলোচনা হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)। পৃথিবী উষ্ণ হচ্ছে দিনে দিনে। তাপমাত্রা বাড়ছে এমনভাবে যা স্বাভাবিক নয়। ফলে সবাই চিন্তিত হয়ে উঠছে। মাথাও গরম হচ্ছে ভাবনায়। বলা বাহুল্য, এই ভাষা এবং এর বৈজ্ঞানিক আলোচনা এখনো শিক্ষিত মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তারাই এই পরিবর্তনগুলো সারা বিশ্বের প্রেক্ষিতে দেখছেন। যারা সত্যিকার অর্থে এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাঁরা কীভাবে দেখছেন, তাঁদের ভাষা কী আমরা জানি না, জানার কোনো চেষ্টাও নেই। এই জানা ও বোঝার মধ্যেই ধনী-গরিবের পার্থক্য রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে ধনীদের ভোগবিলাস দায়ী এই কথা যখন উঠছে তখনই দেখছি তারাই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দুনিয়া শেষ হয়ে গেল বলে হইচই বাঁধাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ধনী দেশই আগে চিহ্নিত করেছে

সাধারণত মনে করা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা আন্তর্জাতিকভাবে নজরে এসেছে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন

থেকে। কিন্তু আসলে তার বহু আগেই শিল্পোন্নত ও ধনী দেশগুলো বুঝতে পেরেছিল তাদের তথাকথিত উন্নয়নের মডেল টেকসই নয়, বরং ধ্বংসাত্মক। মুনাফাবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার যে উন্নয়ন তা নিঃসন্দেহে পরিবেশ ধ্বংশের একটি বড় কারণ। ধনী ও গরিব দেশের মধ্যে সম্পদ ব্যবহারে বিরাট ফারাক রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব হলেও একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ধনী, তারা পশ্চিমা অনুকরণে জীবনযাপন করে সম্পদের অপচয় ঘটাচ্ছে। আর একই দেশে গরিব মানুষ না খেয়ে মরছে। এটাও পরিবেশ ধ্বংসের জন্য বিরাট কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভোগবাদী মানুষ না বুঝলেও তাদের বুদ্ধিজীবী এবং বিজ্ঞানীরা শিল্পায়ন ভিত্তিক (Industrialisation) উন্নয়ন টিকিয়ে রাখার সংকট টের পেয়েছে ১৯৭১ সালেই। সেই সময় 'Limits to Growth' নামক ধনী দেশের একটি প্রতিবেদন বিশ্বের পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে। এই গবেষণা প্রতিবেদনটি Club of Rome নামক একটি আন্তর্জাতিক বুদ্ধিজীবী মহল (Think tank) প্রস্তুত করেছিল। ইতালিতে ক্লাব অব রোম আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্যে ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭২ সালে Limits to Growth[১] প্রতিবেদন প্রকাশের পর বিখ্যাত হয়ে যায়। এই প্রতিবেদনে দুটি কথা বলা হয়েছে। এক. উন্নয়নের যে ধরন চলছে, তা একইভাবে চলতে থাকলে ২০৭২ সালের মধ্যে বিশ্বের অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ অন্যান্য সম্পদ যা আছে তা ফুরিয়ে যাবে। দুই. খণ্ড খণ্ড সমাধান দিয়ে এই সমস্যার সুরাহা করা যাবে না। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সমস্যাকে বিবেচনায় রেখে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে: ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ব্যাপক পুষ্টিহীনতা, জীবাশ্ম জ্বালানির ক্ষয় এবং পরিবেশ বিপর্যয়। এই প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য এভাবে ছিল:

'If the present growth trends in world population, industrialization, pollution, food production, and resource depletion continue unchanged, the limits to growth on this planet will be reached sometime within the next one hundred years. The most probable result will be a rather sudden and uncontrollable decline in both population and industrial capacity'

[যদি জনসংখ্যা, শিল্পায়ন, দূষণ, খাদ্য উৎপাদন এবং সম্পদের অবক্ষয় যেভাবে চলছে একইভাবে চলতে থাকে তাহলে আগামী ১০০ বছরের মধ্যে এই পৃথিবীর প্রবৃদ্ধি শেষ সীমায় পৌঁছে যাবে। সবচেয়ে সম্ভাব্য ফলাফল হবে জনসংখ্যা এবং শিল্পায়ন হঠাৎ এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে থেমে যাবে।]

বলা বাহুল্য, ধনী দেশসমূহ এই প্রতিবেদনে বেশ চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাই তাদের মধ্যে নড়াচড়া শুরু হয়ে যায়। যদিও তখন থেকেই উন্নয়ন বা শিল্পায়ন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কোনো বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। এই

শিল্পায়ন ব্যবস্থা তাদের ভোগবাদী জীবনব্যবস্থার সাথে জড়িত। প্রতিবেদনে সমাধানের ইঙ্গিতও ছিল। যেমন বলা হয়েছিল,

It is possible to alter these growth trends and to establish a condition of ecological and economic stability that is sustainable far into the future. The state of global equilibrium could be designed so that the basic material needs of each person on earth are satisfied and each person has an equal opportunity to realize his individual human potential.

[প্রবৃদ্ধির এই গতি পরিবর্তন করা সম্ভব এবং পরিবেশসম্মত ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব যা ভবিষ্যতে স্থায়ী হবে। বিশ্বের সমতা এমন করে অর্জন করা সম্ভব যে প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা মেটানো যেতে পারে এবং প্রতিটি মানুষের সম্ভাবনাকে বিকশিত করার সমান সুযোগ সৃষ্টি হয়।]

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সমস্যা চিহ্নিত করার পর সমাধানের যে ইঙ্গিত প্রতিবেদনটি দিয়েছিল, তার দিকে ধনী দেশগুলো কোনোই মনোযোগ দেয়নি। বরং তাদের ভোগবাদিতা উত্তরোত্তর আরো বেড়েছে। তাই এই একবিংশ শতাব্দীতে এসে পরিবেশ বিপর্যয় আরো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

ক্লাব অব রোমের এই প্রতিবেদন ধনী ও শিল্পোন্নত দেশ এবং পরিবেশবাদীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। এর ফলাফল ছিল জাতিসংঘের একটি প্রতিষ্ঠান জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme, UNEP) প্রতিষ্ঠা। কেনিয়ার নাইরোবিতে এর সদর দফতর রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে এখন জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির আয়োজনে মাইলফলক ঘটনা ছিল ১৯৯২ সালে ব্রাজিলে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন UN Summit on Environment and Development (UNCED)।

এরপর আরো একটি প্রতিবেদন পরিবেশ বিপর্যয় রোধে জাতিসংঘ এবং ধনী দেশসমূহের উদ্বিগ্নতা এবং তাদের কর্মতৎপরতা বোঝার জন্যে খুব তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। জাতিসংঘের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৮৩ সালে '২০০০ সাল এবং তার পরবর্তী সময়ে বিশ্বের পরিবেশ সংক্রান্ত' একটি কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের নাম World Commission on Environment and Development (WCED) এবং এর সভাপতি ছিলেন নরওয়ের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী গ্রো হারলেম ব্রুন্টল্যান্ড (Gro Harlem Brundtland)। এই প্রথম একজন নারী প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে উদ্যোগ নিলেন। তারই নামে অনেক সময় এই কমিশনকে ব্রুন্টল্যান্ড কমিশনও বলা হয়। কমিশন গঠনের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বে মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত অবক্ষয় রোধের বিষয়টি দেখা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের (Sustainable Development) প্রেক্ষাপটে টেকসই

উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা। ব্রুন্টল্যান্ড কমিশনের প্রতিবেদন Report of the World Commission প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে Our Common Future[২]নামে। এই প্রতিবেদনকে সংক্ষেপে ব্রুন্টল্যান্ড রিপোর্ট বলে অনেকে চেনে।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতিসংঘের উদ্যোগ

জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Mateorological Organisation, WMO) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে তথ্য বিশ্লেষণ পাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি প্যানেল গঠন করে। এই প্যানেলের নাম হচ্ছে The Intergovernmental Panel of Climate Change বা IPCC। বাংলায় আন্তঃসরকার জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেল। এই প্যানেল নিজেরা গবেষণার কাজ করে না তবে তারা বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য নিয়ে যাচাই করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বোঝার জন্যে প্রতিবেদন তৈরি করে। এই প্রতিবেদনগুলোর নাম হচ্ছে IPCC Assessment Report। প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে এবং এই প্রতিবেদনে পরিবেশ বিপর্যয় রোধে রাজনৈতিক একটি প্লাটফর্মের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়। আইপিসিসির প্রতিবেদনের ফলাফল হিসেবে ১৯৯২ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সনদের (the United Nations Framework Convention on Climate Change) ক্ষেত্র তৈরি হয়। আইপিসিসি-র দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সালে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তি কিওটো প্রটোকল বা চুক্তি গৃহীত হয় ১৯৯৭ সালে। এই চুক্তিতে গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল শিল্পোন্নত দেশগুলো ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ৫% কমাবে এবং ২০০৯ সালে পরবর্তী সময়ে নির্গমন কমাবার পদ্ধতির সূচনা করতে হবে। আইপিসিসি'র তৃতীয় প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ২০০১ এবং চতুর্থটি ২০০৭ সালে, নাম ছিল 'Climate Change, 2007'।

১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন বা ধরিত্রী সম্মেলন সত্যিকার অর্থে পরিবেশ চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিল। ধনী দেশগুলো তাদের অবস্থানে অনড় থাকলেও এই সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পরিবেশবাদী ব্যক্তি ও সংগঠন সক্রিয়ভাবে পরিবেশ ধ্বংসের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করার সুযোগ পেয়েছিল। এই সময় বৈশ্বিক উষ্ণতার (Global Warming) কথা বেশ উচ্চারিত হতে দেখা যায়। ব্রাজিলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার আগে Global Greens নামক সংগঠন মে মাসে তাদের একটি বক্তব্য তুলে ধরে। এই বক্তব্য ছিল তথ্যনির্ভর। তারা বিজ্ঞানীদের বরাত দিয়ে তথ্য দেন যে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯১ সালের গ্রীষ্মকালে ১৫০ বছরে সবচেয়ে বেশি গরম অনুভূত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে বলেন ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট বাড়বে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলে যে সমুদ্রের

পানি গড়ে প্রতি বছর ৬ মিমি বাড়বে, এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা হবে। উপকূল, সমুদ্রের দ্বীপাঞ্চল এবং নদীর চর এলাকা ভয়ানক ক্ষতির শিকার হবে। প্রতি বছর ১৭০০০ কোটি (১৭ বিলিয়ন) হেক্টর ট্রপিকাল বন ধ্বংস হচ্ছে, এবং এই বনের ৫০,০০০ প্রাণী ও গাছপালা মরে যাচ্ছে। মরুকরণের প্রবণতা বাড়ছে। পৃথিবীর প্রায় ১ হাজার ২০০ কোটি (১.২ বিলিয়ন) মানুষের খাবার পানির উৎস দূষিত হয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক তথ্য সন্দেহ নেই।

কিন্তু কারা করছে এই সব ধ্বংসাত্মক কাণ্ড? বিশ্বের মোট ভোগের ৮০% শিল্পোন্নত দেশগুলোতে হয় এবং তারাই বিশ্বের ৮০% পরিবেশ ধ্বংসের জন্য দায়ী। যেমন কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন হয় উত্তর আমেরিকায় প্রতি বছর ২০ টন, তুলনায় ব্রাজিলে হয় ২ টন এবং নাইজেরিয়ায় হয় মাত্র আধা টন। অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বায়ু দূষণের ক্ষেত্রেও ধনী শিল্পোন্নত দেশগুলো বড় অবদান রেখেছে। তারা গরিব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আমদানি করে ধ্বংস করছে, অন্যদিকে ধনী দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশে ৮৫% বিষাক্ত বর্জ্য রপ্তানি করছে। ইয়োরোপ থেকে ৭০% কীটনাশক রপ্তানি করা হয়, যা তৃতীয় বিশ্বের কৃষি ও প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংসের জন্য প্রধানত দায়ী।

বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৩ থেকে ১৪ জুন, ১৯৯২ তারিখে, ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে। এই সম্মেলনে বিশ্বের ১০৮ জন সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানসহ ১৭২টি দেশের প্রতিনিধিত্ব ছিল। বেসরকারি প্রতিনিধি এবং এনজিওদের সংখ্যা ছিল ২,৪০০। তবে প্রতিদিন এনজিও ফোরামে ১৭,০০০ মানুষের অংশগ্রহণ থাকত। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশ থেকে উবিনীগসহ আরো বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এনজিও ফোরামে অংশগ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন থেকেই জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সনদ (the United Nations Framework Convention on Climate Change) গৃহীত হয়েছিল। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল বায়ুতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা স্থিতিশীল করা যেন আবহাওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব না ফেলতে পারে, যা পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালে কিওটো প্রটোকলের চুক্তি পর্যন্ত এসেছে। ধনী দেশ বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে আগ্রহী নয়, তাই এখনো বায়ু গ্রিনহাউস নির্গমন কমানো সম্ভব হচ্ছে না। আলোচনা অব্যাহত আছে। বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ আরো দুটি দলিল হচ্ছে এজেন্ডা ২১ এবং প্রাণবৈচিত্র্য সনদ (Convention on Biological Diversity, CBD) । এই চুক্তিটি ১৯৯২ সালে ১৫০ টি দেশ স্বাক্ষর করেছে। এর মাধ্যমে প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা এবং এর সাথে সম্পর্কিত মানুষের জীবন-জীবিকা, খাদ্যনিরাপত্তা, ওষুধ, সংস্কৃতিসহ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক বিষয়গুলো গুরুত্ব পেয়েছে। জাতিসংঘ ২০১০ সালকে আন্তর্জাতিক প্রাণবৈচিত্র্য রক্ষা বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা : গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন

জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনার একটি বৈজ্ঞানিক দিক আছে। কারণ বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি যেসব কারণে ঘটছে তা বুঝতে হলে কিছু বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বোঝার প্রয়োজন হয়। যেমন কার্বন নির্গমন, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ইত্যাদি। এই কারণে মনে করা হত জলবায়ু পরিবর্তনের কথা বিজ্ঞানীরাই ভালো বোঝে, এটা সাধারণ মানুষের বিষয় নয়।

তাহলে প্রথমে একটু বিজ্ঞানীদের ভাষায় গ্রিনহাউস সম্পর্কে বোঝা যাক্। ডরশরঢ়বফরধ-র সূত্র ধরেই তথ্য সংকলন করছি। আসলে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্যে শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড নয়, পাঁচ ধরনের গ্যাস যেমন জলীয় বাষ্প (Water vapor), কার্বন ডাইঅক্সাইড (carbon dioxide), মিথেন (methane), নাইট্রাস অক্সাইড (nitrous oxide), ওজোন (ozone) এবং ক্লোরোফ্লুরোকার্বনস (chlorofluorocarbons) দায়ী।

এই সব গ্যাস বায়ুমণ্ডলে বিশোষিত হয় এবং নির্গমন করে। গ্রিনহাউস গ্যাসের কারণে এই ভূমণ্ডলে তাপ সৃষ্টি হয়। এই গ্রিনহাউস গ্যাস না থাকলে পৃথিবী গড়ে যে পরিমাণ গরম থাকে তারচেয়ে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৫৯ ডিগ্রি ফারেনহাইট) কম গরম থাকত। বর্তমানে বিশ্বের অস্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণ প্রধানত ১৭৫০ সাল থেকে ধনীদেশসমূহের শিল্পায়ন। তাই একে বলা হয় সধহ সধফব বা মানব-সৃষ্ট। আসলে বলা উচিত ধনী মানব-সৃষ্ট (এবং অবশ্যই পুরুষ-সৃষ্ট)। এবং তাদেরই ভৌগোলিক সীমানায় উত্তর মেরুতে যখন বরফ অস্বাভাবিকভাবে গলতে শুরু করেছে তখন ধনী দেশের মাথায় হাত পড়েছে।

যদিও মিথেন গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইডের তুলনায় ৮ গুণ বেশি নির্গমন করতে পারে, কিন্তু সার্বিকভাবে বৈশ্বিক তাপ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এর অবদান কম কারণ এর কেন্দ্রিভবন কম। চারটি প্রধান গ্যাসের গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টির ক্ষেত্রে অবদান নিম্নরূপ:

জলীয় বাষ্প : ৩৬ – ৭২%
কার্বন ডাইঅক্সাইড : ৯ – ২৬%
মিথেন : ৪ – ৯%
ওজোন : ৩ – ৭%

শিল্পোন্নত দেশে শিল্পায়নের কারণে ১৭৫০ সাল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসের কেন্দ্রিভবন শিল্পায়ন পূর্ব অবস্থা থেকে ১০০ পিপিএমভি (parts per million by volume, ppmv) বেড়ে গেছে। মানব-সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে:

১. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার এবং বন ধ্বংস, ২. গবাদিপশু পালন, ধান উৎপাদন ইত্যাদি মিথেন গ্যাস নির্গমনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, এবং ৩. রেফ্রিজারেশনের বা ঠাণ্ডা করার জন্যে chlorofluorocarbons (CFCs) গ্যাসের ব্যবহার এবং রাসায়নিক কৃষিতে nitrous ($^{N}2^{O}$) নির্ভর সার ব্যবহার করা।

শিল্পায়নের আগে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমন ২৬০ থেকে ২৮০ পিপিএমভি পর্যন্ত থাকত, কিন্তু ১৯০০ সাল থেকেই ২৮০ থেকে বাড়তে বাড়তে ৩৮৭ পিপিএমভি পর্যন্ত হয়েছে ২০০৯ সাল পর্যন্ত। শিল্পবিপ্লবের সাথে কার্বন নির্গমনের মাত্রার সরাসরি যোগ রয়েছে এবং প্রথম ২০০ বছরে ১০০ পিপিএমভি বেড়েছে আর ১৯৭৩ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত ৩৩ বছরে বেড়েছে ৫০ পিপিএমভি। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলে পিপিএমভি বৃদ্ধির গতি বর্তমান সময়ে ক্রমাগতভাবে বাড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন শীর্ষক আলোচনার রাজনীতি

১৯৯২ সালে বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন থেকে একটি বিষয় সামনে চলে এসেছে সেটা হচ্ছে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এটা সবাই মানে, কিন্তু দোষটা কার, কিংবা কে দায়িত্ব নেবে এটা কমাবার জন্যে তা নিয়ে বিরোধ আছে এবং দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রেও ধনী দেশের যথেষ্ট গড়িমসি ভাব লক্ষ করা যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের আন্তর্জাতিক সনদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের প্রতিনিধিদের সম্মেলন হতে শুরু করে ১৯৯৫ সাল থেকে। এই সম্মেলনকে বলা হয় সকল পক্ষের সম্মেলন (Conference of the Parties, COP) সংক্ষেপে কপ। এখনে পক্ষ বলতে স্বাক্ষরকারী দেশের পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের কথা বলা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে প্রথম কপ ১ অনুষ্ঠিত হয়, এবং সর্বশেষে কোপেনহেগেনে কপ ১৫ অনুষ্ঠিত হয় ডিসেম্বর ২০০৯ সালে। জাপানের কিওটো শহরে অনুষ্ঠিত কপ ৩ সম্মেলনে কিওটো প্রটোকল (Kyoto Protocol) গৃহীত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী শিল্পোন্নত দেশসমূহ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার কমানোর সিদ্ধান্ত হয়। সবশেষে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে কপ ১৫ সভা।

এই সভাগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে ধনী দেশ এবং গরিব দেশের ভূমিকা ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছে। ধনীদের ভোগবিলাসী জীবনব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন না এনে প্রযুক্তির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার নতুন কৌশল শুরু হয়েছে।

কিওটো প্রটোকল: জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমের একটি মাইলফলক চুক্তি

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সনদের (the United Nations Framework Convention on Climate Change) আওতায় জাপানের কিওটো শহরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কপ সম্মেলনে (COP3) জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তি কিওটো প্রটোকল বা

কিওটো চুক্তি গৃহীত হয় ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭। এতে ১৮৪টি দেশ স্বাক্ষর করেছেন। তবে এই চুক্তি কার্যকর হয় ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ সালে। এই চুক্তিতে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাবার জন্য ৩৭টি শিল্পোন্নত দেশ এবং ইয়োরোপীয় দেশের ওপর প্রয়োজনীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল ১৯৯০ সালের গ্যাস নির্গমনের পর্যায় থেকে শিল্পোন্নত দেশগুলো ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন ৫% কমাবে। জাতিসংঘের সনদ থাকা সত্ত্বেও কিওটো চুক্তির গুরুত্ব বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে সনদে (Convention) শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা স্থিতিশীল করতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, কিন্তু চুক্তির (Protocol) আওতায় তারা এই মাত্রা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থাৎ এক ধরনের বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক আছে। কিওটো চুক্তির মধ্যে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে, ধনী এবং শিল্পোন্নত দেশ গত ১৫০ বছরে শিল্পায়নের ফলে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য প্রধানত দায়ী, কাজেই এই চুক্তি অনুযায়ী তাদের দায়দায়িত্ব বেশি নিতে হবে।

কিওটো চুক্তির অধীনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রত্যেকটি দেশের জাতীয় পর্যায়ে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা। সেই লক্ষ্যে কিওটো প্রটোকল তিনটি বিশেষ বাজার-নির্ভর কার্যক্রমের (market-based mechanisms) ব্যবস্থা করেছে। এই তিনটি কার্যক্রম The Kyoto mechanisms নামে পরিচিত। এগুলো হচ্ছে:

১. নির্গমন বাণিজ্য বা কার্বন বেচাকেনা (Emissions trading)

২. পরিবেশবান্ধব কারিগরি সুবিধা Clean development mechanism (CDM)।

৩. যৌথ বাস্তবায়ন (Joint implementation (JI)

কিওটো চুক্তি কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, চুক্তিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেশসমূহের কার্বন নির্গমন কমাবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সহায়তা করা এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহকে কার্বন নির্গমন কমাবার জন্য উৎসাহ দেয়া। যৌথ বাস্তবায়ন এবং পরিবেশবান্ধব কারিগরি সুবিধা কার্বন-বাণিজ্যের প্রধান দুটি প্রকল্প, এর ব্যয় ২০০৬ সালে ছিল ৩০ বিলিয়ন ডলার। আসলে এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্বন-বাণিজ্য জায়েজ করা হয়েছে।

কিওটো প্রটোকলের আরো একটি দিক, যা এখন গরিব দেশের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনায় খুব প্রাধান্য পায় তা হচ্ছে, অভিযোজন-প্রক্রিয়া শুরু করা। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ক্ষতি হচ্ছে এবং হবে তার মোকাবিলার জন্য ধনী দেশ যারা কার্বন নির্গমনের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে পরিবেশের ক্ষতি করছে এবং বাতাসের উষ্ণতা বাড়িয়ে দিচ্ছে তাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তহবিল গঠন করার কথা বলা হচ্ছে। এই তহবিলের নাম হচ্ছে Adaptation Fund।

ধনী দেশগুলো নিজেদের সৃষ্ট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমাবার ক্ষেত্রে যেমন পদে পদে কথার বরখেলাপ করে তেমনি যখন অভিযোজন তহবিলে অর্থ দেয়ার কথা আসে তখনো তাদের গড়িমসি চলতে থাকে। এবার সর্বশেষ ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে আমরা তাদের সর্বশেষ খেলা দেখলাম। এর আগে পোল্যান্ড একটি পুরনো শহর পোজনান ১৪তম সম্মেলন (COP14) -এর আলোচনা ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৮ ভোররাতে সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণ ছিল জলবায়ু সংক্রান্ত অভিযোজন তহবিলে অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থের নতুন সূত্র নিয়ে সমঝোতা হয়নি। অর্থাৎ ধনী দেশের কার্বন-বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত অর্থের ওপর কোনো কর আরোপ করা হলে তারা সেটা দিতে রাজি নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলো এই আচরণে ক্ষুব্ধ হয়েছে। গরিব দেশের মানুষ ঘরবাড়ি হারাবে, খাদ্যের নিশ্চয়তা হারাবে, নানা রোগে ভুগবে এবং নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হুমকিতে থাকবে কিন্তু ধনী দেশ জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন নির্গমনও কমাবে না আবার তাদের সৃষ্ট সমস্যার কারণে গরিব দেশ যখন সমস্যায় ভুগবে তখন তাদের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও দেবে না।

পোজনান সম্মেলনে আরও একটি বিষয়ের ওপর মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল। সেটা হচ্ছে, অভিযোজন তহবিল (Adaptation Fund) কীভাবে কার্যকর করা হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবি ছিল এই তহবিল তারা নিজেরাই সরাসরি নেবে এবং নিজেরাই প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবে, কিন্তু ধনী দেশগুলোর প্রস্তাব হচ্ছে এটা বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে দেয়া।

কপ ও মপঃ জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সনদের বার্ষিক সভার ক্রমবর্ধমান ব্যর্থতার নজির।

জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সনদে (the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের বাৎসরিক প্রতিনিধি সম্মেলনকে কনফারেন্স অব দ্য পার্টিজ Conferencs of the Parties বা (COP) কপ বলা হয়। এই সভাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম কপ ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয়, ১৯৯৭ সালে কিওটো প্রটোকল গৃহীত হবার পর থেকে কপ সম্মেলনে চুক্তি অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিজ নিজ দেশের দায়িত্ব এবং দাবিদাওয়া চলতে থাকে, বিশেষ করে কপ সভাগুলোতে কে কত গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাবার উদ্যোগ নিয়েছেন কিংবা কিওটো প্রটোকল অনুযায়ী আইনি বাধ্যবাধকতা কতখানি মেনে চলছেন তা দেখার বিষয় থাকে। কপ সভায় শুধুমাত্র স্বাক্ষরকারী দেশ, যাদের পক্ষ বা পার্টি বলা হচ্ছে, তারাই অংশগ্রহণ করতে পারবেন। সর্বশেষ কপ ডিসেম্বর ২০০৯ অনুষ্ঠিত হবার সময় পার্টির সংখ্যা ছিল ১৯২।

কপ সম্মেলনে যারা অংশগ্রহণ করেন তাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগে আছে, এনেক্স ১ বা সংযুক্তি ১ দেশ। এর মধ্যে রয়েছে শিল্পোন্নত এবং

শিল্পোন্নয়ন সম্পন্নতার মধ্যবর্তী দেশসমূহ। এই তালিকায় সর্বমোট ৪০টি দেশ এবং আলাদাভাবে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন রয়েছে। এনেক্স ১-এর দেশগুলো যারা কিওটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করেছে তারা ভিত্তি বছর ১৯৯০ পর্যায়ে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা কমাবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দেশগুলো হচ্ছে: ১. অস্ট্রেলিয়া ২. অস্ট্রিয়া ৩. বেলারুশ ৪. বেলজিয়াম ৫. বুলগেরিয়া ৬. কানাডা ৭. ক্রোয়েশিয়া ৮. চেক রিপাবলিক ৯. ডেনমার্ক ১০. এস্তোনিয়া ১১. ফিনল্যান্ড ১২. ফ্রান্স ১৩. জার্মানি ১৪. গ্রিস ১৫. হাঙ্গেরি ১৬. আইসল্যান্ড ১৭. আয়ারল্যান্ড ১৮. ইতালি ১৯. জাপান ২০. লাটভিয়া ২১. লিখটেনেস্তিন ২২. লিথুনিয়া ২৩. লুক্সেমবার্গ ২৪. মোনাকো ২৫. নেদারল্যান্ডস ২৬. নিউজিল্যান্ড ২৭. নরওয়ে ২৮. পোল্যান্ড ২৯. পর্তুগাল ৩০. রোমানিয়া ৩১. রাশিয়ান ফেডারেশান ৩২. স্লোভাকিয়া ৩৩. স্লোভেনিয়া ৩৪. স্পেন ৩৫. সুইডেন ৩৬. সুইজারল্যান্ড ৩৭. তুরস্ক ৩৮. ইউক্রেন ৩৯. যুক্তরাজ্য ৪০. যুক্তরাষ্ট্র।

দ্বিতীয় ভাগে আছে এনেক্স ২ বা সংযুক্তি ২ দেশসমূহ। এরা হচ্ছে উন্নত দেশসমূহ যারা উন্নয়নশীল দেশসমূহের খরচ যোগাবে। সর্বমোট ২৪টি দেশ এবং পৃথকভাবে ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন এনেক্স ২ ভাগে রয়েছে। তুরস্ককে ২০০১ সনে তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে এনেক্স ২ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। তারা নিজেদেরকে মধ্যবর্তী দেশ বলে বিবেচনা করতে বলে, অর্থাৎ তারা এনেক্স ১-এ রাখার আবেদন করে। মূলত এনেক্স ২-এর দেশগুলো এনেক্স ১-এর মধ্যেই রয়েছে। সে কারণে এই ভাগকে এনেক্স ১-এর সাব-গ্রুপ বলা হয়। এই দেশগুলো হচ্ছে:
১. অস্ট্রেলিয়া ২. অস্ট্রিয়া ৩. বেলজিয়াম ৪. কানাডা ৫. ডেনমার্ক ৬. ফিনল্যান্ড ৭. ফ্রান্স ৮. জার্মানি ৯. গ্রিস ১০. হাঙ্গেরি ১১. আইসল্যান্ড ১২. আয়ারল্যান্ড ১৩. ইতালি ১৪. জাপান ১৫. লুক্সেমবার্গ ১৬. নেদারল্যান্ডস ১৭. নিউজিল্যান্ড ১৮. নরওয়ে ১৯. পর্তুগাল ২০. স্পেন ২১. সুইডেন ২২. সুইজারল্যান্ড ২৩. যুক্তরাজ্য ২৪. যুক্তরাষ্ট্র।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশসমূহ। অর্থাৎ ১৯২টি দেশের মধ্যে এনেক্স ১ এবং ২ বাদ দিলে বাকি দেশগুলো তৃতীয় ভাগে অন্তর্ভুক্ত ধরে নেয়া যায়।

আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত ২০০৪ সালে কপ ১০ পর্যন্ত শুধুমাত্র জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত সনদে স্বাক্ষরকারী পার্টি বা দেশের প্রতিদিধিদের সম্মেলন হয়েছে, কিন্তু ২০০৫ সালে কিওটো প্রটোকলে স্বাক্ষরকারী দেশের প্রতিনিধিদের সভা পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এই সভাকে বলা হয় কিওটো প্রটোকলের পক্ষদের সভা বা মিটিং অব দ্যা পার্টিজ, সংক্ষেপে মপ (Meetings of Parties of the Kyoto Protocol (MOP)। এর পর থেকে কপ এবং মপ একই সাথে অনুষ্ঠিত হয়, কপের সদস্যরা মপ সভায় পর্যবেক্ষক বা ড়নংবৎাবৎং হিসেবে থাকতে পারে। কিওটো প্রটোকলে নভেম্বর ২০০৯ পর্যন্ত স্বাক্ষরকারী দেশ হচ্ছে ১৮৬ এবং একটি আঞ্চলিক সংস্থা ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়ন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিওটো প্রটোকল স্বাক্ষর করেনি কাজেই যুক্তরাষ্ট্র কিওটো প্রটোকলের জন্য একটি নন-পার্টি দেশ। অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

এককভাবেই ১৯৯০ সালের পর্যায়ের ৩৬% নির্গমনের জন্য দায়ী। অথচ তারা নির্গমন কমাবার চুক্তিতে স্বাক্ষর না করে এই বাধ্যবাধকতার মধ্যে আসতে রাজি নয়।

প্রথম থেকে কপ সভা যেভাবে হয়ে আসছে তার মধ্যে প্রত্যেকটি সভা থেকে কিছু নতুন সিদ্ধান্ত এসেছে। তবে কয়েকটি সভা উল্লেখযোগ্যভাবে নজরে এসেছে কারণ এখানে এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে কিংবা সভাটি পণ্ড হয়েছে ধনী দেশের নিজ কর্তব্য পালনে গড়িমসির কারণে। নিম্নে প্রথম থেকে শেষ কপ/মপ সভাগুলোর একটি তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরা হচ্ছে। এই বর্ণনা থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় প্রথম থেকে ধনী দেশগুলোর অসহযোগিতা এবং কথার বরখেলাপের কারণে প্রায় প্রতিটি কপ ব্যর্থ হয়েছে। হাজার হাজার প্রতিনিধির অংশগ্রহণকে ব্যর্থ করে দিয়েছে শিল্পোন্নত দেশের আন্তরিকতার চরম অভাব।

১৯৯৫- কপ ১, দ্যা বার্লিন ম্যানডেট

১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিন শহরে প্রথম কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনকে জাতিসংঘের মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণা বলা হয়ে থাকে, যা বার্লিন ম্যানডেট নামে পরিচিত।

এই সম্মেলন শুরু করার আগে দুই বছর ধরে সব সার্বিক কার্যক্রমকে পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন করা হয়। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল– জলবায়ু পরিবর্তন, অর্থনীতি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ। বার্লিন মানডেট একটি উদাহরণ, যেখানে তালিকা (এনেক্স) বহির্ভূত দেশগুলোকে সম্মেলনে নিয়ে আসার একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব যোগ করা হয়। আরও বলা হয় পরবর্তী পনেরো বছর ধরে নব্য শিল্পোন্নত দেশগুলো পৃথিবীর সর্বাধিক গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করবে।

১৯৯৬-কপ ২, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

কপ ২, সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে ১৮ জুলাই ১৯৯৬ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল:

১. জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে ১৯৯৫ কপ-১-এর যে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি।

২. ইন্টার গভর্নমেন্টাল পেনেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ-এর বৈজ্ঞানিক ফলাফল গ্রহণ করা।

১৯৯৭-কপ ৩, দ্যা কিওটো প্রটোকল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ

জাপানের কিওটো শহরে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কপ ৩ অনুষ্ঠিত হয়। অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশ এবং মধ্য ইয়োরোপের কিছু দেশ ২০০৮-২০১২ এর মধ্যে ভিত্তি বছর ১৯৯০ থেকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৬-৮% কমাতে রাজি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা সে লক্ষ্যে ৭% কমানোর কথা। ক্লিনটন বা বুশ প্রশাসন কেউই এ বিষয় অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসে পেশ করেনি। বুশ প্রশাসন ২০০১ সালে পরিষ্কারভাবে প্রটোকল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রত্যাখ্যান করেন।

১৯৯৮-কপ ৪, বুয়েন্স আয়ারস, আর্জেন্টিনা

বুয়েন্স আয়ার্সে নভেম্বর, ১৯৯৮ সালে কপ ৪ অনুষ্ঠিত হয়। আশা করে হয়েছিল যে, কিওটো প্রটোকলের অমীমাংসিত বিষয়গুলো এখানে সমাধান হবে। কিন্তু বিষয়গুলো এতই জটিল ছিল যে, কোনোক্রমেই সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। এই সভায় দু বছরের জন্য একটি অ্যাকশান প্লান গ্রহণ করা হয় যাতে ২০০০ সালের মধ্যে কিওটো প্রটোকলের ধারাগুলো বাস্তবায়ন করা যায়।

১৯৯৯-কপ ৫, বন জার্মানি

জার্মানির বন শহরে ২৫ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর কপ ৫ অনুষ্ঠিত হয়। এটা ছিল মূলত একটি কারিগরি সভা। ফলে বড় কোনো উপসংহারে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

২০০০-কপ ৬, দ্যা হেগ নেদারল্যান্ডস

নভেম্বর এর ১৩-২৫, ২০০০, নেদারল্যান্ডস হেগ শহরে কপ-৬ অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুত মাত্রায় কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমাবার লক্ষণগুলো খুব ভালো ছিল না। তাই কপ ৬ সম্মেলনের সভাপতি জন প্রনক Jon Pronk শুরুতেই বলেন আমাদেরকে (অর্থাৎ ধনী দেশগুলো) আমাদের কাজটি করে ফেলতেই হবে। নিজেদের কথার মর্যাদা রক্ষা করা এবং এই পৃথিবীকে বাঁচাতে হলে এবং আমাদের সন্তান এবং সকল প্রাণের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা করতে হলে আমাদের কিছু করতেই হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত কপ ৬ ব্যর্থভাবেই শেষ হয়, কারণ মূল তিনটি বিষয় যেমন যুক্তরাষ্ট্রের বিতর্কিত বনায়ন ও কৃষি জমিতে কার্বন 'সিংক' নিয়ে প্রস্তাব, নির্গমন কমাবার চুক্তি না মানলে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে তা নিয়ে মতভেদ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ কীভাবে তাদের ক্ষতি পোষাবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য পেতে পারেন।

২০০১-কপ ৬ বন, জার্মানি

জুলাই ১৭ থেকে ২৭, ২০০১ জার্মানির বন শহরে কপ ৬ আবার অনুষ্ঠিত হয়। কেননা নেদারল্যান্ডের দ্য হেগ শহরে অনুষ্ঠিত সভায় অল্প সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। এই সভাকে কপ ৬ বিজ (Cop 6 - bis) বা Part 2 বলা হয়। কারণ এই সভায় মূলত কপ ৬-এর অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়েই আলোচনা হয়। যদিও অনেক সিদ্ধান্তই একই বছর কপ ৭-এর জন্য রেখে দেয়া হয়। এভাবে কপ ৬ পর পর দুই বছর ২০০০ এবং ২০০১ বছরে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০০১-কপ ৭, মারাক্কাশ, মরক্কো

২০০১ সালে মারাক্কাশ, মরক্কোতে অক্টোবর ২৯ থেকে নভেম্বরের ১০, ২০০১ বৈঠকে প্রটোকলের ২, ৩ অনুস্বাক্ষরের জন্য প্রস্তাব করা হয়। এখানে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো 'মারাক্কাশ ঘোষণা' হিসেবে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি এ বৈঠকে পর্যবেক্ষক ছিলেন এবং কোনো সমঝোতায় পৌঁছানো থেকে দূরে অবস্থান করেন। অন্যান্যরা আশা করেন যেকোনো পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। প্রটোকলটি বাস্তবায়নের জন্য আগস্ট-সেপ্টেম্বর ২০০২ পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়।

কপ-৭-এর প্রধান সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক নির্গমন বাণিজ্যের (Emission Trade) নিয়মকানুন প্রাধান্য পেয়েছে। শেষ দিনে অর্থাৎ ১০ নভেম্বর ভোর ৬টায় যখন অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিরা একেবারে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ছিলেন তখন একটি সমঝোতা (Agreement) স্বাক্ষর করা হয়। এই সমঝোতায় অনেক কিছু ছাড় দেয়া হয়। এই সমঝোতা কপ ৪-এ গৃহীত কর্মপরিকল্পনার (Buenos Aires Plan of Action) সাথে সঙ্গতিপুর্ণ বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করছেন।

মারাক্কাশ ঘোষণায় কনভেনশনে দুটি নতুন তহবিলের ঘোষণা দেয়া হয়। একটি হচ্ছে বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (Special Climate Change Fund-SCCF)এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তহবিল (Least Developed Countries Fund - LDCF)। মারাক্কাশ চুক্তির আওতায় সংযুক্তি ২-এর তালিকাভুক্ত দেশসমূহ জলবায়ু পরির্তন বিষয়ে তাদের সহযোগিতা ও অর্থায়নের প্রতিবেদন প্রদান করতে বাধ্য।

২০০২-কপ ৮, নয়াদিল্লি, ভারত

অক্টোবর ২৩-১ নভেম্বর ২০০২, ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কপ ৬ ও কপ ৭-এর সিদ্ধান্তের বাইরে সামান্য কিছু টেকনিক্যাল বিষয় এবং কম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। দিল্লি ঘোষণায় জলবায়ু পরিবর্তন রোধের বিধিমালা প্রণয়নের প্রশ্নে কপ ৮-এর অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর মধ্যে কঠিন এবং তিক্ত আলোচনা হয়েছে। তবে দিল্লি কপ ৮-এ যুক্তরাষ্ট্র একটু ভিন্ন সুরে কথা বলেছে। তারা এতদিন জোর দিচ্ছিল উন্নয়নশীল দেশকে কার্বন নির্গমনের মাত্রা কমাবার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে, দিল্লি সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে এটা 'অন্যায়' (Unfair) হবে।

২০০৩-কপ ৯, মিলান, ইতালি

১-১২ ডিসেম্বর, ২০০৩ ইতালির মিলান শহরে কপ ৯ অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের কথা খুব একটা প্রচার করা হয়নি, কারণ সরকারি পর্যায়ের পক্ষদের মধ্যে আলোচনা একই পর্যায়ে থেমে ছিল। সামান্য কিছু বিষয়ে মতৈক্য হয়েছে, যেমন বনায়নের মাধ্যমে কার্বন সিংক CDM নিয়ে প্রকল্পের আলোচনা। এই কপকে ফরেস্ট কপ বলা হয়। কিন্তু অন্য একটি বিষয় এখানে ফুটে উঠেছে। জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত

সনদের অন্তর্ভুক্ত পক্ষ বা দেশগুলোর মধ্যে যতই বিরোধ থাকুক না কেন, এর পাশাপাশি সামন্তরালভাবে এনজিও, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং একাডেমিক এবং গবেষকদের নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। এরা প্রতিটি কপ-এর সময় পাশাপাশি নিজেরাও আয়োজন করে এবং তাদের দিক থেকে আলোচনা ক্রমেই অগ্রসর হয়।

মিলানে অনুষ্ঠিত কপ ৯ সম্মেলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে এখানে নতুন প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন আগ্রাসী বহিরাগত প্রজাতি (Invasive Alien Species, IAS), জেনেটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম (genetically modified organisms, GMOs), এবং ক্ষুদ্র প্রকল্প (small-scale projects)। নতুন করে বনায়ন কিংবা বিলুপ্ত হওয়া বনকে পুনঃবনায়নের (afforestation and reforestation) জন্য ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম বা CDM-এর আওতায় প্রকল্প গ্রহণের কথা আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ে নরওয়েসহ কয়েকটি দেশ আপত্তি জানায়। শেষপর্যন্ত কপ ৯ ঘোষণা করে যে, নতুন করে বনায়ন কিংবা বিলুপ্ত হওয়া বনকে পুনঃবনায়নের ক্ষেত্রে আগ্রাসী বহিরাগত প্রজাতি (invasive alien species, IAS), জেনিটিকালি মডিফাইড অর্গানিজম (genetically modified organisms, GMOs) ব্যবহারের ঝুঁকি নিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশের জাতীয় আইন অনুযায়ী মূল্যায়ন করবেন।

২০০৪-কপ ১০, বুয়েন্স আয়ারস, আর্জেন্টিনা

আর্জেন্টিনার বুয়েন্স আয়ারস শহরে ৬-১৭ ডিসেম্বর, ২০০৪-এ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, কারণ জলবায়ু বিষয়ক জাতিসংঘ সনদ (UNFCCC) বলবৎ হওয়ার ১০ বছর পূর্ণ হয়েছে। উল্লেখ্য ১৯৯২ সালে এই সনদটি গৃহীত হয়, এবং ১৯৯৪ সালের ২১ মার্চ এটা বলবৎ করা হয়। কাজেই ১০ বছরে এই সনদের আওতায় কার্যক্রমের পর্যালোচনাসহ জলবায়ু পরিবর্তনের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। বিশেষ করে অভিযোজন পদক্ষেপ (Adaptation Measures), নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণের নীতি (Mitigation Policies) বিষয়ে আলোচনা হয়।

২০০৫-কপ ১১/মপ ১, মন্ট্রিল, কানাডা

কপ-১১ নভেম্বর ২৮ এবং ডিসেম্বর ৯, ২০০৫ কানাডার মন্ট্রিল শহরে অনুষ্ঠিত হয়। তখন কিওটো প্রটোকল বিষয়ে প্রাথমিক স্তরে আলোচনা হয়। এই প্রথম কিওটো প্রটোকলের স্বাক্ষরকারী দেশের প্রতিদিনিধিদের সভা মপ-১ অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণে এই সভার নাম কপ ১১/মপ ১ বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে মন্ত্রী পর্যায়ের সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল এটি। প্রায় ১০,০০০ এরও বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন এই সভায়। এই সম্মেলনে কার্বন নির্গমন ব্যবসায়ীদের বিরাট সমাগম ঘটেছিল এবং যারা Clean Development Mechanism-এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের কথা বলেছেন তারাও এখানে জড়ো হয়েছিলেন।

কপ ১১ সভায় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি বিশেষ করে The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)-এর সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। প্রচারমূলক প্রকাশনায় তারা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা তুলে ধরে। উল্লেখ করা যেতে পারে ব্যবসায়ীদের এই সংগঠন ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনরিওতে মাত্র ৫০টি ব্যবসায়ী সংগঠন ও কোম্পানি নিয়ে গঠিত হয়। মন্ট্রিলের সভায় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০ কোম্পানি।

কিওটো প্রটোকলের প্রথম পর্বের মেয়াদ শেষ হবে ২০১২ সালে। মাত্র ৭ বছর সময় হাতে রেখে প্রটোকলের স্বাক্ষরকারী দেশসমূহের প্রথম প্রতিনিধি সভা হিসেবে মনট্রিলে কপ ১১ পর্যন্ত আসতে গিয়ে ধনী ও শিল্পোন্নত দেশগুলো মাত্র ৫.৯% হ্রাস করেছে। মনট্রিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আরো অনেক বেশি কার্বন নির্গমন হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনট্রিল ঘোষণা বা প্রটোকল অনুযায়ী ৪০টি ধনী দেশ কিওটো প্রটোকলের সময়সীমা পার হবার পরও নির্গমনের মাত্রা আরও বেশি পরিমাণে কমাবার দেনদরবারে সম্মত হয়েছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়া এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করলেও অধিকাংশ শিল্পোন্নত দেশ তাদের নির্গমনের মাত্রা কমাবার জন্য বৈজ্ঞানিক কারণগুলো মেনে নিয়েছে।

২০০৬-কপ ১২/মপ ২, নাইরোবি, কেনিয়া

কপ ১২ ৬-১৭ নভেম্বর, কেনিয়ার নাইরোবি শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় আফ্রিকার খরায় আক্রান্ত শিশু ও নারীদের বিষয়ে আলোচিত হয়। একই সাথে মপ ২ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্রথমবারের মতো কিওটো প্রটোকলের সংশোধনী আনা হয়। বেলারস তার পক্ষ থেকে কার্বন নির্গমন কমাবার লক্ষ্যমাত্রা ৫% থেকে ৮% বৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য আশ্বাস দেয়ার প্রেক্ষিতে তাকে মপের সদস্য করা হয়। এই সভায় অভিযোজনের পদক্ষেপ, বনধ্বংসের কারণে জলবায়ুর ওপর ক্ষতিকর প্রভাব এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়।

২০০৭-কপ ১৩/মপ ৩, বালি, ইন্দোনেশিয়া

ডিসেম্বর, ৩ থেকে ১৫, ২০০৭ ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে কপ ১৩/মপ ৩ অনুষ্ঠিত হয়। ইস্যু ছিল কিওটো প্রটোকলের অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। এই সভাটিও আকারে অনেক বড় ছিল, ১৮০ দেশের প্রায় ১০,০০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সভা থেকে বালি রোড ম্যাপ The Bali Road Map গৃহীত হয়। বালি রোড ম্যাপের মধ্যে বালি কর্মপরিকল্পনা (Bali Action Plan) গ্রহণ করা হয়। এই কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য নতুন আলোচনা প্রক্রিয়া শুরু করা, অভিযোজন তহবিল, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বনধ্বংসের

কারণে জলবায়ুর ওপর নেতিবাচক প্রভাবের কথা আলোচনায় গুরুত্ব পায়। কারণ শুধুমাত্র গ্রীষ্মমণ্ডল বন (Tropical forest) ধ্বংসের কারণে নিট গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের হার ২০%।

২০০৮-কপ ১৪/মপ ৪, পোজনান, পোল্যান্ড

ডিসেম্বর ১-১২ তারিখে পোল্যান্ডের পোজনান শহরে কপ ১৪/মপ ৪ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় কিওটো প্রটোকলের অধীনে অভিযোজন তহবিলের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সমাপ্ত হয়, এবং বলা হয় যে Adaptation fund Board-এর সরাসরি উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অর্থ প্রদানের আইনি এখতিয়ার থাকবে।

পোজনানে এসে বোঝা গেছে যে, যতই বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব নিয়ে কথা বলা হোক না কেন, নির্গমন কমাবার ব্যাপারে ধনী দেশের পদক্ষেপ নেয়ার গতি অনেক দুর্বল এবং ধীর। কাজেই ২০১২ সালে কিওটো প্রটোকলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরবর্তী ধাপ কী হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিতে শুরু করেছে। বালি সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত দেশের জন্যে ১৯৯০ সালের ভিত্তি বছরের পর্যায় থেকে ২৫-৪০% কার্বন ডাইঅক্সাইডের নির্গমন কমাবার লক্ষ্যমাত্রা শুধুমাত্র ক্ষতিকর প্রভাব প্রতিরোধ করতে পারবে। কিন্তু সত্যিকারের সাফল্য অর্জন করতে হলে কমপক্ষে ৪০% নির্গমন মাত্রা কমাতেই হবে।

২০০৯-কপ ১৫/মপ ৫, কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক

ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে কপ-১৫/মপ-৫ সম্মেলন ৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনকে সাধারণভাবে কোপেনহেগেন শীর্ষ সম্মেলন বা Copenhagen Summit বলা হয়। এখানে বালি রোড ম্যাপ অনুযায়ী ২০১২ সালের জলবায়ু পরিবর্তন নিরোধের জন্য চুক্তি হবার কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত কোপেনহেগেন সম্মেলন কোনো প্রকার চুক্তি গৃহীত না হয়েই শুধুমাত্র কোপেনহেগেন সমঝোতা Copenhagen Accord দিয়েই শেষ হয়। এই সমঝোতাটি তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। আলোচনা যখন শেষ পর্যায়ে তখন কোনো প্রকার আলোচনা ছাড়াই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গৃহীত এই চুক্তিটি উন্নয়নশীল দেশের প্রতিনিধিরা স্বাক্ষর করেন অনেকটা বাধ্য হয়ে। ডেনমার্কের জলবায়ু ও জ্বালানি মন্ত্রী কোনি হেডেগার্ড (Connie Hedegaard) ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সম্মেলনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন কিন্তু হঠাৎ করেই পদত্যাগ করে ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী লার্স রাসমুসেন (Lars Lokke Rasmussen)-এর হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে সরে দাঁড়ান। এই সম্মেলনের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা শেষ দিনে অংশগ্রহণ করেন এবং কোপেনহেগেন

সমঝোতা প্রণয়নে বিশেষভাবে চীন, ভারত, ব্রাজিল ওক্ষিণ আফ্রিকাকে প্রভাবিত করেন। বাংলাদেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

২০১০-কপ ১৬/মপ ৬, মেক্সিকো

কপ ১৬/মপ ৬, ২৯ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০১০ অনুষ্ঠিত হবে।

টীকা:

১. The Limits to Growth by Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen
Randers, and William W. Behrens III. Published Books, 1992। এই বইটি ১৯৭২
সালে প্রকাশিত হবার পর ১২ মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়েছে এবং ৩০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। মনে
করা হয় যে এই বইটি পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বিক্রিত বই। এই বইতে ১৭৯৮
খ্রি: তথাস মালথাস জনসংখ্যা ও পরিবেশ সম্পর্কে যে ধরনের সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন
তার কিছুটা পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যায়। এই বইটি ২০০৪ সালে আবার আপডেট করা হয় Limits to
Growth: The 30-Year Update নামে।

২. Our Common Future, Report ot the World Commission on Environment and
Development, World Commission on Environment and Development, 1987.
Published as Annex to General Assembly document A/42/427, Development
and International
Co-operation: Environment August 2, 1987. Retrieved, 2007.11.14

[লেখক: গবেষক, সমাজসেবক।]

প্র ব ন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন : একটি মার্কসীয় অনুসন্ধান

নূ র মো হা ম্ম দ

[সূচনা বক্তব্য: নিবন্ধটি শিল্পবিপ্লবের সাবালক হয়ে উঠার সময়ে প্রকৃতি-পরিবেশ বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস-এর সামান্য কিছু বক্তব্য নিয়েই রচিত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের সাথে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সম্পর্ক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাথে প্রাণ-প্রকৃতির সম্পর্ক নির্ণয়ের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা– এই নিবন্ধটির তাৎপর্য মূলত এখানেই সীমাবদ্ধ।]

প্রকৃতি চলে প্রকৃতির নিয়মে। অনেকটা এ ধরনের কথাই ছোট বয়সে বড়দের কাছ থেকে শুনতাম। জলবায়ু তথা প্রকৃতির মধ্য থেকেই প্রাণের উদ্ভব। জলবায়ু এই পৃথিবীর প্রাণ ও প্রকৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে। প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে ধ্বংসাত্মক অনেক কিছুই রয়েছে– ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত, সামুদ্রিক ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, বৈশাখি ঝড়, বন্যা, ধস খরা (অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি), জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, বিশেষ করে বনে অগ্নিকাণ্ড, নদীর গতি পরিবর্তন, নদী ভাঙন ইত্যাদি ইত্যাদি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট নিয়মচক্রের প্রক্রিয়া মানবজাতিকে জানান দিয়েছে। হাজার হাজার বছর আগেই মানুষ প্রকৃতির অংশ হিসেবে প্রকৃতির সাথে এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থাননীতি চালু করে। প্রকৃতির কাছ থেকে তার গ্রহণ ছিল প্রত্যক্ষ – কোনো উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন ছাড়াই। এ-সময়কালে মানুষ প্রকৃতির যে ক্ষতিসাধন করত তাতে করে প্রকৃতিতে উল্লেখযোগ্য ভারসাম্যগত পরিবর্তন হত না এবং ধীরে ধীরে মানুষের একটা অংশ পাহাড়ে বা গহীন বনে থেকে গেল– যাদের একটা অংশ অদ্যাবধি প্রকৃতির সাথে কথোপকথন করতে জানে।

কিন্তু মানুষ থেমে থাকেনি। মানুষ উৎপাদন-পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াই একটা সমাজ গড়ে তুলল। আর এই সমাজবদ্ধ মানুষ একটা পর্বে শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। শোষণ, নিপীড়ন ও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের একটি শ্রেণী বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে– মাতব্বরি করার জন্য– ভোগ করার জন্য এবং উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিকানা যাতে নিজ সন্তান-সন্ততিদের হাতেই থাকে তার ব্যবস্থা

নিশ্চিত করার জন্য এবং ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিতে সমাজ-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার সময়কাল থেকেই মূলত অর্থনৈতিক যুগের সূচনা।

মানুষ হয়ে পড়ে মানুষের সব থেকে বড় শত্রু। মানুষের প্রতি মানুষের নির্মমতা ক্রমাগত বৃদ্ধিই পেয়েছে এবং ভয়াবহ সব ঘটনাবলির সাবুদ আমাদের হাতের কাছেই রয়েছে। 'কী কী জিনিস তৈরি হচ্ছে তাই দিয়ে নয়, পরন্তু কী ভাবে এবং কী কী হাতিয়ার দিয়ে সেগুলো তৈরি হচ্ছে তা থেকেই বিভিন্ন অর্থনৈতিক যুগের পার্থক্য আমরা স্থির করি।' (মার্কস, পুঁজি, ১:১, ১৯৮৮, ২২৯)

মানুষ আধুনিক অর্থে তখনই 'সভ্য' যখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর যুগে প্রবেশ করে– উৎপাদন পদ্ধতি/প্রণালী প্রতিনিধিত্ব করে দুইটি পারস্পরিক সম্পর্কের ঐক্যের উপাদানকে : উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক। এবং এই যুগকেই শিল্পবিপ্লবের যুগ বলে অভিহিত করা হয়েছে। যার শুরু ১৭৫০-এর দশক থেকে।

আমাদের অর্থনীতি বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে বলা হয় যে, পুঁজিবাদের প্রতীক বা চরিত্র মানবজাতিকে পণ্য ও সেবা প্রদান করে। প্রকৃতপক্ষে, পুঁজিবাদের চরিত্র তা নয়। পুঁজি পুঞ্জীভূত করাই পুঁজিবাদের প্রকৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয়ে প্রায় দেড়শ বছর যাবৎ পুঁজি পুঞ্জিভূত করার জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিস্থিতি ছিল। মোটামুটি এই পর্বটি শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। (সুইজি, ২০০৮, ১৩০)

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শুরু হয় ভয়ংকর লালসা, জনগণের ওপর ভয়াবহ নিপীড়ন ও হিংস্র নরহত্যার মাধ্যমে। পুঁজির যে আদিম সঞ্চয়ন হয় তার কথা বলতে গিয়ে মার্কস বলেন, স্বতন্ত্রভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের উপায়গুলোর সামাজিকভাবে কেন্দ্রীভূত উপায়ে রূপান্তর, বহুসংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির অল্প সংখ্যক মানুষের বৃহৎ সম্পত্তিতে রূপান্তর, জনসাধারণের এক বিরাট অংশকে জমি থেকে, জীবিকার উপায় থেকে এবং শ্রমের উপায় থেকে দখলচ্যুত করা, জনসাধারণের এই ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক দখলচ্যুতি হল পুঁজির ইতিহাসের উপক্রমণিকা। তা গঠিত হয় একাধিক বলভিত্তিক পদ্ধতির ক্রমিক সমন্বয়ে, যার মধ্যে আমরা পর্যালোচনা করেছি শুধু সেইগুলো, যেগুলো পুঁজির আদিম সঞ্চয়ের পদ্ধতি হিসেবে যুগান্তকারী ছিল। প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের দখলচ্যুতি সাধিত হয়েছিল নিষ্ঠুর বর্বরতার সঙ্গে, আর এর পিছনে ছিল সবচেয়ে কলঙ্কপূর্ণ, সবচেয়ে নোংরা, নীচতম ও জঘন্য বাসনার তাড়না (মার্কস, ১:২, ১৯৮৮, ৩২৪)

ইউরোপীয় দেশগুলো নিজ নিজ দেশে যে ভয়ানক প্রক্রিয়া শুরু করে তার প্রারম্ভিক তেজিয়ান অবস্থার সৃষ্টির প্রধান কারণ সদ্য-উপনিবেশে পরিণত করা দেশগুলোতে অবাধ লুণ্ঠন ও নরহত্যা। মার্কস-এর ভাষায়, পুঁজিবাদী সঞ্চয়নের পূর্বেই দেখা দেয় আদিম সঞ্চয়ন, যে সঞ্চয়ন পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর ফল নয়, বরং তার যাত্রাবিন্দু (মার্কস, ১:২, ১৯৮৮, ২৬১)।

আমেরিকা আবিষ্কার, আদিবাসী জনসমষ্টির মূলোৎপাটন, তাদের দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা ও খনিগুলোতে তাদের কবরস্থ করা। ইস্ট ইন্ডিয়া বিজয় ও লুণ্ঠনের প্রারম্ভ

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে কালা-আদমি জোগাড়ের জন্য আফ্রিকাকে পণ্যক্ষেত্রে পরিণত করা, এইগুলো ছিল পুঁজিবাদী উৎপাদনের যুগের গোলাপ-রাঙা ঊষাগমের সংকেত। এই কাব্যিক কার্যধারাগুলোই হল আদিম সঞ্চয়ের গতিবেগ। তার পিছনে পিছনে আসে সারা ভূমণ্ডলকে রঙ্গমঞ্চ করে ইউরোপীয় জাতিগুলোর বাণিজ্যিক যুদ্ধবিগ্রহ।

আদিবাসীদের ওপর স্বভাবতই সব থেকে মারাত্মক অত্যাচার চলেছিল। ওয়েস্টইন্ডিজ-এর মতো নিছক রফতানি ব্যবসায়ে লিপ্ত বাগিচা-উপনিবেশগুলোতে এবং মেক্সিকো ও ভারতের মতো সম্পদশালী ও জনবহুল দেশগুলোতে, যেখানে চলেছিল লুটতরাজের অবাধ তাণ্ডব; । উপনিবেশগুলো উঠতি শিল্পসমূহের জন্য বাজারের যোগান দিত এবং একচেটিয়া বাজারের মারফত পুঁজির সঞ্চয় বাড়িয়ে তুলত। নগ্ন লুণ্ঠন, দাসত্ব, বন্ধনারোপ ও হত্যার মধ্যদিয়ে ইউরোপের বাইরে যে সম্পদ আহরিত হত তা স্বদেশে প্রেরিত হয়ে পুঁজিতে পরিণত হত। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় ঋণ, গুরু করভার, সংরক্ষণ, বাণিজ্য সংক্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ, ইত্যাদি, প্রকৃত ম্যানুফাকচারিং যুগের এই সন্তান-সন্ততিরা আধুনিক শিল্পের শৈশবে প্রচণ্ড হারে বৃদ্ধি লাভ করে। শেষোক্তদের জন্মের পূর্বাভাস হিসেবে এসেছে নিরীহ মানুষের প্রচণ্ড হত্যাকাণ্ড। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর 'শ্বাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মাবলি' প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিক ও শ্রমের অবস্থার মধ্যে বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা, এক মেরুতে উৎপাদন ও জীবিকা অর্জনের সামাজিক উপায়গুলোকে পুঁজিতে রূপান্তরিত করা এবং বিপরীত মেরুতে ব্যাপক জনগণকে মজুরি-শ্রমিকে, 'মুক্ত খেটে খাওয়া মানুষের' আধুনিক সমাজের সেই কৃত্রিম সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে এত শ্রম বৃথা যায়নি। অজিয়েরের মতে অর্থ 'যদি পৃথিবীতে আসে এক গালে সহজাত রক্ত চিহ্ন নিয়ে' তবে পুঁজি আসে আপাদমস্তক ও প্রতিটি রোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরাতে ঝরাতে (মার্কস ১:২, ১৯৮৮; ৩১০, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৮, ৩২১, ৩২২)।

মন্তব্য :

মার্কস বর্ণিত 'আধুনিক' ইউরোপ বা ইউরোপে আধুনিকতার উদ্ভব উপনিবেশের গোলাম অর্থাৎ আমাদের দৃষ্টিতে সাদাদের 'সভ্য' হওয়ার (ইউরোপ কথিত 'সভ্য' হওয়া মানে ধরে নেয়া হয় পৃথিবী আধুনিক 'সভ্যতা' গড়ে তুলল) সূত্রপাত হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এবং যার মূলে রয়েছে আদিম সঞ্চয়ন ও পুঁজি'র আদিম সঞ্চয়ন-এর যুগ। আর এই সমকালকেই বলা হয়েছে, আগেই যা বলেছি অর্থাৎ শিল্পবিপ্লবের যুগ, এবং আজ, যে মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে এতসব হৈ চৈ যার প্রধান উপাদান হল কার্বন– এই শিল্পবিপ্লবের সময়কালই হল এই কার্বন এমিশন বা কার্বন নির্গমন শুরু হওয়ারও নির্দিষ্ট সময়কাল। 'কার্বন'-এর সৃষ্টি হল জীবাশ্মজ্বালানি মারফত : তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস। যদিও কার্বন নির্গমনের পরিমাণ শিল্পবিপ্লবের প্রথম দিকে আজকের তুলনায় সামান্যই ছিল বলা যাবে।

মানুষের সাথে প্রকৃতি ও পরিবেশের হিসেব-নিকেশ বা দরকষাকষিতে দৃশ্যত মনে করা হয় মানুষই জয়ী হল কিন্তু প্রতিটি বিজয় নিশ্চিত করে ভবিষ্যতের ভয়াবহ পরাজয়কে তবে তখন জীব-জগতসহ গোটা ধরিত্রী অস্তিত্বহীনতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। পুঁজিবাদ কি ভয়ংকর গণবিরোধী,– নৃশংস একটি সমাজব্যবস্থার ভিত্তি তা কিন্তু সংক্ষেপে হলেও মার্কস-এর বয়ানে বিখ্যাত 'পুঁজি' গ্রন্থ থেকে জানা গেছে। যে সমাজব্যবস্থাতে সব থেকে হিংস্র কায়দায় নরহত্যা-গণহত্যা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিবেচিত হয়েছে, সেই পুঁজিবাদ পরিবেশ হত্যাতে বিন্দুমাত্র পিছপা হবে না সেটা খুব তর্ক করে বুঝানোর দরকার পড়ে না। লোভ ও মুনাফা পুঁজিবাদীদের যে কোনো ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না। পানি, বায়ু, মাটি, ওজোনস্তর, জৈব-বৈচিত্র্য আইসক্যাপ এসব আজ ধ্বংসের মুখে পড়েছে। এই হচ্ছে এখনকার অবস্থা যার জন্য গত দেড়'শ বছরের কার্বন নির্গমনই প্রধানত দায়ী– যা সর্বাধিক বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে প্রধানত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বছর।

পুঁজিপতিরা প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যকে মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে পরিবর্তিত করে। মার্কস-এর ভাষায়; শ্রম এমন একটি প্রক্রিয়া যাতে মানুষ ও প্রকৃতি উভয়েই অংশগ্রহণ করে এবং মানুষ নিজের ইচ্ছানুযায়ী প্রকৃতি ও তার নিজের মধ্যে বৈষয়িক ঘাত-প্রতিঘাতগুলোর সূচনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রকৃতির অন্যতম শক্তিরূপে সে নিজেকে প্রকৃতির বিপরীতে স্থাপন করে এবং প্রকৃতির সৃষ্ট জিনিসগুলোকে নিজের প্রয়োজন পূরণের উপযোগী রূপে ভোগদখলের জন্য তার শরীরের স্বাভাবিক শক্তিগুলো– তার বাহু ও পা, মস্তিষ্ক ও হাতকে সচল ও সক্রিয় করে। এই ভাবে সক্রিয় হয়ে বাহ্যজগতের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাতে তাকে পরিবর্তিত করে একই সঙ্গে সে নিজের প্রকৃতিও বদলায় (মার্কস, ১:১, ১৯৮৮, ২২৬) মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিকাশের ওপর মন্তব্য করেন; ধনতান্ত্রিক উৎপাদন যে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিকাশ ঘটায় এবং বিবিধ প্রক্রিয়ায় সংযোজনের মাধ্যমে একটি সামাজিক সমগ্রতা গড়ে তোলে তা কেবল সম্পদের মূল উৎস দুটিকে নিঃশেষিত করার মাধ্যমে সম্পাদিত করে। সেই উৎস দুটি হল মৃত্তিকা ও শ্রমিক। (মার্কস, ২০০৯, ২, ২১৫-২১৬)

পরিবেশের ওপর পশুদেরও ভূমিকা শনাক্ত করা যায়। কিন্তু প্রাণীজগতের মধ্যে মানুষের ভূমিকা শনাক্ত করা প্রয়োজন হয় আলাদাভাবে। 'পরিবেশের ওপর পশু-প্রাণীরা যদি কোনো স্থায়ী ফলাফল রেখে যায় তো সেটা ঘটে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং খোদ প্রাণীগুলোর দিক থেকে দেখলে এটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। পশু-প্রাণী থেকে মানুষ যতটা সরে যায়, ততই কিন্তু প্রকৃতির ওপর তাদের প্রতিক্রিয়ার চরিত্র দাঁড়ায় পূর্বচিন্তিত পরিকল্পিত একটা ক্রিয়া যার লক্ষ্য হল আগে থেকে জানা নির্দিষ্ট কতকগুলো উদ্দেশ্যের সাধন' (এঙ্গেলস, রচনা সংকলন, ২.১, ১৯৭২; ৮৪)।

প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে প্রাণী ও মানুষের সম্পর্কগত বৈশিষ্ট্যকে আরো নিশ্চিতভাবে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রাণীরা শুধু বহিঃপ্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং কেবলমাত্র নিজের উপস্থিতি দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে পরিবর্তন আনে; মানুষ কিন্তু তার

পরিবর্তন দ্বারা প্রকৃতিকে তার উদ্দেশ্য-সাধনে লাগায়, প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করে। প্রকৃতির ওপর মানুষের এই জয়লাভে আমরা যেন খুব বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ না করি। কারণ ঐরকম প্রতিটি জয়লাভের জন্যই প্রকৃতি আমাদের ওপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করে। এ কথা সত্য যে, প্রত্যেকটি জয়ের ফলাফল সর্বাগ্রে আমাদের ধারণানুসারী। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রে এর ফলাফল হয় সম্পূর্ণ পৃথক এবং অভাবিতপূর্ব। আর প্রায় তা প্রথমকে ব্যর্থ করে দেয়। উদাহরণস্বরূপ এঙ্গেলস্ বলেন, 'মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, এশিয়া মাইনর এবং অন্যান্য জায়গায় যে মানুষ কৃষি-উপযোগী জমি পাবার জন্য অরণ্যকে নির্মূল করে দিয়েছিল, তারা স্বপ্নে কোনোদিন ভাবতে পারেনি যে, অরণ্যের সঙ্গে সঙ্গে এইভাবে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ ও ধারণ করবার কেন্দ্রগুলোও নিঃশেষিত করে তারা এই দেশগুলোর বর্তমান বিধ্বস্ত অবস্থার ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছিল ইত্যাদি।'
এইসব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এঙ্গেলস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন;

(ক) প্রতিটি পদক্ষেপে এইভাবে আমাদের স্মরণ রাখতে হয় যে, বিজেতা যেমন বিজিত জাতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে, আমরা কোনো অর্থেই সেভাবে, প্রকৃতির বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে পারি না। বরং রক্ত, মাংস আর মস্তিষ্ক নিয়ে আমরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত, প্রকৃতির মধ্যে আমাদের অস্তিত্ব; এবং প্রকৃতির ওপর আমাদের সমস্ত প্রভুত্ব এইখানে যে, অন্য সকল জীবের চেয়ে আমাদের এই সুবিধা, আমরা প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে এবং নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম।

(খ) ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আমরা ক্রমশ আমাদের উৎপাদনী কার্যাবলির পরোক্ষ দূরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে শিখছি আর এইভাবে সে ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতির সম্ভবনাও আমাদের সামনে দেখা দিচ্ছে। তবে, এই নিয়মিতি কার্যকরী করতে হলে শুধু জ্ঞান ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন। তার জন্য চলতি উৎপাদন-পদ্ধতিতে ও সেই সঙ্গে আমাদের সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় একটা পরিপূর্ণ বিপ্লব প্রয়োজন। (২.১. ১৯৭২- ৮৬, ৮৭)

অর্থাৎ এঙ্গেলস পরিষ্কারভাবে দুটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত, উৎপাদনী কার্যাবলির পরোক্ষ দূরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন এবং এই ভাবে সে ফলাফল নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মিতির সম্ভবনা সম্পর্কে সজাগ থাকা। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক সমাজব্যবস্থায় একটা পরিপূর্ণ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা। ১৮৭২ সালে ত. কুনোকে এক পত্রে এঙ্গেলস লেখেন, 'পুঁজির উচ্ছেদই হচ্ছে সমাজবিপ্লব এবং এর ফলে সমস্ত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে।' (২.২, ১৫৪)

মন্তব্যঃ

প্রায় দেড়শ বছর আগে মার্কস্-এঙ্গেলস পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর শারীরসংস্থান এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে সাধারণভাবে মানুষের যেমন তেমনি শ্রেণী হিসেবে পুঁজিপতি শ্রেণীর সম্পর্ক ও সম্ভাব্য পরিণতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করেছেন এবং প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্তের মধ্য দিয়ে প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী অবস্থানের বিপরীতে রক্ত, মাংস আর মস্তিষ্ক দিয়ে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকৃতিতেই আমাদের অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করেছেন ।

আমরা লক্ষ করলে পরিষ্কারই দেখতে পাব এঙ্গেলস পরিবেশের সাথে প্রাণীদের (পশু ও মানুষ) সম্পর্ক প্রসঙ্গে বিবর্তনের ধারাকে বিশ্লেষণ করেছেন;

ক. পরিবেশের ওপর পশু-প্রাণীরা যদি কোনো স্থায়ী ফলাফল রেখে যায় তো সেটা ঘটে অনিচ্ছাকৃতভাবে এবং খোদ প্রাণীগুলোর দিক থেকে দেখলে এটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র;

খ. পশু-প্রাণী থেকে মানুষ যতটা সরে যায় (অর্থাৎ মানুষ যত বেশি বেশি করে নতুন নতুন 'হাতিয়ার' সৃষ্টি , তার উন্নতি সাধন ও প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে থাকে/প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে), ততই কিন্তু প্রকৃতির ওপর তাদের প্রতিক্রিয়ার চরিত্র দাঁড়ায় পূর্বচিহ্নিত পরিকল্পিত একটা ক্রিয়া যার লক্ষ্য হল আগে থেকে জানা নির্দিষ্ট কতকগুলো উদ্দেশ্য সাধন;

গ. ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে আমরা ক্রমশ আমাদের উৎপাদনী কার্যাবলির পরোক্ষ দূরবর্তী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে শিখছি ।

এপর্যন্ত এসে কিন্তু এঙ্গেলস থামলেন না, তিনি যা বললেন, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে তাঁরই ভাষায় প্রকৃতির ওপর মানুষের কার্যাবলির ফলাফল 'নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মীতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে', এখানে প্রাণীদের 'লুটেরা অর্থনীতি' বা 'আগে থেকে জানা নির্দিষ্ট কতকগুলো উদ্দেশ্য সাধন' প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাচ্ছে– অর্থাৎ দূরবর্তী পরোক্ষ ফলাফলকে (এখন অবশ্য দূরবর্তী নেই, এবং ফলাফল অতি দ্রুতই চাক্ষুষ– এই নিবন্ধের লেখক) নিয়ন্ত্রণ করার অপরিহার্যতা এবং তার নিয়মিতির প্রয়োগ । কিন্তু তিনি নিশ্চিত পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীতে এর কোনো সম্ভাবনা নেই । যার জন্য তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে 'এই নিয়মিতি কার্যকরী করতে হলে শুধু জ্ঞান ছাড়া আরও কিছুর প্রয়াজন' । এই যে, 'আরও কিছু প্রয়োজন'– এটাই হচ্ছে যেন সিদ্ধান্তমূলক নির্দেশনা– 'উৎপাদনী কার্যাবলির দূরবর্তী ফলাফল' এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে প্রকৃতিবিজ্ঞানের ওপর সমাজবিজ্ঞানের পদ্ধতিগত সমস্যা হাজির করা– 'নিয়মিতির' সম্ভাবনা উল্লেখ কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে– 'আরো কিছুর প্রয়োজন' বাস্তবেও কার্যকরী করতে হবে, 'তার জন্য চলতি উৎপাদন পদ্ধতিতে ও সেই সঙ্গে আমাদের সমসাময়িক সমাজব্যবস্থাই একটা পরিপূর্ণ বিপ্লব' । এঙ্গেলস এখানে একেবারেই সাফ-সাফ, কোনো জটিলতা নয়– কোনো 'সম্ভাবনা'র বক্তব্য নয়– একেবারেই সরাসরি; পরিপূর্ণ বিপ্লব– উৎখাত করতে হবে চলতি উৎপাদন পদ্ধতি (Capitalist Mode of

production / পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালী) এবং সেই সাথে পুরো ধ্যানধারণা সমেত পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকেও– একেবারে ধ্বংস সাধন করা ।

তাহলে দেখা গেল, 'অন্য সকল জীবের চেয়ে আমাদের (অর্থাৎ মানবজাতির) এই সুবিধা, আমরা প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে এবং নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম'– এই সাধারণ প্রত্যয় থেকে আলাদা করে এখানে প্রত্যয়টিকে বিশেষায়িত করা হল । আমরা প্রকৃতির নিয়ম আয়ত্ত করতে পারি এবং নির্ভুলভাবে (এখানে নির্ভুল অর্থে সত্যিকার পরিবেশবান্ধব হবে তা– লেখক) প্রয়োগ করতে পারি এই শর্তে যে, পরিপূর্ণ বিপ্লব সমাধা হয়েছে । যতক্ষণ তা না হবে প্রাণীদের 'লুটেরা অর্থনীতি' পুঁজিপতিরা ভয়ঙ্কর ও আরো ভয়ঙ্করভাবে চালিয়ে যাবে, 'উন্নয়ন' ও 'প্রবৃদ্ধি'র নামে এই প্রক্রিয়া আরো ভয়ানক হয়ে উঠবে ।

মানুষ প্রজাতিক্রমেই প্রকৃতিবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে চলছিল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অস্তিত্বহীনতার ধারাবাহিকতায় সমাজ পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর কবলমুক্ত থাকলে 'মানবপ্রজাতি'– উন্নত প্রাণীপ্রজাতি বা মানবজাতি হিসেবে প্রকৃতিবিজ্ঞানকে নিজ প্রজাতির সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় স্বার্থে কাজে লাগাতে পারত এবং আজকে 'জলবায়ু পরিবর্তন'-এর কারণে প্রাণ ও প্রকৃতি যে মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন তা এড়ানো যেতে পারত, সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের একটি শ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের ভোগ, অতিরিক্ত ভোগ, বিকৃত ভোগ– ভোগের বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে, যুদ্ধ চালু না রেখেই একটি গণতান্ত্রিক ও সুষম সমাজব্যবস্থা থাকতে পারত– তা নিশ্চয় আশা করা যায় । কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উৎখাত না করতে পারলে এই আশা এখন শুধু স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছু নয় । তাছাড়া সমস্ত মানবজাতির জন্য কোনো 'আশা' তো বহু শতাব্দী আগেই কবরস্থ হয়েছে, তবু আমরা মাঝে মাঝে 'আশা'র মরণোত্তর প্রত্যাশাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি– কল্পলোকে স্বস্তি সন্ধানে শুধু নয়, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া; এই যে 'এরাই' হচ্ছে 'তারা' যাদের জন্য শত শত কোপেনহেগেন ক্ষতিগ্রস্ত ধরনী ও তার প্রজাদের কোনো কাজেই আসবে না ।

এঙ্গেলস প্রবন্ধটি শেষ করেন এই কথাগুলো বলে; ব্যক্তি পুঁজিপতিরা যেহেতু আশু মুনাফার জন্য উৎপাদন ও বিনিময়ে আত্মনিয়োগ করে, তাই সর্বাগ্রে তার নিকটতম ও আশুতম ফলাফলই হিসাবে নিতে পারে তারা । ব্যক্তি শিল্পোৎপাদক অথবা বণিক যতক্ষণ তার শিল্পোৎপন্ন বা কৃত পণ্যটি স্বাভাবিক মুনাফায় বিক্রি করতে পারছে ততক্ষণ সে সন্তুষ্ট, পরে সেই পণ্য অথবা ক্রেতার কী ঘটল তা নিয়ে তার ভাবনা নেই । এই একই ক্রিয়ার প্রাকৃতিক ফলাফল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । অতি লাভজনক কফি গাছের শুধু একটি আবাদের জন্য কিউবার স্পেনীয় বাগিচা-মালিকেরা যখন পর্বতের বুকের অরণ্য ভস্মীভূত করে ছাই থেকে সার যোগাড় করেছিল, তখন গ্রীষ্মমণ্ডলের ভীষণ বারিপাতের অধুনা অরক্ষিত মাটির স্তর ভেসে গিয়ে কেবল নগ্ন শিলাস্তর পড়ে থাকবে কিনা এ নিয়ে তাদের কী-ই বা মাথাব্যথা? যেমন প্রকৃতি তেমনি

সমাজের দিক থেকে বর্তমান উৎপাদন-পদ্ধতি প্রধানত শুধু প্রথম ফলাফল, শুধু নগদ ফলাফল নিয়েই ভাবিত। (২.১.১৯৭২–৮৮)

এঙ্গেলস বর্ণিত প্রবন্ধটির আগে অন্য একটি লেখাতে বলেছিলেন; 'একমাত্র মানুষই প্রকৃতির ওপর নিজের ছাপ মেরে দিতে পেরেছে শুধু উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর আলাদা আলাদা প্রজাতিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে নয়, তার নিজের বাসস্থানের জলবায়ু এবং বাইরের চেহারাকে এমনভাবে পরিবর্তন করে, এমনকি গাছপালা জীবজন্তুগুলোকেও এমনভাবে বদলিয়ে দিয়ে যে, একমাত্র পৃথিবীর সামগ্রিক নির্বাপণ ছাড়া মানুষের কার্যকলাপের এই সব ফলাফলের অবলোপ কিছুতেই হবে না।' উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের দ্বান্দ্বিকতার আলোকে এঙ্গেলস আরো বলেন, 'সাধারণভাবে উৎপাদন যেমন বাকি জীবজগত থেকে মানুষকে প্রজাতি হিসেবে উন্নীত করে দিয়েছে ঠিক তেমনি সামাজিকভাবে মানুষকে অন্য জীবজগতের থেকে উন্নীত করতে পারে শুধুমাত্র সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠন,– যার মধ্যে উৎপাদন ও বণ্টন হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী'। (এঙ্গেলস, ১৯৭২, ২.১, ৭০, ৭১)

মন্তব্য :

এখানেও এঙ্গেলস অত্যন্ত উজ্জ্বলতার সাথে বলেন,– মানুষ অন্য জীবজগতের থেকে নিজেকে উন্নীত করতে পারবে কিভাবে? 'শুধুমাত্র' সামাজিক উৎপাদনের সচেতন সংগঠনের মারফত– যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন হবে পরিকল্পনা অনুযায়ী। অর্থাৎ শর্ত থাকে যে,– 'শুধুমাত্র'– এঙ্গেলস কোনো বিকল্প প্রস্তাবের অবকাশ রাখেননি।

এর পর এক অসাধারণ দৃঢ়তায় তিনি সামাজিক 'উৎপাদনের সচেতন সংগঠন'-এর ভবিষ্যত সম্পর্কে বলেন, 'ইতিহাস বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিনই এরকম সংগঠন আরো অপরিহার্য ও সম্ভব হয়ে উঠেছে। সেই থেকেই ইতিহাসের নতুন যুগ শুরু হবে, যে যুগে মানুষের নিজের এবং তার সঙ্গে তার কার্যকলাপের সমস্ত শাখার, বিশেষ করে প্রকৃতিবিজ্ঞানের এমন সব অগ্রগতি দেখা যাবে, যার সামনে আগেকার সমস্ত অগ্রগতি ম্লান হয়ে যাবে।' (তদেব, ৭১)

মন্তব্য :

সত্যি সত্যি ইতিহাসের নতুন যুগের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। 'প্যারি কমিউন'-এর ব্যর্থতার পর ১৯১৭ মহান অক্টোবরে রাশিয়াতে বিপ্লব। স্তালিন-এর আমলেই সুসমন্বিত করা হল 'পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টন'। বিশ্বব্যাপী এই পরিকল্পনা খ্যাতি লাভ করল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা হিসেবে।

এরপর সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের উদ্ভব, পরিকল্পনা অনুযায়ী উৎপাদন ও বণ্টনের যথাযথ প্রয়োগ প্রচেষ্টা এবং অবশেষে বহুবিধ কারণে ৯০'র দশকে ইতিহাসের এই যে নতুন যুগ তা পুরনো, পচা, দুর্গন্ধময়, পুঁজ ও রক্তে ভরা নৈতিক অধঃপতনের চরমসীমানায় পৌছানো পুঁজিবাদের কাছে সাময়িকভাবে পর্যুদস্ত হল এবং বিপরীতে

১৯৯০-এ ইরাকে সামরিক আগ্রাসনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ ফিরে গেল তার কদর্য আদিম সঞ্চয়নের যুগে। এবং ২০০৭ পুঁজিবাদীদের নেতা খোদ মার্কিন মুল্লুক থেকে শুরু হল মহামন্দা। কথিত বিশ্বায়ন পর্বের একবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই পুঁজিবাদের ভিত্তি টলিয়ে দেবার মতো 'মহামন্দা'র জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্বের দরকার পড়েনি। যতদিন পুঁজিবাদ ততদিন মন্দা, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য– হতদরিদ্র লোকের ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি, বেকারত্ব, পরিবেশের ওপর হামলা ও নিয়তির মতো যুদ্ধ অনিবার্য থাকবে।

পুঁজিবাদ, মার্কস-এঙ্গেলস এবং সমসাময়িক বিশ্ব

কাহিনীর শুরু হল দেড়শ বছর আগে। মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে (১৯৪৭-৪৮) বললেন: 'আগেকার যুগ থেকে বুর্জোয়া যুগের বৈশিষ্ট্যই হল উৎপাদনে অবিরাম বিপ্লবী পরিবর্তন, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অনবরত নড়চড়, চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তা এবং উত্তেজনা।'

মন্তব্য :

যতদিন পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন মানবসমাজ অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনার অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে না– এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং এক গভীর অনিশ্চয়তা হাজারও গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, দেড়শ বছর ধরে পুঁজিবাদী দেশগুলোর বিশ্বব্যাপী মুনাফা অর্জনের জন্য দানবীয় এক উত্তেজিত পদচারণার ফলাফল হিসেবে। একদিকে যুদ্ধ, মন্দা, বেকারত্ব ও সীমাহীন নৈতিক অবক্ষয় এবং অন্য দিকে মুনাফা ও 'ভোগ' থেকে 'কুৎসিত ভোগ-বিলাসিতা' ও বিপুল অপচয়ের কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন এমনভাবে হয়েছে যে, ধরিত্রী নিজেই গুরুতর অস্তিত্ব সংকটে নিপতিত এবং যার ফলে পৃথিবীর শত শত কোটি মানুষ বিশেষ করে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনে বিরাট এক হুমকির মুখে। বিশ্বের সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকার শীর্ষে থাকা দেশ হিসেবে বাংলাদেশের একটি পরিচিতি (এতে আরো একটা বড় বিপদ দেখা দিয়েছে: বিপন্ন পরিবেশ থেকে দেশ বাঁচাও আন্দোলনের নামে কতিপয় পরিবেশবাদী ব্যবসায়ী এখন দারুণ উল্লসিত; ফান্ড– এবং আরো ফান্ডের খোঁজে উত্তেজনায় সব অসুস্থ হয়ে পড়েছে) বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এনজিও, রাষ্ট্র ও সরকার মহা খুশি– যারা আজ বাংলাদেশের এই পরিণতির জন্য দায়ী তাদের দ্বারে দ্বারে চলছে বিরামহীন ছুটোছুটি– ছোট ছোট প্রকল্প থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কথিত বড় বড় প্রকল্প নিয়ে শুরু হয়েছে 'খয়রাত'-এর জন্য কামড়াকামড়ি।

পেট্রোলিয়াম ও কয়লা যারা যত বেশি ব্যবহার করছে ও করবে তারা ক্ষতিগ্রস্তদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে 'দয়ার' 'রুটির টুকরো'– মূল সমস্যা সমাধানের বিষয়টি চাপা পড়ুক– কার্বন এমিশনের প্রধান দেশগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের ঘৃণা ও সংগ্রাম নয়– তথাকথিত 'প্রাপ্য হিস্যা'র (প্রাপ্য হিস্যার ধারণাটি তৈরি করা হয়েছে) জন্য

আমাদের মতো দেশগুলোর অর্থনীতিবিদ, জলবায়ু বিশেষজ্ঞগণ, এনজিও, সিভিল সোসাইটি, সরকার, রাষ্ট্র,– এসব প্রতিষ্ঠান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ঠেকিয়ে দেওয়ার নামে 'প্রকল্প' তৈরি করবে আর ধনী দেশগুলোতে গিয়ে তদবির করবে এবং বলবে এছাড়া আর কিই-বা করার আছে বলুন!

মার্কস-এঙ্গেলস পুঁজিবাদী উৎপাদনে অবিরাম পরিবর্তনের বাধ্যবাধকতা আছে বলে উল্লেখ করেছিলেন। এবং তা ক্রমাগত দেড়শ বছর ধরেই প্রমাণিত হয়ে চলেছে। বর্তমানে আমরা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের বা একটি নতুন শিল্পবিপ্লবের পর্বে পৌছেছি। যার মূলে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক প্রযুক্তি। প্রথম শিল্পবিপ্লব সংগঠিত হয়েছে বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে; দ্বিতীয় শিল্পবিপ্লবকে চিহ্নিত করা হয়েছে বিদ্যুৎশক্তি চালু করার প্রক্রিয়া দিয়ে; তৃতীয় শিল্পবিপ্লব হল স্বয়ংক্রিয় ইঞ্জিন (Internal Combustion) আবিষ্কার যা শিল্পজগতে মূলত এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়; চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মূলত ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির বিকাশ। এই পর্ব আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে অজৈব ও জৈব রসায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে– নতুন নতুন যে যৌগ তৈরি হচ্ছে তাতে করে কাঁচামালের পুরনো ধারণা পাল্টে যাচ্ছে। তাছাড়া জেনেটিক বিপ্লব, সেবা পণ্যের উৎপাদন ও নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থায় (তথ্য প্রযুক্তিসহ) অভূতপূর্ব পরিবর্তন– তামার তারের বদলে ফাইবার অপটিকস।

কমিউনিস্ট ইশতেহারের ঘোষণা থেকে বর্ণিত উপরের দুটি লাইন সামনে রেখেও সমসাময়িক পুঁজিবাদের যে চেহারা দাড়িয়েছে তাতে এ কথা ঢাক-ঢোল পিটিয়েই বলা যাবে মার্কস-এঙ্গেলস ছিলো শিল্পবিপ্লবের সাবলকত্বের কাল থেকে এ পর্যন্ত এবং যতদিন শেষ বৈর সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ থাকবে ততদিন তারাই থাকবেন পঁজিবাদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিনাশের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাদাতা। তাঁরা শুধু ব্যাখ্যা দেবার জন্যই ব্যাখ্যা দেননি– তাঁরা পুঁজিবাদের বিনাশ বা উচ্ছেদের শুধু তাত্ত্বিক নন– সংগ্রাম, সংগঠন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রের সম্ভাব্য অবয়ব সম্পর্কে দিকনির্দেশক এবং নিরলস কর্মীর ভূমিকাও পালন করেছেন।

তারা পুঁজিবাদের গতির নিয়মাবলি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন যতদিন পুঁজিবাদ ক্রমাগত সংকটগ্রস্ত হবে– পরিবর্তনশীলতা বাধ্যবাধকতাভাবেই চরিত্রগত এবং যতই সে পরিবর্তশীল ততই সে আরো বেশি বেশি করে প্রাণ-প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য। পুঁজিবাদ কখনোই জীবন ও পরিবেশবান্ধব হতে পারবেই না, জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত এই ব্যাখ্যা প্রশ্নাতীত ভাবে নির্ভুল বলে প্রমাণিত। নিশ্চিত ভাবেই মার্কসবাদ শেষ বৈরী সমাজব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদকেই চিহ্নিতকরণ ও তা উৎখাত করে অবৈর সমাজব্যবস্থা হিসেবে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী মতবাদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রত্যয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে, মার্কস-এঙ্গেলস যেভাবে পুঁজিবাদ পর্যবেক্ষণ এমনকি দৈনন্দিন ছোট-খাট ঘটনাবলি প্রত্যক্ষ ও প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করে তাদের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তসমূহ নির্মাণ করেছেন সে ভাবে সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক দেশ বা সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের উদ্ভব ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করেননি। সেই অর্থেও এটা

বলা যাবে মার্কসবাদ কমিউনিজম সাপেক্ষ কিন্তু সমাজতন্ত্রের সাথে সম্পর্কিত হলেও সমাজতান্ত্রিক দেশ সাপেক্ষ বা সমাজতান্ত্রিক দেশের কর্মকাণ্ড প্রক্রিয়ার সাথে শর্তসাপেক্ষ নয়। কখন সমাজতন্ত্র কায়েম হবে, হলে পশ্চাদপসরণ (বরং পশ্চাদপসরণ হওয়ার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন পরবর্তীকালে লেলিন ও মাওসেতুং। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা থেকেও তা বহাল রাখা বেশি বেশি লড়াইয়ের কাজ বলে উল্লেখ করেছেন) হবে কি হবে না তার সাথে মার্কসবাদের দায়বদ্ধতা শর্তাধীন নয়।

মার্কস-এঙ্গেল পুঁজিবাদ থেকে কমিউনিজম– একটা ঐতিহাসিক যুগের সমস্যা হিসেবে গণ্য করেছেন। ফলে, এই যুগ পর্বে যে অভূতপূর্ব চড়াই-উৎরাই থাকতে বাধ্য তা তাদের বোধগম্য ছিল। এ কারণে পুঁজির/পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীর গতিবিধির নিয়মাবলি আবিষ্কারই তাদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে স্বীকৃত হতে থাকবে– পরিণতি যে শেষ বৈর সমাজ থেকে চূড়ান্ত অবৈর সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ প্রশ্নে তাদেরও কোনো দ্বিধা ছিল না আমাদেরও থাকবার মতো কোনো কারণ ঘটেনি।

দেখা যাচ্ছে উৎপাদন শক্তি এমন একটা অবিশ্বাস্য পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যার মালিকানা বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের হাতে থাকলে পৃথিবীর এখনকার ৬৫০ কোটি মানুষের জীবনে বাস্তবে কথিত 'স্বর্গের' সাক্ষাৎ মিলত কিন্তু পুঁজিবাদ যেমন উৎপাদন শক্তিকে ক্রমাগত উন্নীত না করে পারবেই না তেমনি তার ফল যাতে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি না পেতে পারে– 'সব সম্পদ' মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ বা বিশেষ শ্রেণীর হাতে থাকবে– এবং যার জন্য খেসারত দিতে হবে প্রাণ-প্রকৃতি সহ পুরো ধরিত্রীকে– নিশ্চিত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে জেনেও পুঁজিবাদ নিজ থেকে এই ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে পারবে না, তাকে ধ্বংস করতে হবে। ইতোমধ্যেই অবশ্য 'পরিবেশতাত্ত্বিক' বা 'ধারণযোগ্য' পুঁজিবাদ 'তত্ত্ব' প্রমাণ করেছে, পুঁজিবাদকে গণতান্ত্রিক, মানবিক, ওয়েলফেয়ার স্টেট ইত্যাদি নামে প্রতিষ্ঠিত করতে বহুদশক ধরে পুঁজিবাদের পণ্ডিতরা বিভিন্ন সময়ে সমস্যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একটা নতুন বক্তব্য বেশ গালভরা নামে অভিহিত করে এবং প্রচার হাতিয়ার ব্যবহার করে দুনিয়াব্যাপী একটা সাড়া ফেলে দিতে চেষ্টা করে। ফলে দেখা যায়, পরিবেশতাত্ত্বিক বা ধারণযোগ্য পুঁজিবাদ ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে ধোঁয়াটে করে তোলা হয় 'পরিবেশতাত্ত্বিক উন্নয়ন' বা 'ধারণযোগ্য উন্নয়ন'– নামকরন করে। আসলে এসব কায়দা-কানুন ক্রমাগত জারি করা হতে থাকে পুঁজিবাদকেই রক্ষা করার জন্য।

কিন্তু যুদ্ধ, মন্দা ও বেকারত্ব, দারিদ্র্য অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে এই দেড়শ বছরে আরো অনেক বেশি মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আমরা আগেই দেখেছি পুঁজিবাদের উৎপত্তিতে রয়েছে আদিম পুঁজি সঞ্চয় ও আদিম সঞ্চয়ের জন্য ভয়ঙ্কর নরহত্যার ইতিহাস। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠার একেবারে মূলেই রয়েছে যুদ্ধ ও নরহত্যা-গণহত্যা, শুধু তাই নয় মাঝে মাঝে কিছু সময় বাদে বড় বড় যুদ্ধ এবং দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ। ৬ (ছয়) কোটি মানুষ দুটো বিশ্বযুদ্ধের বলি– বিরাট সব অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির কথা তো বাদই রাখতে হল। সমরাস্ত্র উৎপাদন এবং যুদ্ধে তা বিনিয়োগ

সরাসরি নির্মম নরহত্যাকেই ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছে ও ছোট বড় বসতি, ছোট বড় শহর, বিপুল আবাদ ও আবাদি জমি লণ্ড ভণ্ড করে দিয়েছে (সেনানিবাস ও সামরিক স্থাপনা কেড়ে নিয়েছে ঠিক কত পরিমাণ জমি তার কোনো হিসাব জানা নেই) এবং ইরাক-আফগানিস্তানে প্রতিটি মুহূর্তে যুদ্ধ কী অবর্ণনীয় বিপর্যয় ঘটিয়ে চলেছে তা পুঁজিবাদের দালালদের চক্ষুগোচর হয় না। বিশ্বের অধিকাংশ দেশ, জাতি ও জনগণের কাছ থেকে জোরপূর্বক সম্পদ লুণ্ঠন করতে গেলে একদিকে অব্যাহত যুদ্ধ– ধরিত্রী ধ্বংস এবং অন্যদিকে, সারা বিশ্বের মানুষকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, পরিচ্ছদ, বাসস্থানের জন্য উৎপাদন নয়, শুধু মুনাফার জন্য উৎপাদন, নতুন নতুন বহু মূল্যবান বিলাসদ্রব্য উৎপাদন-প্রক্রিয়াই হচ্ছে কার্বন নির্গমনের প্রধান কারণ। এ কথা লজ্জাকরভাবে এবং একেবারেই উলঙ্গভাবে প্রমাণিত। বাংলাদেশের অন্তত বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষিতরা আমেরিকা-ইউরোপের বিরুদ্ধে– যুদ্ধের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলতে একেবারেই নারাজ।

যুদ্ধ যে শুধু চরিত্রগত ও প্রক্রিয়াগতভাবে বিধ্বংসীমূলক তাই নয় যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও তার ব্যবহার এমনকি ব্যবহার না করা অস্ত্রের তদারকি, দিবারাতের প্রতিটি ক্ষণ আকাশ, ভূমি ও প্রধানত সমুদ্রে যুদ্ধযানগুলোর চলমানতা ও বিশ্বকে পাহারাদারিতে রাখার জন্য টহলদারী প্রক্রিয়ায় প্রতি মুহূর্তে ঠিক কী পরিমাণ জ্বালানি খরচ হচ্ছে তার যথাযথ পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই। তবে এর পরিমাণ যে বিপুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই– এবং পুরো যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও যুদ্ধপ্রক্রিয়া বজায় রাখার মধ্য দিয়ে পরিবেশের ওপর যে বিরাট চাপ সৃষ্টি হয়, মানুষ ও প্রকৃতি সরাসরি বিনাশের কবলে পড়ে তা সাধারণত পরিবেশবাদীরা গুরুত্বসহকারে সামনে হাজির করতে চান না। সাম্রাজ্যবাদীদের ডলার গিলে পরিবেশ আন্দোলন করা যায় বটে (সকল আন্দোলন ও তার উদ্যোক্তাদের একই ভাবে সারিবদ্ধ করা হচ্ছে না) তবে সরাসরি যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ এবং যা স্বভাবতই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সাথে জড়িত তা সযত্নে পরিহার করা হয়।

যা হোক, এখন দেখা যাক (সংক্ষেপে) উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে কী ভূমিকা রেখেছে এবং সারা বিশ্বে এর প্রভাব এখন কোন স্তরে। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং রয়েছে তথ্যের ছড়াছড়ি। হালখাতার বিষয়ভিত্তিক সংখ্যায়ও এর খতিয়ান পাওয়া যাবে। আমি খুবই সংক্ষেপে নিচে কার্বন নির্গমন সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কস-এর মতামতকে সামনে রেখে মাত্র দুটি উদাহরণ হাজির করছি :

মার্কস লিখেছেন, 'পুঁজিবাদের অধীনে পুঁজি ও তার বৃদ্ধি মনে হয় সূচনাবিন্দু আর শেষ গন্তব্য, (আর) উৎপাদন হল শুধু পুঁজির জন্য উৎপাদন।' তা হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন এবং পুনরুৎপাদন অব্যাহত থাকতে বাধ্য– পুঁজি বৃদ্ধির শর্তে এবং ক্রমাগত পুঞ্জিভবনে। 'পুঁজি' গ্রন্থে যন্ত্রের পরিণতি প্রসঙ্গে মার্কস বলেন, 'যন্ত্রপাতির আশু ফল হল উদ্বৃত্ত-মূল্য এবং যে উৎপাদের সমষ্টিতে উদ্বৃত্ত মূল্য নিহিত আছে তার বৃদ্ধি সাধন। পুঁজিপতি ও তাদের ওপর নির্ভরশীলদের দ্বারা উপভুক্ত ঐশ্বর্যের পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পায় সমাজের এসকল শ্রেণী ততই সম্প্রসারিত হয়। এই নতুন এবং

বিলাসপ্রবণ চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাদের ক্রমবর্ধমান ধনসম্পদ এবং জীবন ধারণের অপরিহার্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিকের তুলনামূলকভাবে কমতে থাকা সংখ্যার পাশাপাশি নতুন ও বিলাসী চাহিদা দেখা দেয় আর এসব চাহিদা পূরণের মাধ্যমগুলো তৈরি হয়। সমাজের উৎপন্নের অধিকতর অংশ উদ্বৃত্ত উৎপাদে পরিবর্তিত হয় এবং উদ্বৃত্ত উৎপাদের এক বৃহত্তর অংশ বহুবিধ মার্জিত আকারে ভোগের জন্য সরবরাহ হয়। অন্য ভাষায় বলা যায় যে, বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।' (মার্কস, ১:১, ১৯৮৮, ৫৪১-৪২) 'পুঁজি' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশের প্রায় দেড়শ বছর পর এটা স্পষ্ট যে বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাম্রাজ্যবাদী অগ্রসর কেন্দ্রগুলোতে বা মেট্রোপলিসগুলোতে এমনসব প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটেছে, যেগুলো উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে; (সুইজি, ২০০৮, ১৩৫)

সুইজি দেখাচ্ছেন, যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১০ সালে ১৯ হাজার লোকের মধ্যে একজনের গাড়ি ছিল, ১৯২০-এ দাঁড়াল প্রতি ১১ জনে ১টি। ১৯৩০ সালে ৪.৫, ১৯৪০ সালে ৪.১, ১৯৫০ সালে ৩.১, ১৯৬০ সালে ২.৪, ১৯৭০ সালে ১.৯। অন্য ভাবে বলা যায়, এখন যুক্তরাষ্ট্রে যত মানুষ তার অর্ধেকের বেশি গাড়ি। তিনি দেখান, গাড়িশিল্প যত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তার সাথে সাথে নগর ও গ্রামের মধ্যে ভূ-প্রকৃতিগত প্রার্থক্য কমে যায়, সড়কব্যবস্থার ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং এই শিল্পটি বিস্তার শুরু হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সময়কাল থেকে। সুইজির প্রবন্ধটির নাম 'গাড়ি আর নগর'। আমরা এর সাথে যে ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি যোগ করছি তা হল প্রায় এক শতাব্দী ধরে এই গাড়ির ব্যবহার চলে আসছে জীবাশ্মজ্বালানি ব্যবহার করে অর্থাৎ নির্বিবাদে বহু কোটি গাড়ি প্রতিদিন নির্দয়ভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন/এমিশন করে চলেছে। পেট্রোলিয়াম আর কয়লা কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের প্রধান উপাদান। এবং এই পেট্রোলিয়াম থেকেই তৈরি হয় পেট্রোল বা অকটেন, ডিজেল ইত্যাদি।

সারা বিশ্বে গাড়ি তা সে প্রাইভেট ব্যবহারের জন্যই হোক, যাত্রী পরিবহন ও মালামাল পরিবহনের জন্যই হোক বা অন্যান্য কাজে লাগুক– যে বিপুল সক্রিয়তা প্রতি মুহূর্তেই সারা বিশ্বে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে তা ভাবলে প্রাণ-প্রকৃতির মৃত্যুপরোয়ানা দেখতে বিশেষ বিজ্ঞানের দরকার আছে বলে মনে হয় না। বর্তমানে বিশ্বে আনুমানিক ৭০ কোটির বেশি রেজিস্টার্ড গাড়ি রয়েছে। ১৯৯২ সালের একটি পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে রেজিস্টার্ড গাড়ির পরিমাণ ৫০ কোটি। তবে সেখানে বলা হয়েছিল বৃদ্ধির হার যদি অব্যাহত থাকে তবে ২০২৫ সালে এর পরিমাণ ৪ গুণ বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ ২৫০ কোটি মোটরযান (শেরিল সাইমন সিলভার ও রুথ এস ডেফ্রিস, ১৯৯২, ৪৮)। মোটরগাড়ির ইঞ্জিন থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে সাথে নাইট্রোজেন অক্সাইডও নির্গত হয়। এই নাইট্রোজেন অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে বিক্রিয়া সংগঠনের ফলে অম্ল সঞ্চয় হিসেবে বর্ষিত হয়। আর গাড়ির শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থেকে নির্গত হয় সি,এফ,সি-জ।

দ্বিতীয়ত, রেফ্রিজারেটর (ফ্রিজ), শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র/এয়ার কন্ডিশন, স্প্রে প্লাষ্টিকের বাক্স, ফোম, রং ইত্যাদি ।

এতক্ষণ তো রাস্তায় ছিলাম, এবার এলাম ঘরে । শুধু ঘরে কেন, ঢাকা শহরেই তো কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শপিংমল, অফিস, সেমিনার কক্ষ তো অনেক–অনেক । বাংলাদেশেই বেশ কয়েক লক্ষ পরিবার ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশন ব্যবহার করে থাকে আর রং ও স্প্রে-র ব্যবহার তো যত্রতত্র । উপরে বর্ণিত শিল্প উৎপাদনমূলক কাজে সিএফসি গ্যাসের ব্যবহার হয় । সি.এফ.সি. বা ক্লোরোফ্লুরোকার্বন কতগুলো রাসায়নিক যৌগ । সি.এফ.সি. ও সি.এম.সি. বা ক্লোরোফ্লুরো মিথেন-এর ওজোন স্তর নাশের ব্যপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । এ কথা এখন বিশেষজ্ঞ মহলে বহুলভাবে জানা আছে যে, অতিবেগুনি রশ্মি ঠেকিয়ে দিতে ওজোন স্তর যা রক্ষা আস্তরণ হিসেবে কাজ করে । শুধুমাত্র আমেরিকা ও জাপান ৩০ শতাংশ সিএফসি'জ ব্যবহার করে থাকে (মোহিত রায়, ১৯৯৮, ২১০, ২১১: শেরিল সাইমন ও রুথ এস ডেফ্রিস, ১৯৯২, ৬৪ । হালনাগাদ কোনো পরিসংখ্যান হাতের কাছে নেই) মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজবিজ্ঞান হল মূলত উন্নয়ন বিজ্ঞান যার রূপ বা আধার হল সমাজ আর আধেয় মানুষ, প্রকৃতি ও তাদের মিথস্ক্রিয়াজাত সৃষ্টি রাশি । এই দৃষ্টিকোণ থেকে উন্নয়ন অধ্যয়নের অর্থ সামাজিক সম্পর্কের উৎপত্তি ও রূপান্তর তথা স্থানীয় ও বিশ্ব পরিসরে বস্তুগত ও মতাদর্শগত সম্পর্কাদি, ঐ সংশ্লিষ্ট উৎপাদনী শক্তি ও প্রকৃতির সাথে মিথস্ক্রিয়াজাত ফলাফলের অধ্যয়ন । এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আজকের সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যকার দ্বন্দ্ব, যার উদ্ভব ঘটেছে সামাজিকৃত উৎপাদন ও ব্যক্তিকীকৃত মুনাফাভিত্তিক বুর্জোয়া ব্যবস্থার দৃষ্টান্তে । এই বৈরগ্রস্ত সম্পর্কের অবসান ঘটিয়েই যে কেবল সমাজ ও প্রকৃতির মধ্যকার বর্তমান দ্বন্দ্বের মীমাংসা সম্ভব– মার্কসবাদী সমাজবিজ্ঞানের এটা মৌলিক শিক্ষা । অন্তত পরিবেশের প্রশ্নে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের সিদ্ধান্তও তাই । (হাসানুজ্জামান, ২০০৪, ২১৮-১৯) পরিবেশ সংকটের সমাধান কল্পে, এবং মানুষের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে, পুঁজিবাদের বদলে এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার যার অর্থনীতি ব্যক্তিগত মুনাফা বৃদ্ধি ও ক্রমবর্ধমান পুঁজি সঞ্চয়ের বদলে, মানুষের সত্যিকারের প্রয়োজন মেটানো ও পরিবেশকে সুস্থ করে তোলার লক্ষ্যের প্রতি দায়বদ্ধ ।

এক কথায় এই হল আজ বিপ্লবী পরিবর্তনের অর্থ । এর চেয়ে কম সংস্কারকের কাজ, যতই তা কাঙ্ক্ষিত মনে হোক না কেন বড়জোর অবনতি ও বিলোপ সাধনের প্রক্রিয়াকে, যা বহুদূর এগিয়ে গেছে, কিছুটা ধীরগতি করে তুলতে পারে । মানুষ ও প্রকৃতি যার কাছে এক ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের উপায়মাত্র, সেই পুঁজিবাদকে তার অন্তর্লীন দৃষ্টিভঙ্গিসমেত উপড়ে ফেলতে হবে । এবং তার বদলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সমাজতন্ত্র । (সুইজি, ২০০৮, ১৫৮)

সংযুক্তি - ১

মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধ সম্ভব কিনা

এই প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতিরেকে যাবতীয় আলোচনা সহ ইতোমধ্যে যে টন টন লেখা ও বিভিন্ন পর্যায়ে যেসব সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়েছে এবং যা কিছুটা 'সাময়িক প্রলেপ'-এর সীমা অতিক্রম করবে না তাতে আমরাও যোগ করব (এঙ্গেলস বর্ণিত 'জ্ঞান ছাড়া আরও কিছুর প্রয়োজন' বাদে) কিছু পাণ্ডিত্য– এখন নিজ দেশের ক্ষয়ক্ষতির বিষয়াবলি শনাক্ত করা ও কিছুটা হলেও প্রতিরোধ করার চেষ্টা ছাড়া সাধারণভাবে 'কৌশলী বা সাধারণ অর্থে ভালোমানুষী প্রত্যয়াধীন' থাকাওয়ালাদের আর কিছু করার নেই, যুক্তি হল; 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা', তবে এদের অনেকেরই দেখি 'প্রকল্প', 'ডলার' ও বিদেশ গমন-এ চোখ কান বেশ ভালোই খোলা থাকে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি সরাসরি উদাহরণ দিচ্ছি; ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত কয়লাখনির বিরুদ্ধে যে বিশাল গণপ্রতিরোধের সৃষ্টি হয় এবং পরিণামে ২৬ আগস্ট ২০০৬ কয়েকজনের প্রাণ দিতে হল, অনেকেই আহত হলেন এবং সরকার বাধ্য হল চুক্তিবদ্ধ হতে। এই চুক্তি এখন ভংগ করা হয়েছে। আন্দোলন সংগ্রাম এখনো চলছে– চলবে। জানি না আরও প্রাণ দিতে হবে কিনা। সম্ভাব্য পরিবেশ ধ্বংসের এতবড় নমুনা বাংলাদেশে নেই। অথচ পরিবেশ-বিলাসী পণ্ডিত, এনজিও ও সিভিল সোসাইটির মাতব্বরদের অদ্যাবধি ফুলবাড়ী কয়লাখনি আন্দোলনে দেখা যায়নি। পরিবেশ বিষয়ে কত গণ্ডা সেমিনার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে হল তাতে বাংলাদেশের জনগণের কিই-বা আসে যায়। সোজা কথা হল অন্তত কার্বন এমিশন বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। জলবায়ুর যে পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে ও হবে, তা কখনই অর্থবহভাবে রোধ করা যাবে না। আমেরিকার নেতৃত্বে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর সাথে যোগ হয়েছে চীন-ভারতসহ আরো কয়েকটি অতি উন্নয়নশীল দেশ। এরাই 'ক্ষতিপূরণ তত্ত্ব' এখন বেশি বেশি চালু করবে। ফলে এই সব দেশে শোষক ও শাসকশ্রেণী এই প্রশ্নেও বাংলাদেশের শত্রুশিবিরে পড়ে গিয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানের যে পরিমাণ কয়লা মজুদ আছে তাতে আগামী দু'শ বছর প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ তারা কয়লা থেকেই উৎপাদন করতে পারবে। তার পরও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ঘোষণা করেছে ভারত– যা সন্দেহজনক। শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যই যে এই চুক্তি হয়নি তা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার। ফলে, তেল, গ্যাস, কয়লা-র ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। এবং ব্যবহার বেড়েই চলবে। এখন 'সান্ত্বনা বিজ্ঞান' নিয়ে বেশ কৌতুক শুনি– 'আরে বিজ্ঞানের হিসেবে হাইড্রোকার্বন বড়জোর পঞ্চাশ বছর' এরপর তো মজুদ শেষ। যে হারে 'তাপ' বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতি সর্বশক্তি নিয়ে বিক্ষুব্ধ– তাতে ২০৩০-৪০ সাল নাগাদ তো ধরিত্রীর চেহারাই অনেক ক্ষেত্রেই পাল্টে যাবে– আর ইতোমধ্যে মানুষসহ অন্যান্য জীববৈচিত্র্য ও উদ্ভিদবৈচিত্র্য কী পরিমাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার একটা গড় হিসাব অনুমানে বলা হচ্ছে।

যে কথাটি মোটেও ধামাচাপা নেই এবং যা এই নিবন্ধে আগেও বলা হয়েছে তা হল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থা নিজ থেকে কখনোই প্রাণ-প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ বন্ধ করতে পারে না,– কখনো পারেনি,– কোনো অবস্থাতেই পারবে না। এই বিশ্ব জীব ও উদ্ভিদশূন্য না হওয়া পর্যন্ত যদি পুঁজিবাদ টিকে থাকবার মতো বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও দেখে তবুও সে পুঁজিবাদ হিসেবেই বেঁচে থাকতে চাইবে। এ হল ব্যক্তি গোষ্ঠি বা শ্রেণীর ইচ্ছানিরপেক্ষ প্রক্রিয়া। যারা বিশ্বপুঁজিবাদের বিরোধী তারাই যদি সক্ষম হন তবে তাদের সামনে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো ধরনের 'বিকল্প' প্রস্তাব– প্রমাণিত হয়েছে পুঁজিবাদকেই উৎসাহ যোগায়।

সংযুক্তি-২

বাংলাদেশ

নিবন্ধটির সীমাবদ্ধতার কথা প্রথমে উল্লেখ করেছি। তাছাড়া ধরেই নেয়া হয়েছে বাংলাদেশ নিয়ে প্রচুর আলোচনা এই বিশেষ সংখ্যাটিতে হবে। যা হোক, এখানে অল্প দু'একটি বিষয়ের ওপর সামান্য আলোকপাত করা হলো। দু'দশক আগে থেকেই এটা জানা গিয়েছিল জলবায়ুর যেসব পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে সেগুলোর সবচেয়ে লক্ষ্যগোচর কোনো কোনো প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সমুদ্রের তটরেখা বরাবরই ঘটবে। মালদ্বীপ বাদ দিয়ে দেখা গিয়েছিল মিশর ও বাংলাদেশের মতো তথাকথিত উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিচের সারিতে থাকা দেশে, যেখানে নদীগুলো আকারে বড়, বদ্বীপগুলো বিস্তীর্ণ ও ঘনবসতিপূর্ণ সেই দেশে অর্থাৎ ধরে নিতে হবে বাংলাদেশ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জলবায়ু-উদ্বাস্তু হবে, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি পাবে, লবণাক্ততা গ্রাস করবে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের বিরাট জায়গা, উপকূলের কৃষি ধরন বদলে যাবে, নারীদের ওপর স্বতন্ত্র ক্ষতিকর প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, আবহাওয়া চরম রূপ ধারণ করবে, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঋতুবৈচিত্র্য বদলে যাবে, জলাবদ্ধতা দেখা দেবে, আবাদি জমির পরিমাণ কমে যাবে, নদী মরে যেতে থাকবে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আরও যেদিকগুলো ক্ষতিয়ে দেখা দরকার তা হল: নিয়ন্ত্রনবিহীন আমদানি করা পুরনো জাহাজকাটা, অরণ্য ধ্বংস, অরণ্যের পরিবর্তে মনো অরণ্য বা নির্দিষ্ট গাছের কারখানা, চিংড়ি চাষের জন্য লবণাক্ত পানি আটকে রাখা, অপরিকল্পিত নগরায়ন, যত্রতত্র একেবারেই নৈরাজ্যিক কায়দায় দালান-কোঠা নির্মাণ, পুকুর ও প্রাকৃতিক জলাশয় ভরাট করা, নদী দখল করা, পানিদূষণ বৃদ্ধি করে চলা, উন্নয়নের নামে একদিকে অপ্রয়োজনীয় রাস্তা ও সেতু নির্মাণ অন্য দিকে রেল যোগাযোগ ধ্বংস করা (ফলে প্রচুর আবাদি জমি রাস্তায় গিলে খাচ্ছে ও হাজার হাজার সেতু নির্মাণে পানির গতিপথ রুদ্ধ হয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে নতুবা জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করছে), অনেকটা জোর পূর্বক আবাসিক এলাকা সৃষ্টি করার নামে আবাদি জমি দখল ও বালু ভরাট, উচ্চ ফলনশীল থেকে হাইব্রিড এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ মারফত কৃষিজমির চরিত্র

বদলে দেয়া, অর্থকরী ফসল উৎপাদনের নামে জমি ও ফসল-উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় নৈরাজ্য সৃষ্টি করা, কৃষিতে বহুজাতিক কোম্পানির আগ্রাসন, ব্যক্তিগত খাতে পানিব্যবসা, হালকা কোমলপানীয় তৈরির জন্য বহুজাতিক কোম্পানিকে বিনামূল্যে সুপেয় পানি প্রদান, রাসায়নিক দূষণ বৃদ্ধি পেতে থাকা, মোটরযানের আশংকাজনকভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি ।

বর্ণিত যে-সব ভয়ংকর বিবরণ দেয়া হল তার সবটা কার্বন নির্গমনজনিত কারণে হচ্ছে তা মোটেও বলা যাবে না । অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন কয়েকটি রাজনৈতিক দল, আমলা, রক্ষাবাহিনী, ব্যবসায়ী, কনস্যালট্যান্ট, এনজিও– এর সাথে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত-চীন সকলেরই বাপ-দাদার খাস তালুকে পরিণত হয়েছে । অবাধ লুণ্ঠনের এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হওয়ার কারণেও জলবায়ু দূষিত হচ্ছে । বাংলাদেশের জ্বালানিসম্পদসহ প্রায় সকল জাতীয় সম্পদের ওপর বহুজাতিক কোম্পানি, বিশ্বব্যাংক, ডব্লিউটিও, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, এডিবিসহ কয়েকটি দেশের সরাসরি খবরদারি জারি আছে– নেতা, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সহ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো ও আঞ্চলিক দেওয়ান ভারত । সুতরাং বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থের বিষয়টি শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে । জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যারা সরাসরি অভিযুক্ত তাদেরকে সর্বদা আপ্যায়ন করা হয় 'দাতা হিসেবে' । বাংলাদেশের ওপর, জমি ও পানিসহ সমস্ত জাতীয় সম্পদের ওপর বাংলাদেশের জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যাবে আমরা দ্রুততার সাথেই ভয়ংকর এক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি । পরিবেশতাত্ত্বিক পুঁজিবাদ ও ধারণযোগ্য পুঁজিবাদ যা পরিবেশের প্রশ্নে ব্যবহার করতে যেয়ে চালু করা নামকরণ হয়েছে পরিবেশতাত্ত্বিক উন্নয়ন ও ধারণযোগ্য উন্নয়ন যা 'বাংলাদেশের উন্নয়ন' কর্মকাণ্ডের এলাকায় (এনজিও খাতসহ) কর্মরত কর্তা-কর্মীদের কাছে ভালোই গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে । টেকসই উন্নয়ন করতে গেলে তা পরিবেশবান্ধব হওয়াই ভালো– এই ধরনের কথাবার্তায় দেশের কর্তাব্যক্তিরা বেশ আমোদ অনুভব করেন । তারা যে ধাপ্পা দিচ্ছেন এটা যে খুব অজানা তা নয় কিন্তু তাদের দিকটাও তো ভেবে দেখতে হবে– তাদের অবস্থান থেকে তারা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন যদিও প্রধান ধনী দেশগুলোই জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তবুও তারই হচ্ছে বাংলাদেশের 'উন্নয়ন সহযোগী' এবং এদের সাথে যোগ হয়েছে বাংলাদেশের কথিত বন্ধু চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিলসহ আরো কয়েকটি দেশ । বন্ধুদেশ ও উন্নয়নসহযোগীদের প্রতি অনুগত থাকলে অবশ্যই একটা দায় এসে পড়ে । উন্নয়নসহযোগী বা দাতা দেশগুলোর মান-সম্মান রক্ষা করেই বাংলাদেশে জলবায়ুর পরিবর্তনের যে ভয়াবহ প্রভাব সে-সম্পর্কে আদব-কায়দার সাথে বাংলাদেশের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে বার বার বিদেশ গমন করে ডায়ালগ করা । এরকম একটা পরিস্থিতিতেই দেখছি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশকে দেয়া হয়েছে ১২০০ কোটি টাকা । দিয়েছে বহুপক্ষীয় দাতাগণ । ফান্ডের নামকরণ করা হয়েছে 'মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড'– এম ডি টি এফ এবং তহবিলের নামকরণ করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের

ঝুঁকিমোকাবেলা তহবিল বা বি সি সি আর এফ। এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী দেশগুলো চালু করেছে, ক. জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো (ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যাডাপটেশন), খ. জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন (ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন), গ. জলবায়ু বিষয়ক গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, ঘ. পরিবেশবান্ধব ব্যবসায়িক উদ্যোগ (গ্রিন বিজনেস এন্ট্রাপ্রেনিউরশি্পস)।

সংযুক্তি - ৩

ফেয়ারওয়েল টু আর্থ: একটি কাল্পনিক প্রকল্প

স্মরণ করছি এঙ্গেলস-এর 'প্রকৃতির দ্বান্দ্বিকতার ভূমিকা'র শেষ কয়েকটি লাইনের। (চিরন্তনভাবে গতিশীল পদার্থ সম্পর্কে)– 'এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত যে, এই সমগ্র রূপান্তরের মধ্যে পদার্থ চিরকালই একই রকম থেকে যায়, তার কোনো ধর্মই কোনোদিন নষ্ট হতে পারে না, এবং সেই জন্যই যে অমোঘ আবশ্যিকতায় তা এই পৃথিবীতে চিন্তাশীল মনরূপ তার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করবে, ঠিক সেই একই আবশ্যিকতায় তা অন্য কোনো স্থানে, অন্য কোনো কালে অবশ্যই তার উদ্ভব ঘটাবে।' (এঙ্গেলস, ২:১, ৭৫) বেশ, তবে তাই হোক, যখন কোনো সম্ভাবনা নেই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরূদ্ধে পৃথিবীর কোথাও কোথাও ছোটখাট প্রতিরোধ থেকে শুরু করে জীবন-মরণ সশস্ত্র প্রতিরোধ চলতে থাকা ও তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অন্তত দুই-তিন দশকের মধ্যে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শ্রেণী ও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার এবং ইতোমধ্যেই যখন প্রতিটি মুহূর্তেই ধ্বংস হতে থাকবে মানবপ্রজাতিসহ লক্ষ লক্ষ জীবপ্রজাতি, ধ্বংস হতে থাকবে বিশাল উদ্ভিদজগৎ, অরণ্য, নদী, পাহাড়, সমুদ্র– অর্থাৎ প্রতিটি মুহূর্তেই এই পৃথিবী– এই আমাদের প্রাণপ্রিয় ধরিত্রী যার বাসিন্দা মানবপ্রজাতি এককভাবে নয়; মালিক তো নয়ই– তখন, অন্যান্য জীব, উদ্ভিদ, মাটি, জলবায়ু ইত্যাদি– এদের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে মানবপ্রজাতিরই কোনো এক অংশকে (এটা ঠিক বিক্ষুব্ধ প্রকৃতি যেভাবে ফুঁসে উঠেছে তাতে করে এটা ভাববার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, মরণ-আঘাত সে হানবে চিন্তাশীল মনরূপ প্রাণী ও তাদের যাবতীয় সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে)। দাবি মাত্র একটি : মানবপ্রজাতি 'হে পৃথিবী বিদায়' বলে মহাপ্রস্থান করুক– হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ অন্য প্রাণ-প্রজাতি জেগে উঠুক, পাখিরা গান করুক, জমি, জল, বায়ু, অরণ্য, নদী, পাহাড়, সমুদ্র– সব একত্রে আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠুক।

আর অবিনশ্বর পদার্থ তার আবশ্যিকতায় অন্য কোনোখানে যদি চিন্তাশীল মনরূপ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে নতুন করে সৃষ্টি করতে চায় তো করুকগে – তা হবে এই ধরিত্রীর জন্য তাৎপর্যহীন।

তবে যদি পুনর্বার এই পৃথিবীতে এই মানবপ্রজাতির আগমন ঘটে, হতে পারে কোনো এক কালে তারা আজকের ভাষায় প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযানে বা আমাদের কাছে অজানা নতুন কোনো প্রযুক্তি প্রয়োগে জানতে পারবে আপাত দেখতে শান্ত (প্রেমের কবিতা লেখে, অপূর্ব ছবি আঁকে, বিখ্যাত সব কাব্যসহ সৃষ্টি করেছে কয়েকটি অসাধারণ মহাকাব্য, গড়েছে তাজমহল, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়েছিল কোটি কোটি মানবপ্রজাতি তাদেরই এক ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে ইত্যাদি ইত্যাদি), একেবারেই মাত্র কয়েক ফুটের প্রাণী যারা জল-বায়ু ছাড়া একমুহূর্ত বাঁচতে পারত না– তারা ছিল প্রাণীজগতের মধ্যে সব থেকে হিংস্র, বর্বর, নিষ্ঠুর ও অতীব আশ্চর্যের ব্যাপার তাদেরই একটি ক্ষুদ্র অংশ লোভ ও মুনাফার জন্য জলবায়ুর নির্মম পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। আগত কোটি কোটি আলোকবর্ষের মধ্যে এমন প্রজাতির আবির্ভাব না হওয়া ভালো যারা ক্ষুধা তৈরি করে, রোগ তৈরি করে, বিকৃত ভোগ তৈরি করে, নিজ প্রজাতির বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠদের অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে, যুদ্ধ তৈরি করে, ঠাণ্ডা মাথায় দু'দুটো আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করে ফেলে মানুষের দু'টি শহরকে, মজুদ রাখে এত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক মারণাস্ত্র যা দিয়ে এই পৃথিবীকে কয়েকবার ধ্বংস করে ফেলা যায়, নিজ প্রজাতিকে ভীষণ ভীষণ কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায় ও চরম নিষ্ঠুরতার সাথে হত্যা করে এমনকি হত্যা করে বহু বছরের পরীক্ষিত বন্ধুকে– মাতা-পিতাকেও।

গ্রন্থনির্দেশ

১. মার্কস, পুঁজি, খণ্ড-১, অংশ-১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮;
২. মার্কস, পুঁজি, খণ্ড-১, অংশ-২;
৩. মার্কস, ক্যাপিটাল, দ্বিতীয় খণ্ড (৬ খণ্ড) সম্পাদনা, আখতার হোসেন, অনুবাদ-পীযূষ দাস গুপ্ত, বাণী প্রকাশ, ২০০৯, কলকাতা;
৪. এঙ্গেলস, মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন (৪ খণ্ড), দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭২;

৫. এঙ্গেলস, মার্কস-এঙ্গেলস রচনা সংকলন, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ;
৬. পল সুইজি, বিশ্বায়ন নতুন কিছু নয়– নির্বাচিত প্রবন্ধ, শ্রাবণ, সম্পাদনা, ফারুক চৌধুরী,
ঢাকা, ২০০৮;
৭. সম্পাদনা মোহিত রায়, প্রসঙ্গ : পরিবেশ, অনুষ্টুপ, ১৯৯৮ কলকাতা;
৮. শেরিল সাইমন সিলভার ও রুথ এস ডেফ্রিস, পরিবর্তনশীল পরিবেশ ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ, অনুবাদ -আফতাব হোসেন, বাংলা একাডেমী; ঢাকা, ১৯৯২;
৯. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, অনুবাদ ও ভূমিকা; পরিবেশ ও পুঁজিবাদ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন,
ঢাকা, ২০০৪ ।

মে ২০১০

[লেখক: বামপন্থী রাজনীতিক ও চিন্তক । আহবায়ক, সমুদ্র সীমা নির্ধারণ ও সমুদ্র সম্পদ রক্ষা জাতীয় কমিটি ।]

জলবায়ু পরিবর্তন: ঝুঁকি এবং ভাঁওতা

ম. ইনামুল হক

ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ । এর অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে ৮৮° থেকে ৯৩° পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২০° থেকে ২৭° ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশের ভেতরে । এর পূর্ব, উত্তর এবং পশ্চিমে ভারত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার । হিমালয় পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ দুটি নদী গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি চীন, নেপাল, ভুটান ও ভারতের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের উপর

দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে এবং অজস্র নদীনালার বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন বরাক নদীর পানিও মায়ানমার, ভারত হয়ে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পতিত হয়। বাংলাদেশের বড় বড় নদী যথা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক ছাড়াও এদের অববাহিকার অনেক ছোট বড় উপনদীর পানি দেশের বাইরে ভারত, নেপাল, চীন, মায়ানমার ও ভুটান থেকে উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে সাগরে গিয়ে পড়েছে।

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে গড় বৃষ্টিপাতের হার বছরে ২৩০০ মিলিমিটার। তবে বর্ষা ও শরৎকালে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এই বৃষ্টিপাতের হার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বছরে প্রায় ৫৫০০ মিলিমিটার, পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ১৪০০ মিলিমিটার। এই বৃষ্টিপাত ছাড়াও দেশের বাইরে নদীগুলোর অববাহিকার প্রায় ১৫ গুণ এলাকা থেকে আসে প্রচুর জলসম্পদ। বাংলার সমতলের এই নদীগুলো দেশের বাইরে থেকে জল নিষ্কাশন করে নিয়ে আসার সময় নিয়ে আসে প্রচুর পরিমাণে পলি। এই পলির পরিমাণ বছরে প্রায় ১৪০০ মিলিয়ন টন যার কিছুটা ভূমিতে এবং অনেকটাই সাগরে গিয়ে পড়ে। হাজার হাজার বছর ধরে পড়া এই পলির মাধ্যমেই বাংলাদেশের দক্ষিণে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর মোহনার উপকূলীয় অঞ্চলে দ্বীপগুলো জেগে উঠছে।

দেশের বাইরে থেকে আসা জলসম্পদ এবং দেশের ভেতরের বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে পুকুর, বিল, হাওর এবং বাওড়ের বিস্তীর্ণ জলাভূমি অঞ্চল। সারাবছর এই অঞ্চলগুলো পানিতে ডুবে থাকে এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়াও রয়েছে বড় নদীগুলোর নির্দিষ্ট প্লাবনভূমি যা বর্ষা ও শরৎকালে পানিতে ডুবে যায়। এসবের মোট পরিমাণ প্রায় ৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট এলাকার (১,৪৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার) প্রায় ৩০%। গ্রীষ্মকালে বন্যা হলে হাওরে ফসলের ক্ষতি হয়, কিন্তু ঐসকল এলাকা বর্ষাকালে ডুবে গেলে তাকে বন্যা বলা হয় না। তবে সম্প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং নিম্নভূমির বিস্তীর্ণ এলাকা লোনা পানিতে ডুবে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন

'জলবায়ু পরিবর্তন' বলতে ভূপৃষ্ঠের কোনো এলাকায় গড় আবহাওয়ার দীর্ঘ মেয়াদে পরিবর্তন বোঝায়। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত এবং বায়ুপ্রবাহ আবহাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। 'জলবায়ু পরিবর্তন' সাধিত হয় দু'টি প্রক্রিয়ায়–

১। ওজোন স্তরের হ্রাস: এই স্তর পৃথিবীর ৯০% ওজনের আধার যা ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার উর্ধ্বে অবস্থান করে। এর ঘনত্ব ১২ অনু/মিলিয়ন বায়ুঅনু। এর প্রধান কাজ মানুষ ও জীবের প্রতি ক্ষতিকারক সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেয়া এবং বায়ুর দূষণ দূর করা। বায়ুদূষণ মানুষের কাজ যা জীবাশ্মজ্বালানি অর্থাৎ কাঠ, কয়লা,

তেল, গ্যাস পোড়ানোর ফলে হয়। মূলত অতি মাত্রার ক্লোরোফ্লোরোকার্বন দূষণ মোকাবিলায় আকাশের ওজোন স্তর হ্রাস পাচ্ছে।

২। বৈশ্বিক উষ্ণতা: সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ বায়ুতে মিশে তাপ বিকিরণে তারতম্য ঘটাচ্ছে ও বায়ুর উষ্ণতা বাড়াচ্ছে। ঐ গবেষণায় জানা যায়, গ্রিনহাউজ প্রতিফল বায়ুতে তাপ আটকায় যার ফলে বায়ুর তাপমাত্রা বেড়ে যায়। গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট হতে পারে যারা বিশেষ তরঙ্গদৈর্ঘের তাপ শোষণ অথবা নিঃসরণ করে। এর প্রতিফলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে উচ্চতর তাপমাত্রার প্রকোষ্ঠ সৃষ্টি হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রধান গ্রিনহাউজ গ্যাসসমূহ হচ্ছে, জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ওজন এবং ক্লোরোফ্লোরোকার্বন। বর্তমান যুগে বৈশ্বিক উষ্ণতার জন্যে ১৯৫০ সাল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর বেড়ে যাওয়াকে প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিশ্বের 'উন্নত' দেশসমূহের নাগরিকরা নিজেদের ভোগের জন্য অতিমাত্রায় জীবাশ্মজ্বালানি পুড়িয়ে (কার্বন নির্গমন) ভূপৃষ্ঠে বায়ুর উষ্ণতা বাড়িয়ে দিতে থাকে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে মেরু অঞ্চল ও পর্বতচূড়াসমূহের বরফ ক্রমশ গলে সংকুচিত হতে শুরু করে এবং গলিত পানি সমুদ্রে জমা হয়ে গড় সমুদ্রতল বেড়ে যেতে শুরু করে। আইপিসিসি প্রতিবেদনে জানা যায়, বিশ্বে শিল্পায়নের পূর্বে যেখানে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর পরিমাণ ছিল ২৮০ পিপিএম যেখানে ২০০৫ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩৮০ পিপিএম-তে। একবিংশ শতাব্দীতেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকায় সমুদ্র-তটবর্তী দেশসমূহ এবং সমুদ্রতলের উচ্চতার কাছাকাছি দ্বীপসমূহ অচিরেই বর্ধিত সাগরতলের নিচে ডুবে যাবার হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বিগত বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রতল ১.৮ মিমি প্রতিবছর হারে বেড়েছে। এবং এই হার বাড়ছে তো বাড়ছেই। হিসেব মতে ১৯৯৩-২০০০ সালে এই হার ছিল ৩.১ মিমি প্রতিবছর। একবিংশ শতাব্দীতে বৈশ্বিক উষ্ণতার হারও বাড়বে ধারণা করা হচ্ছে।

কিয়োটো প্রটোকল

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ১১ ডিসেম্বর ১৯৯৭ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ রোধের উদ্দেশে কিয়োটো প্রটোকল গ্রহণ করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ থেকে এটি বলবৎ হয়। নভেম্বর ২০০৯-এর মধ্যে ১৮৭টি দেশ এটি স্বাক্ষর ও গ্রহণ করেছে। এই প্রটোকল অনুযায়ী ৩৭টি শিল্পায়িত দেশ তাদের গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমন ১৯৯০-এর মাত্রা থেকে ৫.২% কমিয়ে আনবে। তবে এই পরিমাণ কমিয়ে আনা জলবায়ু পরিবর্তনে বিশেষ কোনোই তারতম্য ঘটাবে না। আইপিসিসির (Intergovernmental Panel on Climate Change) মতে

২০৮০ সাল নাগাদ নিম্ন নির্গমনের হারে সমুদ্রতল ৯ থেকে ৪৮ সেন্টিমিটার এবং উচ্চ নির্গমনের হারে সমুদ্রতল ১৬ থেকে ৬৯ সেন্টিমিটার বাড়বে।

কোপেনহেগেন সম্মেলন

ইউরোপের কোপেনহেগেনে ৭ থেকে ১৯ ডিসেম্বর ২০০৯ বিশ্বের ১৯২ টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হল। অনেক আগ্রহ নিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ এর দিকে লক্ষ রাখছিল, কারণ এই সম্মেলনের অগ্রগতির উপর নির্ভর করছিল ভূপৃষ্ঠের মানুষের আগামী প্রজন্মের জীবন; যখন সাগরতলের কাছাকাছি অনেক ছোট ছোট দেশ হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সবুজ শ্যামল শস্যভরা জমি বাড়তি সাগরের লোনাজলে তলিয়ে যাবে। কিন্তু এই সম্মেলনে বাগাড়ম্বরতা ছাড়া আর কিছুই হয়নি। শেষমেষ চুক্তিতে শুধুই গালভরা কথা বলা হয়েছে অথচ দেয়া প্রতিশ্রুতিগুলো পালিত হবার কোনোই নিশ্চয়তা তৈরি হয়নি। উল্লেখ্য যে, বিশ্বের উন্নত তথা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে ঐ সকল ধনী দেশসমূহ যারা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রধানত দায়ী। ২০০৬ সালের নির্গমনের হিসাবমতে (উইকিপিডিয়া) ঐ সকল দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ১৮.৬৭, কানাডা ১৭.৪৪, অস্ট্রেলিয়া ১৮.৭৪, রাশিয়া ১১.০৩, জাপান ১০.১৪, বৃটেন ৯.৪, জার্মানি ৯.৮২, নেদারল্যান্ড ৯.৭, ইতালি ৮.১, ফ্রান্স ৬.২ টন/ব্যক্তি/বছর বায়ু উষ্ণতাকারী কার্বন নির্গমন করে, যেখানে ভারত ও বাংলাদেশের পরিমাণ ১.৩ ও ০.২৫ টন/ব্যক্তি/বছর। তবে কার্বন নির্গমনের ক্ষেত্রে চীন একটি দেশ হিসেবে সবার শীর্ষে বসে বিশ্বের মোট নির্গমনের ২১.৫% একাই নির্গমন করছে। এরপর রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ২০.২% এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ১৩.৮%।

কোপেনহেগেন জলবায়ু সম্মেলনে সারা পৃথিবীর পরিবেশবাদীদের সমাবেশ ঘটলেও তারা মানুষের স্বভাব পরিবর্তনের ব্যাপারে কোনো আবেদন জানায়নি। এখনও ব্যক্তিপ্রতি জ্বালানি ব্যবহারের হার একটি দেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হয়ে রয়েছে। পারস্য উপসাগরের দেশগুলো যথা, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত ৪০ টন/ব্যক্তি/বছর হিসেবে কার্বন নির্গমন করে। এভাবে তারাই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণকারী দেশ, যদিও বৈশ্বিক উষ্ণতায় তাদের যোগান অনেক কম। কার্বন নির্গমন তথা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি তথা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে দায়ী দেশগুলো বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেবার পরিবর্তে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ঋণ দিতে চায়। এজন্য কোপেনহেগেন সম্মেলনে যে চুক্তি হল তাতে ২০১০-১২ সাল নাগাদ ৩০ বিলিয়ন ডলার এবং ২০২০ সাল নাগাদ ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থ যোগান সৃষ্টি করে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সইয়ে নেবার (অফধঢ়ঃধঃরড়হ) ব্যবস্থা করা হয়েছে। চুক্তিতে বলা হয়েছে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আগামী দীর্ঘমেয়াদী সময়ের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি যাতে না বাড়ে সে ব্যাপারে একমত হয়ে ২০১৫ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো শেষ করবে। কিন্তু এই লক্ষ্যমাত্রা যথেষ্ট নয়। বিজ্ঞানীদের

মতে এই ধরনের লক্ষ্যমাত্রায় সমুদ্রতল বাড়ার যে প্রবণতা তা কোনোক্রমেই ঠেকানো যাবে না।

বাংলাদেশের উপকূল

বাংলাদেশের উপকূলভূমি এবং মোহনা এলাকা উজান থেকে বয়ে আসা পলি দিয়ে গঠিত। সাগরতটের কাছাকাছি এই পলির স্তরের গভীরতা প্রায় ২০ কিলোমিটার যা বছরে ৩ মিমি হারে ডেবে যাচ্ছে। কিন্তু উজান থেকে বিপুল পরিমাণ পলি এসে তা পুষিয়ে দিয়ে বরং সাগরের ভেতরে নতুন নতুন চর জেগে উঠছে। এসব উপকূলীয় এলাকা ও দ্বীপসমূহের উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ১ থেকে ২ মিটার। তাই আইপিসিসি প্রতিবেদন অনুযায়ী সমুদ্রতল বেড়ে যাওয়ার কারণে আগামী ২১০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের ২০ শতাংশ জমি সাগরে তলিয়ে যাবে এবং ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের উপকূলবর্তী খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী এলাকার ১.৫ কোটি মানুষ জলবায়ুজনিত কারণে উদ্বাস্তু হয়ে যাবে।

বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল বর্ষার শুরু ও শেষে প্রায়ই সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের কোপানলে পড়ে। বাংলাদেশের যশোর, খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে উজান থেকে বন্যার পানির সাথে আসা পলির যোগান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু এলাকা ক্রমশ দেবে গিয়ে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করেছে। এসব এলাকায় সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কিছু আলামত আমরা ইতোমধ্যে আইলা ঘূর্ণিঝড়ে দেখতে পেয়েছি। এখনও খুলনা-সাতক্ষীরার হাজার হাজার মানুষ তাদের ঘরবাড়ি জায়গা-জমি সাগরের লোনা পানির তলায় হারিয়ে বাঁধের ওপর বা রাস্তায় অনাহারে দিনাতিপাত করছে। এদের অনেকেই জলবায়ু-উদ্বাস্তু (Climate Refugee) হয়ে শহরাঞ্চলে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে।

জলবায়ু অপরাধ

বিশ্বের তথাকথিত উন্নত তথা শিল্পোন্নত দেশগুলো তাদের অপকর্মের জন্য বাংলাদেশের মতো দুর্বল দেশগুলোর জনগণকে সাহায্যের নামে উপদ্রুত এলাকায় আটকে রেখে জলবায়ু-বস্তি (Climate Ghetto) তৈরি করতে চায়। তাদের প্রস্তাবিত প্রকল্পের মধ্যে আছে, বাঁধ উঁচু করে বন্যা প্রতিরোধ করা, বন্যার সময় আশ্রয়স্থল নির্মাণ করা ইত্যাদি। এইসব প্রস্তাবে উপকূল অঞ্চলে জলবায়ু-বস্তি তৈরি করবে যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ খাদ্য, পানি, কাজ ও আশ্রয়ের অভাবে গাদাগাদি করে মানবেতর জীবন যাপন করবে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর এই অন্যায় প্রস্তাব বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কার্বন নির্গমনকারী শিল্পোন্নত দেশগুলো আরও একটি কথা বলে; তারা বায়ু দূষণকারী জীবাশ্মজ্বালানি পোড়ানো কমিয়ে জীব-জ্বালানি (Bio-Fuel) ব্যবহার করতে চায় যা বায়ুর কার্বনচক্রের অন্তর্ভুক্ত বিধায় দূষণ বাড়ায় না। জীব-জ্বালানি বলতে প্রাণী এবং গাছপালা থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি বোঝায়। এসব জ্বালানির

মধ্যে আছে আখ, ভুট্টা ইত্যাদি শর্করাজাতীয় শস্য বা কৃষি-জ্বালানি (Agro-Fuel) যা দিয়ে গাড়িতে তেল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ইথানল (ইথাইল এলকোহল) প্রস্তুত করা যায় এবং ভেরেন্ডা ধরনের ফল যা দিয়ে ডিজেল তেল (Bio-Diesel) উৎপাদন করা যায়। শিল্পোন্নত দেশগুলোর এই ধরনের চাতুর্যপূর্ণ সমাধান বাংলাদেশের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এর ফলে বিশ্বে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাবে এবং জনবহুল দেশগুলোতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেবে। কিন্তু মার্কিন নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইতোমধ্যে বিশ্বের বহু স্থানে এই ধরনের চাষ শুরু করেছে যার ফলে ২০০৮ সালে বিশ্বে খাদ্যশস্যের দাম অস্থিতিশীল হয়ে দু'তিনগুণ বেড়ে যায়।

আমরা কার্বন নির্গমন/বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি/জলবায়ু পরিবর্তন/সমুদ্রতলের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্যে বাংলাদেশের ১.৫ কোটি সম্ভাব্য জলবায়ু-উদ্বাস্তু মানুষদের জায়গা দেয়ার জন্যে দায়ী দেশগুলোর (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র) বিস্তীর্ণ জনশূন্য এলাকায় বসতি স্থাপনের সুযোগ (Right to Migration) দাবি করছি। আমরা বলছি, উন্নয়নের নামে ঋণ নয়, জলবায়ু-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন করা এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ক্ষতি হিসেব করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা জলবায়ু-অপরাধের জন্য দায়ী দেশগুলোকে সালিশের মাধ্যমে (International Court on Climate Offence) ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

[লেখক: প্রবন্ধকার/ নিবন্ধকার। চেয়ারম্যান, দেশপ্রেমিক জনগণের মঞ্চ। পেশায় প্রকৌশলী।]

জলবায়ু, পুঁজিবাদ: প্রকৃতি ও মানুষের মুক্তির শর্ত একাকার

ফা রু ক ও য়া সি ফ

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার খোলপেটুয়া নদীপাড়ের আশাশুনি উপজেলা। কৃষক আফরোজের ঘুম সেদিন আগেই ভেঙে যায়। প্রতিবেশীদের সাড়াশব্দে ঘুম ভেঙে দেখেন পাউবো'র বাঁধ ভেঙে গ্রামে পানি ঢুকে পড়েছে। তলিয়ে গেছে ফসলের জমি,

চিংড়ি-ঘের ও বসতভিটা। জোয়ারের পানিতে থইথই করছে ঘর। এমনটা তার জীবনে এই প্রথম। পদ্মপুকুর ইউনিয়নের বন্যাতলা গ্রামের ৭৫ বছর বয়সী শামসুর রহমানের কথায়, 'আগে জোয়ারের পানি গ্রামের শেষ সীমানা পর্যন্ত আসত। কিন্তু গত কয়েক বছর নদী যেন 'পাগল হইয়া' গেছে।' তাঁরা হয়তো জানেন না, প্রকৃতির সন্তান মানুষই প্রকৃতিকে 'পাগল' করেছে। তাঁরা হয়তো এ-ও জানে না যে, সাড়ে তিন মাস পরেই নদী নয়, গোটা সমুদ্রই 'পাগল হইয়া' সিডরের বেশে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। পড়েছিল। আর সিডরের ক্ষত শুকাতে না শুকাতেই আসবে 'আইলা'–তা-ও এসেছিল। তাঁরা হয়তো এখনো জানেন না, তাঁদের পায়ের তলার মাটি এই যে গেল, সহসা আর তা ফিরবে না। এটা শেষ নয় শেষের শুরু। ঠিক একই আতঙ্কে পড়েছেন আমাদের ভোলা আর সেই প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ ফিজির মানুষেরা– এমনকি পৃথিবীর উপকূলীয় অঞ্চলের সমস্ত মানুষেরা। এই মানুষেরা কেউ কাউকে চেনেন না। অথচ তাঁদের অজান্তেই তাঁদের সবার ভাগ্য এক ফাঁসে গাঁথা হয়ে গেছে। সেই ফাঁসের নাম জলবায়ু পরিবর্তন। সেই ফাঁস তাঁরা বানাননি, বানিয়েছে চলতি বিশ্বের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ও ভূতাত্ত্বিক পরাশক্তিরা। গত তিনশ বছর ধরে যারা পুরনো পৃথিবী ভেঙে নতুন পৃথিবী বানিয়েছে, প্রতিষ্ঠা করেছে পুঁজিবাদ, প্রযুক্তিকে করেছে সেই পুঁজিবাদের হাতিয়ার এবং প্রকৃতিকে করেছে দাস, আজকের এই বিপর্যয়, যার নাম দেওয়া হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন, তার জন্য দায়ী তারাই।

আসামি 'মানুষ ও তার সভ্যতা'

২০০৭-এর ১৫ নভেম্বর রাতে যখন সিডর আমাদের উপকূল তছনছ করছে, ঠিক সেসময় স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সংস্থা আইপিসিসি তাদের প্রতিবেদন চূড়ান্ত করছিল। ৬টি মহাদেশের ২০০ জন বিশেষজ্ঞের ৪ বছরের গবেষণার ফসল এ প্রতিবেদন। তাতে ঘোষিত হয়, মানবজাতির ইতিহাসের সব থেকে বড় বিপদ হল জলবায়ু পরিবর্তন আর তার জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশের অতিমাত্রায় জ্বালানি ব্যবহার। পরিহাসটা কেমন, যে বিজ্ঞানের জোরে মানুষ প্রকৃতির রাজা হয়েছে, সেই প্রকৃতির বিচারের রায় লিখিত হল বিজ্ঞানীদেরই হাতে। সেই রায়ে ঐকমত্যের আসামি হল 'মানুষ ও তার সভ্যতা'। কিন্তু কোন সভ্যতা? কাদের সভ্যতা? একভাবে বললে, মানুষের সভ্যতার ইতিহাস তাপেরও ইতিহাস। ১০ হাজার বছর আগে পৃথিবী শীতঘুম ভেঙে উষ্ণ হয়ে ওঠে। সেটাই ছিল মানবসভ্যতার শুরুর সোনালি গ্রীষ্ম। পৃথিবীর ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে এর নাম 'লং সামার' বা দীর্ঘ গ্রীষ্ম। সেই পরিবেশে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সভ্যতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু গত তিনশ বছরে সেই 'সভ্য' মানুষ পৃথিবীর ওপর অনেক অত্যাচার চালিয়েছে। গত দশ হাজার বছরে প্রাকৃতিকভাবে যত কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিঃসরিত হয়েছে, শিল্পবিপ্লবের পরের তিনশ বছরে জমেছে তার দ্বিগুণ। এর মধ্যে বিশুদ্ধ পানির অর্ধেকটাই ব্যবহৃত হয়ে

গেছে। মৌসুমি অঞ্চলের প্রাণপ্রজাতির বিলুপ্তির হার বেড়েছে দশ হাজার গুণ! এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবী মানবজাতির বসবাসের অনুপযুক্ত হতে একশ বছরও প্রয়োজন হবে না। পৃথিবীর প্রাণ ও পরিবেশের এমন চরম ক্ষতি কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য হয়নি, সেই ক্ষতিরই পরিণতি হল জলবায়ু পরিবর্তন। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার 'ক্যাপিটাল ক্রাইম'-এর 'ক্যাপিটাল শাস্তি' হল মানুষের অস্তিত্বেরই ধ্বংস। জলবায়ু পরিবর্তন যদি ঘটে চলে, তাহলে পৃথিবীতে বর্তমান ধরনের সভ্যতা আর টিকবে না, থাকবে না প্রকৃতির ওপর আধিপত্যকারী মানুষের এমন শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষ তখন পরিণত হবে একটি অধঃপতিত প্রজাতিতে। পাশ্চাত্যের কোনো নাগরিক প্রতিদিন যে পরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করেন, তার একশ ভাগের একভাগও আমাদের মানুষেরা করে না। তিনশ বছর ধরে তারা যে পরিমাণ জ্বালানি পুড়িয়েছে, তাদের ভোগের খেসারত হিসেবে যে পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ঘটেছে, তা করবার কোনো সামর্থ্য বাদবাকি দুনিয়ার ছিল না। এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার শত শত কোটি মানুষ এখনো বিদ্যুৎ বা গাড়ি কিছুই ব্যবহার করে না, প্লেনে চড়ে না। তাদের ধানক্ষেত কিংবা গোয়ালঘর থেকে যে মিথেন গ্যাস তৈরি হয় জলবায়ু পরিবর্তনে তার ভূমিকা মামুলি। বাংলাদেশের একটি শিশু যতটা জ্বালানি ভোগ করে, একটি মার্কিন শিশু করে তার থেকে নব্বইগুণ বেশি। বিশ্বের উষ্ণতাবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ দায়ী দশমিক ২ শতাংশ, আর শিল্পোন্নত ৩/৪টি দেশ দায়ী প্রায় ষাট শতাংশ। সুতরাং এটা সত্যি নয় যে মানুষ দায়ী, দায়ী কিছু মানুষ ও তাদের স্বার্থরক্ষক ব্যবস্থা। এই নির্লজ্জ চাতুরি আমরা মানব কেন? বিশ্বকে যারা ধ্বংস করছে তারা আমরা নই, তারা হল বিশ্বের বর্তমান অর্থনৈতিক, প্রাযুক্তিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সুবিধাভোগীরা। ইউরোপ আর আমেরিকা মহাদেশে এবং বিশ্বের সব রাজধানীর পুঁজিপতি-কোটিপতিদের অপরাধের দায় মানবজাতি কেন নেবে? এইসব সুবিধাভোগী মানুষ এবং তাদের ব্যবস্থাই হল জলবায়ু পরিবর্তনের গোড়ার কারণ। এককথায় এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল অতি-উৎপাদন অতি-ভোগ ও অতি-মুনাফা। গত বছরের বৈশ্বিক খাদ্যসংকটের সময়ও বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদন ছিল চাহিদার তুলনায় বেশি। কিন্তু মুক্তবাজার খাদ্য পাওয়াকে মুক্ত করেনি।

জানামতে, মহাবিশ্বের এই একমাত্র সবুজ গ্রহে যে পরিবেশে প্রাণের জন্ম সম্ভব করেছিল, গত তিনশ বছর ধরে চলা বর্তমান ব্যবস্থা মানুষ ও প্রাণের বাঁচার সেইসব শর্ত ধ্বংস করে করে এখন চরমে উঠেছে। তাদের আবির্ভাবের আগে যে প্রকৃতি ছিল সুন্দর এবং প্রাণ, সম্পদ, পুষ্টি ও ঔষধি উপাদানে পরিপূর্ণ, তাদের হাত পড়বার পর তা পণ্যের কাঁচামাল হতে হতে মরে কুৎসিত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। যে নদী-জলাভূমি ও মাটি ছিল জননী, সেই জননী এখন বিষাক্ত ডাকিনী হয়ে গেছে। যে নীলাকাশ অপরূপ, তার বায়ুমণ্ডল প্রাকৃতিক সামিয়ানা হয়ে সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করত, কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ও সিএফসি গ্যাস জমে জমে

সেই সামিয়ানা জায়গায় জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। ফলে তাপ ও বিষাক্ত রশ্মির সামনে আমরা এখন প্রতিরক্ষাহীন।

পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুই মেরুর বরফ যেমন ছিল পানির উৎস, তেমনি তা পৃথিবীর তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় রাখতেও সাহায্য করত। আমাদের হিমালয় পর্বতমালার বরফ ছিল উপমহাদেশের দেড়শ কোটি মানুষের পানির উৎস। হিমালয়-দুহিতা নদীগুলো আমাদের জমিগুলোকে শস্যশ্যামলা করেছে, জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ। অ্যান্টার্কটিকা এবং হিমালয় দুটোর বরফই গলছে। এই বরফ গলে সমুদ্রে চলে গেলে মিঠাপানির উৎস ফুরাবে, হারাবে মাছ ও কৃষিজীবন।

আজ ভারত-চীন-ব্রাজিলের মতো দেশ সেই একই ধারায় তাদের শিল্পায়ন চালালেও এটা এক অর্থে পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী মডেলেরই সম্প্রসারণ; যার নাম তারা দিয়েছে 'বিশ্বায়ন'। আমেরিকা কার্বন নিঃসরণ কমানোয় কিয়োটো প্রটোকলে স্বাক্ষর করেনি। উপরন্তু ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নিঃসরণ অর্ধেক কমানোর যে লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছিল, ওবামার সঙ্গে বৈঠকের পর সে লক্ষ্যমাত্রা থেকে সরে এল আসিয়ান ও অ্যাপেক নেতারা। অন্যতম পরিবেশ ধ্বংসকারী দেশ অস্ট্রেলিয়া তাদের নাগরিকদের মাথাপিছু গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাত্রা ঠিক করেছে উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের থেকে ১৫ গুণ বেশি হারে। তাঁরা দেখছেন ব্যবসা, কিন্তু আমরা দেখছি আমাদের মতো দুইশ কোটি মানুষের জীবন। জাতিসংঘের এক কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্টের একটা মন্তব্যে জানা যাচ্ছে, কোপেনহেগেন সম্মেলনে কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্যে ১.৫-২.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড গড় তাপমাত্রা কমানো নিয়ে যে সব প্রস্তাব ও খুচরা আলোচনা চলছে, তা আসলে ৩.০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে রোধ করার জন্য যথেষ্ট নয়। 'সভ্যতার সংঘর্ষ' তত্ত্বের জনক উইলিয়াম হান্টিংটন একবার বলেছিলেন, পরিবেশ-বিধ্বংসী কলকারাখানাগুলো তৃতীয় দুনিয়ায় সরিয়ে দেওয়া উচিত, কারণ সেখানকার মানুষের জীবনের দাম কম। কেন কম? কারণ পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে নাগরিকদের জন্য সরকারের মাথাপিছু ব্যয়ের থেকে আমাদের নাগরিকদের মাথাপিছু ব্যয় অনেক কম। অতএব, এদের জীবনের দাম কম। কোপেনহেগেনের জলবায়ু সম্মেলনের নামে যে নির্মম মশকরাটি করা হল, তারপরে হান্টিংটনের বিশ্বাসে ঈমান না আনার কোনো কারণ দেখি না।

বায়োলজিক্যাল এজেন্ট থেকে জিওলজিক্যাল এজেন্ট

জ্বালানিখেকো এই সভ্যতার নায়ক যেহেতু উন্নত (ডেভেলপড) শিল্পভিত্তিক দেশ, সেহেতু দায়ও তাদের– শাস্তিও তাদেরই পাওনা। সমস্যার মর্মে হাত দিয়ে দেখলে টের পাওয়া যায়, পৃথিবীতে সকল প্রাণের জীবনধারণের পরিবেশ এবং মানবপ্রজাতির এমন অপূরণীয় ক্ষতি করেছে যে শক্তি তার নাম পুঁজিবাদ।

পুঁজিবাদ তার প্রথম দিন থেকে যার নিশ্বাসের বিনিময়ে নিজের আয়ু ও শক্তি

বাড়ানো শুরু করেছে তা হল প্রকৃতি। মানবেতিহাসে এর আগের কোনো ব্যবস্থার মানুষ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে এরকম ধ্বংসাত্মক শোষণ চালানোর ক্ষমতা ছিল না। দাসব্যবস্থা যেমন দাসশ্রমের সৌধের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল, পুঁজিবাদ তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্রমিকের শ্রম আর প্রকৃতির সম্পদ নিঃশেষ করার ওপর। প্রকৃতিই হল এর উৎপাদন চালাবার প্রাথমিক কাঁচামাল। প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণের এই প্রক্রিয়ার আরো ঘন চেহারা হল জীবাশ্মজ্বালানি আহরণ ও পোড়ানো। তা গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যগুলোর অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। এসব অরণ্যই ছিল মানবজাতির যাবতীয় ঔষধ ও ভেষজের উৎস। খনিকরণের মাধ্যমে বিরাট অঞ্চলকে তা মরুতে পরিণত করছে। সবুজ বিপ্লবের নামে উচ্চ ফলনশীল জাতের শস্য চাষ করতে গিয়ে জমিকে রাসায়নিক সার ও কীটনাশকে যেমন বিষাক্ত করা হয়েছে, তেমনি প্রাকৃতিক সেচের জায়গায় যান্ত্রিক সেচ এনে মাটির তলার পানিমজুদকে শুষে মাটির সজীবতা ও উর্বরতাকে তলানিতে ঠেকানো হয়েছে। নদীর পানি থেকে শুরু করে সমুদ্রের পানির এই দূষণের ফলে পানির জীবনকে আশ্রয় দেওয়ার ক্ষমতা কমায় সমগ্র খাদ্যচক্র ভেঙে পড়ছে। শিল্প কলকারখানার বর্জ্য, ধোঁয়া আর গ্যাসে বায়ুমণ্ডলকে করা হয়েছে দূষিত। জৈবপ্রযুক্তির প্রচলনের খেসারত হিসেবে একদিকে যেমন অজস্র প্রাণ-প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে, অন্যদিকে ইঁদুর, তেলাপোকার মতো পোকা-মাকড় এবং নানান জাতের ক্ষতিকর আগাছার বিস্তার ঘটছে। এগুলো ঠেকাতে আরো কীটনাশক ইত্যাদি ব্যবহার হচ্ছে, ক্ষতির মাত্রা তখন যাচ্ছে সীমার বাইরে। বিশ্বব্যাপী খাদ্যবাজারের জন্য পোল্ট্রি, হ্যাচারি, গরু-ভেড়া-শুকরের বাণিজ্যিক উৎপাদনের ফলে নানান ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস মহামারী ছড়াচ্ছে। সাম্প্রতিক বার্ড ফ্লু ও সোয়াইন ফ্লু এসবেরই অবদান। এভাবে লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে জৈববিবর্তনের প্রাকৃতিক গতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। এসবের কুপ্রভাব পরিমাপ করা এখনো মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং, পুঁজিবাদ এবং তার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কেবল পৃথিবীর ভূপ্রাকৃতিক গঠন ও জলবায়ু ব্যবস্থার গভীর ক্ষতিই করেনি, তা প্রাকৃতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যেও ক্ষতিকরী হস্তক্ষেপ করেছে। অথচ এই ভূতাত্ত্বিক বাস্তবতা, এই জলবায়ু ব্যবস্থা এবং এই জৈবব্যবস্থা এই তিন খুঁটির ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে পৃথিবী নামক গ্রহের অস্তিত্ব এবং এখানে মহাবিশ্বের একমাত্র জানা সভ্যতার বিদ্যমানতা। এই তিনের ওপর কর্তৃত্ব করবার সুবাদে পুঁজিবাদী শক্তি নিজেকে ঈশ্বরের সমকক্ষ করে তুলেছে। তবে এই ঈশ্বর সৃষ্টির ক্ষমতাধর নয়, ধ্বংসের প্রভু। শোনা যায়, হাইতির ভূমিকম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েদার টেকনলজির অবদান। তা যদি না-ও হয়, তাহলেও এটা সত্য যে, পেন্টাগন এখন পৃথিবীর যেকোনো স্থানে ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, প্লাবনসহ নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ বয়ে আনতে সক্ষম। এটাকে তারা তাদের যুদ্ধক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ হিসেবে দেখছে। সে আলোচনায় না গিয়েও বলা যায়, জলবায়ু ও পরিবেশের এই বিপর্যয়ের

সামনে বিজ্ঞান ও ইতিহাস একটি বিন্দুতে একাকার হয়ে গেছে। এর আগে পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস আর মানুষের ইতিহাস আলাদা ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস ছিল ভূতত্ত্বের অনুসন্ধানের বিষয় আর প্রাণী হিসেবে মানুষসহ প্রাণের ইতিহাস ছিল জীবতত্ত্বের অধীন। এর বাইরে মানুষের যে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জগৎ, তা ছিল ইতিহাসশাস্ত্রের বিষয়। কিন্তু ইতিহাসবিদ দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর

The climate of history: Four theses
(http://www.eurozine.com/articles/2009-10-30-chakrabarty-en.html)

রচনায় বলছেন, 'পরিবেশ সচেতন ইতিহাসের আখ্যানে মানুষ বায়োলজিক্যাল এজেন্ট। জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রতিনিধি।...কিন্তু আবহাওয়া পরিবর্তনের মনুষ্যজনিত কারণ নিয়ে যাঁরা পড়াশোনা বা গবেষণা করছেন, তাঁরা মানুষকে কেবল বায়োলজিক্যাল এজেন্ট বলে ভাবছেন না, তাঁদের কাছে যা সবচেয়ে নতুন ও ভয়াবহ একটি ঘটনা, তা হল এই যে মানুষ এখন একটি geological agent বা ভূতাত্ত্বিক ক্ষমতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' পৃথিবীর গঠন বদলে দেওয়ার ক্ষমতা অস্বীকার করা মানে জলবায়ু পরিবর্তনকেই অস্বীকার করা, পৃথিবী যে ক্রমশ যে মানুষের কার্যকলাপেই উষ্ণ হয়ে উঠছে সেই সত্যের থেকে চোখ বন্ধ করে থাকা।

দীপেশ চক্রবর্তী এই পরিস্থিতিকেই সূত্রায়ন করে বলছেন

''Biological agent, geological agent'– ফারাকটি শুধু গুণগতই নয়, পরিমাণগতও বটে! একদা একটি উপগ্রহ ও পৃথিবী ধাক্কা লাগায় প্রচুর প্রজাতি, ডাইনোসরসহ, ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ আজ যেন সেই মাপের একটি ক্ষমতা, সমস্ত পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন করতে পারে সে। আজ তার চাপে অন্যান্য বহু প্রাণীর ও প্রজাতির নাভিশ্বাস উঠেছে। সমস্ত গ্রহের ভূগোল বদলাতে শুরু করেছে মানুষ। পরিবেশকেন্দ্রিক ইতিহাসচর্চায় মানুষের এই মাপের ক্ষমতার সম্বন্ধে কোনো ধারা ছিল না। তার কারণও ছিল। গোটা পৃথিবী নামক গ্রহটির সার্বিক আবহাওয়ার এই বর্তমান সংকটের আগে মানুষের এই Geological agency ছিলও না। এই ক্ষমতা অর্জন করতে শুরু করেছে মানুষ, কিন্তু গত ৩০ থেকে ৫০ বছরে প্রকট হয়েছে এই ক্ষমতা।''

কিন্তু এই ক্ষমতা অর্জন কি মানবপ্রজাতির কল্যাণে? বিশ্বের পুঁজিপতিরা আর বিশ্বের দরিদ্ররা উভয়ই কি এই ক্ষমতার সমান সুবিধাভোগী? পাশ্চাত্যের সুবিধাভোগী সমাজের মানুষ আর এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকার দুর্ভোগে বন্দী মানুষকে কি এই ক্ষমতা সমানভাবে ক্ষমতায়িত করছে? বরং উল্টোটা। মানবপ্রজাতি তাই Biological agent, থেকে 'geological agent'-এ পরিণত হয়নি। এই ক্ষমতা বরং মানবজাতির বিরুদ্ধেই পুঁজিবাদের অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

এই দিক থেকে দেখলে শিল্প-বিপ্লবই বলি, পুঁজিবাদই বলি, বা রেঁনেসা-ই বলি, যাকে এতদিন 'মুক্তির যুগ' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছিল তা আসলে ছিল মানুষ ও প্রকৃতির আরো গভীরভাবেই বন্দী হয়ে যাওয়ার আয়োজন। সেই বন্দীত্বের নিট ফল হল: মুনাফার জন্য জীবপ্রজাতির ধ্বংস, মানবজাতির বিরাট অংশের ভূমি, সম্পদ, দেহমন ও শ্রমের মালিকানা থেকে বঞ্চনা। এর হাতে প্রকৃতি সৌন্দর্যের আধার ও জীবনের উৎসের আসন থেকে পতিত হয়। বিশ্বায়ন, পর্যটন ও পৃথিবীর সব অঞ্চলকে এক চেহারায় এবং এক পরিচালনার মধ্যে আনতে গিয়ে জাতি ও অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিলোপ করা হয়। এর পরে প্রকৃতি দৃশ্যমান হয় কেবল দুই বিপরীত চেহারায়: একদিকে তছনছ করা বন, দূষিত নদী-জলাভূমি, খোলামুখ খনি, মরুকৃত তৃণভূমির এক কুৎসিত কাঁচামাল যোগানোর ক্ষেত্র, অন্যদিকে জলাভূমি ভরাট করে গড়ে-ওঠা ঘিঞ্জি বসতি, ধ্বংসোন্মুখ শহর, আবর্জনা ও বাতিল মালের স্তূপ, প্লাস্টিকের ভাগাড়। এরকম অবস্থার মধ্যে বাস করতে করতে মানবপ্রজাতির আগামী কয়েক প্রজন্মের মধ্যে জৈবগঠনের দিক থেকে, শরীরতত্ত্বের দিক থেকে এবং অঙ্গসংস্থানের দিক থেকে বিবর্তনের উল্টো প্রক্রিয়ায় মারাত্মক অবনতিপ্রাপ্ত দশা প্রাপ্ত হবে। এই বিধ্বস্ত বাস্তবতাই হল পুঁজিবাদের তিনশ বছরের পরম উপহার এবং জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি হল তার দেওয়া স্থায়ী ব্যাধি। এ কারণেই জলবায়ু পরিবর্তনের আলোচনা এবং তার প্রতিকারের উপায় সন্ধান পুঁজিবাদকে না চিনে এবং না দোষী করে বোঝা সম্ভব হবে না। সম্ভব নয় বিদ্যমান, উন্নয়ন, আধুনিকতা, প্রগতি ও গণতন্ত্রের সঙ্গে এই বিপর্যয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আবিষ্কার ছাড়া এর থেকে বেরিয়ে আসার পথ রচনা করা।

সংকট যখন রাজনৈতিক

সমস্যাটা কেবল পরিবেশের বলে ভাবা ভুল। প্রাকৃতিক হলেও পরিণামে তা সার্বিক রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দিতে বাধ্য। বিশ্বের প্রতি ৪৫ জনের মধ্যে একজন এবং বাংলাদেশের প্রতি সাতজনের একজন জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার হবে। সমুদ্রের উচ্চতা এক মিটার বাড়লেই দেশের ২০ শতাংশ এলাকা ডুবে যাবে। একদিকে হিমালয়ের বরফগলা পানি অন্যদিকে সমুদ্রের নোনা প্লাবনে আক্রান্ত হবে আরো বেশি এলাকা। ধানের উৎপাদন কমে যাবে অর্ধেক। বাংলাদেশের প্রায় দুই-তিন কোটি লোক সরাসরি জলবায়ু-উদ্বাস্তু হবে। খাদ্য-নিরাপত্তা ও বাসস্থান ও স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পড়বে আরো বেশি মানুষ। এত মানুষের উপায় দেশের ভেতর থেকে করা সম্ভব না। যাওয়ার কোনো পথও থাকবে না। আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও কনভেনশনগুলোর কোনোটিই এখন অবধি রাজনৈতিক শরণার্থী ছাড়া অন্য কোনো শরণার্থীর দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। কাদের বলা হবে জলবায়ু-উদ্বাস্তু সে ব্যাপারে কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞাও ঠিক হয়নি। বাংলাদেশের এত মানুষের ভার কেউ নেবে না। কাজেকাজেই আগামি বিশ

বছরে বর্ধিত জনসংখ্যার হিসাব ধরলে প্রায় ২০ কোটি মানুষ আমাদের সীমানার মধ্যেই বন্দী হয়ে পড়বে। এমনিতেই দেশ জনসংখ্যার ভারে কুঁজো; সম্পদ, জমি এবং সুযোগের চরম টানাটানি। রাষ্ট্র-প্রশাসন ও রাজনীতি চরম গণবিরোধী, অদক্ষ, দুর্নীতিগ্রস্ত ও জনস্বার্থ বর্জিত। ২০৫০ সাল নাগাদ, যখন সব দিকেই আকাশ ভেঙে পড়বে আর সমুদ্র করবে তোলপাড়, তখন সীমিত সুযোগ নিয়ে কামড়াকামড়ি শুরু হবে। যাদের নেই তারা যাদের আছে তাদের ওপর হামলে পড়বে। এই চরমভাবাপন্ন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে লতিয়ে লতিয়ে বাড়বে রাজনৈতিক হানাহানি, সন্ত্রাস ও দাঙ্গা। সমগ্র দক্ষিণ-এশিয়াকেও তা উত্তপ্ত করে তুলতে পারে। ভারতের আশঙ্কা অন্তত কোটিসংখ্যক মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করতে পারে। এদের মোকাবেলার জন্য তারা আগাম কাঁটাতারের বেড়া এবং সন্ত্রাসদমনের সামর্থ্য সৃষ্টি করছে। এতসংখ্যক লোকের ভার নেওয়া মানে ভারতের প্রবৃদ্ধি থমকে যাওয়া। এমনিতেই ভারতের বিপুল দারিদ্র্য সেখানে সহিংস গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশ থেকে যাওয়া মানুষের সঙ্গে স্থানীয় বেকার-দরিদ্রদের সংঘাত সৃষ্টি হবে। আবার ভারত যদি সীমান্তে তালা দিয়ে থাকে, এবং এদেশের মানুষ যদি দেখে তাদের কোনো উপায় নেই, তখন যে তীব্র ভারতবিরোধী অসন্তোষ সৃষ্টি হবে তা সামাল দেওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না। এই তীব্র জনঅসন্তোষ মোকাবেলার আগাম প্রস্তুতিই তারা সন্ত্রাস দমনের এন্তেজামের মাধ্যমে নিয়ে চলেছে। জলবায়ুর সমস্যা যখন অস্তিত্বের সংকট হয়ে দাঁড়াবে তখন দেশ সোমালিয়া বা সুদানের দশা যে পাবে না তা কেউ হলফ করে বলতে পারে না।

বাংলাদেশ বাঁচলেই বিশ্ব বাঁচবে

পৃথিবীর জনসংখ্যার ২.৫ শতাংশের বাস বাংলাদেশে। অথচ মোট কার্বন নিঃসরণের মাত্র দশমিক ১ শতাংশ আমাদের। আমেরিকার জনসংখ্যা বিশ্বের ৫ শতাংশ হলেও, তাদের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ২৫ শতাংশ। একেই বলে জলবায়ু-অবিচার। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে আমাদের দায় সবচেয়ে কম হয়েও আমরাই হচ্ছি সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত। বাংলাদেশের উচিত, এই জলবায়ু অবিচারের বিষয়টি তুলে ধরে জলবায়ু-সুবিচারের দাবি তোলা। ক্ষতিগ্রস্ততম দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিশ্বজনমতকে প্রভাবিত করবার সুযোগও শেখ হাসিনার জন্য খোলা। কোপেনহেগেনে তাঁর স্লোগান হতে পারত, 'বাংলাদেশ বাঁচলেই বিশ্ব বাঁচবে'। বাংলাদেশ যেহেতু সবচেয়ে বিপন্ন, সেহেতু বাংলাদেশ রক্ষা পাওয়া মানে অন্যরাও রক্ষা পাওয়া। তাঁকে জানাতে হবে, ২০৫০-এর মধ্যে বিশ্বের তাপমাত্রা আগের অবস্থায় আনাই বাংলাদেশের অস্তিত্বের শর্ত। আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-ইউরোপ যদি তাদের জ্বালানি ব্যবহারের ধরন পাল্টায়, তাহলে আমরা রক্ষা পাব। এজন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশকে জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার বৈশ্বিক মডেল ঘোষণা করে, আন্তর্জাতিক তহবিল, জ্ঞানভাণ্ডার, বিশেষজ্ঞ-

জমায়েতসহ প্রয়োজনীয় সব কিছুর ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও অন্যান্য সব সহায়তা আমাদের দিতে হবে, যাতে আমাদের মানুষগুলোকে, আমাদের কৃষি, নদী, বন, জলাশয় ও প্রাণপ্রকৃতিকে আমরা বাঁচাতে পারি। এভাবে নতুন যুগের প্রকৃতি-বান্ধব অর্থনীতি, জীবনধারা ও রাজনীতির গোড়াপত্তন হতে পারে বাংলাদেশেই। বাংলাদেশ পথ দেখাতে পারে আর সবাইকে। কিন্তু তা হয়নি, বরং তারাই আমাদের ভিক্ষাবৃত্তির পথ দেখিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ হতে পারত ফরিয়াদী-প্রতিবাদী, কিন্তু হয়েছে কৃপাপ্রার্থী। বহু প্রজন্মের এই অভ্যাস বদলাবার নয়। বরং জলবায়ু বিপর্যয়কে মওকা করে এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ, আমলা-বিশেষজ্ঞ-এনজিওসহ সিভিল সোসাইটির লোকজনের পোয়াবারো হওয়ার অবস্থা। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কোনোদিন এই দেশকে তাঁরা নিজেদের বাসস্থান মনে করেননি। তাঁদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত তাই তাঁরা ইউরোপ-আমেরিকাতেই দেখছেন। সুতরাং দুর্যোগ নতুন ব্যবসা বৈ আর কিছু নয়।

পি মুনসি নামের এক ব্লগার এই পরিহাসটিই সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন, 'একটা হিসাব দিয়ে বলা হচ্ছে, ৭০০ বিলিয়ন ডলার খরচে নাকি দুনিয়াকে সাফসুতরা করে ফেলা যায়। এই ৭০০ বিলিয়ন ডলার দিয়ে আমরা কী কী কিনব? intellectual property rights-এ আগাপাশতলা বাঁধা কোনো উচ্চমার্গীয় টেকনোলজি? কর্পোরেট তেল ও গ্যাস কোম্পানির বিপুল স্বার্থের নতুন টেকনোলজি?' আমেরিকার কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান চালান এমন একজন climatologist, James White বলছেন, This is a collision between science and politics, অর্থাৎ তিনি, রাজনীতি ও বিজ্ঞানের একটা বিবাদ শুরু হয়ে গেছে বলে দেখছেন। তিনি আরও বলছেন, আজকের অনেক জলবায়ু-বিশেষজ্ঞ কর্পোরেট তেল ও গ্যাস কোম্পানির বিপুল স্বার্থের হয়ে লড়তে শুরু করেছেন; এটা ১৯৬০-এর দশকের কিছু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতো যারা সিগারেট কোম্পানির হয়ে লড়তে বিজ্ঞানকে কাঁথার তলে লুকিয়ে রাখত।

এবার ওবামার কথাই একটু ধরি; জলবায়ু সম্মেলনে তিনি এসে আমাদেরকে দয়া দেখিয়ে কমিটমেন্ট করে বলেছেন, ১০০ বিলিয়ন ডলার তাঁরা দূষণে ক্ষতিগ্রস্ত গরিব দেশের পিছনে ক্ষতিপূরণের খয়রাত হিসেবে দান করতে চান? কিন্তু ঐ ১০০ বিলিয়ন ডলার কিসে খরচ হবে? তাঁদেরই নতুন যন্ত্রপাতি, তাঁদেরই পাঠানো বিশেষজ্ঞের বেতন? তাহলে কার টাকায় কে কী কিনল? এরপর কী হবে? ঐ ১০০ বিলিয়ন ডলারের টেকনোলজি যে চাহিদা তৈরি করবে তাতে আবার ১:১০ অনুপাতের হিসাবে ধরলে, ১০০০ বিলিয়ন ডলারের টেকনোলজি, পণ্য, ক্লিন(?) জ্বালানির মতো নতুন ব্যবসার লাইন হাজির হবে, কনজুমার হয়ে উঠব আমরা? নতুন ব্যবসার লাইন জমে উঠবে নিশ্চয়।

(http://www.somewhereinblog.net/blog/pmunshe/29062012)
কানাডীয় অধ্যাপক নাওমি ক্লেইন একেই বলছেন 'ডিজাস্টার ক্যাপিটালিজম'। পুঁজিবাদের সেরের ওপর তাই এখন সোয়া সের হয়েছে এই দুর্যোগ ব্যবসা।

কে শ্রেষ্ঠ, মানুষ না ইঁদুর?

সিডর-আইলার ক্ষতিগ্রস্তরা জানে না, তারা কিসের মার খেল। আমাদের মতো দেশের খরা-অতিবন্যা কিংবা জলবায়ু বিপর্যয়ের শিকার মানুষেরাও জানে না, কেন এমন হল আর কীভাবেই-বা তারা বাঁচবে। আমরা পানির দেশের লোক নদীর বন্যা বুঝি, কিন্তু সমুদ্রের ঢল বুঝি না। আমরা একার বিপদ বুঝি কিন্তু সবার বিপদ বুঝি না। বড় সমস্যা হিসেবে জঙ্গি-সন্ত্রাসবাদকে চিহ্নিত করেছি, একে মোকাবেলার তোড়জোরও কম নয়। কিন্তু জলবায়ু বিপর্যয় যে এর থেকেও বড় এবং আখেরে তা এ ধরনের সমস্যাকেই শতগুণে বাড়াবে সেই হুঁশ আনছি না। আমরা বড়জোর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চিন্তা করি, অথচ জলবায়ুর বিপদ মোকাবেলায় প্রয়োজন কমপক্ষে পঞ্চাশ বছরের পরিকল্পনা। কাতড়াতে কাতড়াতে পথ-হাতড়ানো আর কত? ভূমিকম্প বা বন্যার আলামতে ইঁদুর গর্ত ছেড়ে বেরোয় আর এক কাকের বিপদে জড়ো হয় হাজারো কাক। তারা হয়তো আমাদের থেকে শ্রেষ্ঠ জীব, তাই তারা পারে– আমরা পারি না।

'সভ্যতা' না বদলালে প্রকৃতিই বদলাবে

২০০৭ সালের বালি সম্মেলনের ভাষণে পৃথিবীর জন্য কেঁদে ফেলেছিলেন জাতিসংঘের প্রধান পরিবেশ কর্মকর্তা ইওভো ডি বোয়ার। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নোনা পানিতে বন্দী খুলনা-সাতক্ষীরা-বরগুনা-বাগেরহাট ও সুন্দরবনসংলগ্ন লাখ লাখ জলবায়ু-দুর্গত মানুষ সেই তো কান্না প্রতিদিনই কেঁদে চলেছে। সমুদ্র থেকে উঠে আসা নোনা পানি চর্মরোগে আক্রান্ত হাত দিয়ে তুলে খেতে খেতে তারা নিত্যদিনই কাঁদে। তাদের নদীর পানিও তাদের অশ্রুর মতোই নোনা। মানুষ কাঁদছে, মানুষের পৃথিবীও কাঁদছে। কোপেনহেগেনের সম্মেলনে জড়ো হওয়া বিশ্বনেতাদের বুকে কি সেই কান্নার ধক পৌঁছাল? কারো অশ্রুতে মুক্তা ঝরে আর আমাদের অশ্রুতে কি কেবলই নুন?

কোপেনহেগেন নিষ্ফলা হয়েছে। সম্মেলন শুরু হওয়ার পরের দিনই ব্রিটেনের 'গার্ডিয়ান' পত্রিকা স্বাগতিক দেশ ডেনমার্কের একটি গোপন সরকারি দলিল ফাঁস করে। দলিলটি তৈরি করেছে ডেনমার্ক, ব্রিটেন আর আমেরিকা। ঐ দলিলে বলা হয়েছে, উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তাদের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা তো দূরের কথা, তারা ঠিক করেছে জলবায়ু বদলাক– তারা বদলাবে না। তারা চায় ভারত-চীন-ব্রাজিলের মতো উন্নয়নশীল হবু অর্থনৈতিক পরাশক্তিগুলোর থেকে তারা দ্বিগুণ হারে কার্বন পোড়াবে। এবং এটা চলবে ২০৫০ সাল নাগাদ। জাতিসংঘের জলবায়ু সংস্থা আইপিসিসি বলেছে, বর্তমান হারে চলতে থাকলে ২০৫০ সাল নাগাদ

বিশ্বের তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। এবং তা আর ফেরানো যাবে না। ফলে বাংলাদেশসহ সমুদ্রতীরের অনেক দেশের অনেক এলাকা ডুবে যাবে। এককথায় মহাপ্রলয় নামবে পৃথিবীতে।

ঐ দলিলে বাংলাদেশের মতো কিছু দেশকে অবশ্য ঘুষ দেওয়ার কথা আছে। এদের 'সবচেয়ে বিপন্ন দেশের' খেতাব দিয়ে কিছু সহযোগিতা করা হবে। এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য গরিব দেশগুলোর সঙ্গে এরা যাতে জোট না বাঁধে, এই বিভক্ত করো– শাসন করো কৌশলেরই আশ্রয় নেওয়া হল। এই সংবাদ পাওয়ামাত্র শূন্য সভাকক্ষে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন তাহিতি দ্বীপের প্রতিনিধি। সমুদ্রের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে তাঁর দেশবাসী যে ডুবে যাবে! ডুবে যাবে বাংলাদেশের বিরাট অঞ্চলও। বিপন্ন হবে প্রায় তিন-সাড়ে তিন কোটি মানুষের জীবন ও বসতি।

তাঁর দেশবাসী তাঁকে পাঠিয়েছে সুখবর আনবার জন্য। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সুখবর নেই। আমেরিকা বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য এককভাবে সবচেয়ে বেশি দায়ী। আইপিসিসি জানিয়েছে, বিশ্বকে বাঁচাতে ২০২০ সালের মধ্যে আমেরিকাসহ শিল্পোন্নত দেশগুলোকে তাদের কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে হবে ১৯৯০ সালের তুলনায় ২৫-৪০ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বলেছে তারা তিন শতাংশের বেশি কমাবে না। একেই বলে নাক চেয়ে নরুণ পাওয়া। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি ম্যানুয়েল ডি বারোসা হৃদয়বান মানুষ হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেছেন, কোপেনহেগেনে আমরা লিখতে পারি বাঁচার ইতিহাস অথবা আত্মহত্যার দলিল। ডেনমার্কের প্রেসিডেন্ট রাসমুনসেন বলেছেন, কোপেনগেহেন হবে হোপেন-হেগেন অর্থাৎ আশার শহর। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববাসীর সবুজ পৃথিবীর আশার সমাধি হয়েছে ওই কোপেনহেগেনেই।

বিশ্বায়নের দায়

গত এক দশকে এই মুনাফাভোগী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সবদিকেই সংকট বাঁধিয়ে সেই সংকটের কাদাজলে নর্তনকুর্দন করছে। মোটাদাগে চারটি সংকটের কথা বলা যায়, ১. রাজনৈতিক: রাজনৈতিক হানাহানি, যুদ্ধ আর সন্ত্রাস বিশ্বকে রাজনৈতিকভাবে রক্তাক্ত করছে। সাবেকি গণতন্ত্রগুলো আর কার্যকর সুফল দিতে পারছে না। ২. অর্থনৈতিক, মুক্তবাজার ও বিশ্বায়ন অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক মন্দায় পতিত হয়েছে। 'দি ইকনমিস্ট' পত্রিকা পর্যন্ত বলছে বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজারকে কিছুটা পিছু হঠতে হবেই। ৩, নিরাপত্তা: জ্বালানি, খাদ্য, সামাজিক নিরাপত্তা উত্তরোত্তর ঝুঁকির মুখে পড়ছে দারিদ্র্য ও ভাইরাসজনিত মহামারী নিয়মিত হয়ে উঠছে এবং ৪. জলবায়ু: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মহাবিশ্বে মানুষের একমাত্র রঙ্গমঞ্চ এই পৃথিবী গ্রহটিই বিপন্ন হয়ে পড়ছে। এককথায় প্রথম তিনটি সমস্যারই ফল হল জলবায়ু সমস্যা। যদি অর্থনীতি প্রকৃতিকে শোষণ না করত এ পরিমাণে, প্রকৃতি ও মানুষের স্বার্থ যে অভিন্ন এই বুঝ যদি

রাজনীতিবিদদের মধ্যে থাকত এবং সকলের মানুষের নিরাপদ জীবনকেই সমাজ-সভ্যতার লক্ষ্য করা হত তাহলে আজ জলবায়ু পরিবর্তন হতে পারত না। বিশ্বায়নও তাপ বাড়াচ্ছে পৃথিবীর। আমেরিকার একজন নাগরিক তাঁর থালায় যে খাবারটি এ মুহূর্তে খেতে যাচ্ছেন, সেটি এসেছে ১৫০০ মাইল পথ পেরিয়ে। বিশ্বায়নের সঙ্গে যুক্ত পরিবহন খাত থেকেই মোট কার্বন নিঃসরণের ২৩ শতাংশ হয়। জলবায়ু সম্মেলন চলাকালেই আন্তর্জাতিক শক্তি কমিশন (আইইএ) একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের বর্তমান তেল-গ্যাস ক্ষেত্রগুলো শূন্য হয়ে যাবে। আবার সেই সময়ে বর্তমানের থেকে জ্বালানি চাহিদা বাড়বে প্রতি বছর ১.৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট করে। মোট চাহিদাও বাড়বে প্রায় দেড়গুণ। এই পরিমাণ নতুন তেল-গ্যাস-কয়লা ওঠানো হবে নতুন ক্ষেত্রগুলো থেকে, অর্থাৎ বাংলাদেশের ধানের রাজধানী দিনাজপুরের ফুলবাড়ী-পার্বতীপুর, সিলেটের লাউয়াছড়া উদ্যান, ভারতের অরণ্য অঞ্চল, ল্যাটিন আমেরিকার আমাজন অঞ্চলসহ বিশ্বের সবুজ অঞ্চল ও কৃষিজমি থেকে। বিকল্প হিসেবে ভাবা হচ্ছে বিকল্প জ্বালানি ও সবুজ প্রযুক্তির কথা। কিন্তু যদি মানুষ ও প্রকৃতিকে মুনাফার জন্য ভাবার ব্যাধি না কাটে অধিপতিদের, তাহলে প্রযুক্তি আর কী করবে? আর সংকট তো প্রযুক্তিগত নয়, সংকট চেতনাগত, ব্যবস্থাগত। সিস্টেম না পাল্টালে তাই জলবায়ু কেবল পাল্টাতেই হবে। কোপেনহেগেন সম্মেলন যদি কেবল কিছুটা ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে প্রকৃতিবিরোধী কার্যকলাপ চালাবার বৈধতা দেয়, তাহলে ধ্বংস অনিবার্য। যখন আমূল বদলাবার প্রয়োজন জানাচ্ছে পৃথিবী তখন প্রাযুক্তিক বা কূটনৈতিক দৌড়ঝাঁপ হাতুড়ে ফল দিতে বাধ্য। বাংলাদেশ-মালদ্বীপ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলো হল জলবায়ুজনিত সমস্যার ভরকেন্দ্র। উপরে যে সমস্যাগুলো বলা হল, তার বিপুল চাপ পড়বে আমাদেরই ওপর। যখন ওপর থেকে বরফগলা পানি নামছে গলছে, যখন সমুদ্র ধেয়ে আসছে– তখন কিসের শান্তি, কিসের গণতন্ত্র আর কিসের উন্নয়ন? কিচ্ছু টিকবে না। যারা দুর্যোগের মধ্যে পড়বে তারা নিরাপদদের জন্য শান্তি, উন্নয়ন আর গণতন্ত্র অসম্ভব করে তুলবে। মরবার আগে তারা জীবিতদেরও আধমরা করে যাবে। অর্থনীতি ধসে পড়বে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে দেখা দেবে বিবাদ। এ কথা যেন সবাই মনে রাখি, পৃথিবী যদি সবুজ হারায় তাহলে শান্তির নীলিমাও হারিয়ে যাবে জীবন থেকে।

উন্নয়নের খেসারত

জলবায়ু পরিবর্তনের আওয়াজ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আরেক খেলা শুরু হয়েছে। রাষ্ট্রের ও পুঁজির যাবতীয় ভুল কার্যকলাপের দায় দেওয়া হচ্ছে প্রকৃতির ওপর। বাংলাদেশের বেলায় পুঁজিবাদী উন্নয়ন, নদীশাসন, সবুজ বিপ্লব আর নগরায়নের তোপে পড়ে এ ভূখণ্ডের প্রাকৃতিক কাঠামোর বিপুল অবনতিকেও দেখান হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফল বলে। ভুল নদীশাসন, বাঁধ, উপকূল রক্ষা প্রকল্প ইত্যাদির হোতারা

এখন প্রকৃতির আড়ালে নিজেদের কৃতকর্ম ঢাকতে নেমেছেন। বাংলাদেশে গত এক শতকের নদীশাসনের ইতিহাসের দিকে তাকালেই এই সত্য স্পষ্ট হবে।

বাংলাদেশকে সজীব রাখতে হলে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মের এই বন্যা, পলি জমা ও স্রোতের সমুদ্রমুখী গতি ঠিক রাখার কোনো বিকল্প ছিল না– এখনো নেই। লাখ লাখ বছর ধরে এটাই ঘটে এসেছে বলে বাংলার মাটি ও জলবায়ু পশ্চিম বাংলার মতো রুক্ষ হয়ে যায়নি। কিন্তু প্রধানত বন্যানিয়ন্ত্রণের বাঁধ আর আন্তর্জাতিক জলপ্রবাহের পানি সরানোর ব্যারাজের জন্য সেই প্রক্রিয়া আজ বাধাগ্রস্ত। একটির জন্য আমরা দায়ী, অন্যটির জন্য দায়ী ভারত। জলবায়ু পরিবর্তন হোক বা না হোক, এ দুটি কারণের দিকে নজর না দিলে আমাদের বিপদ অনিবার্য। প্রথমত, ইংরেজ আমলে নদীশাসনের নামে নদীর গতিকে নষ্ট করে সৌভাগ্যের জননীকে পরিণত করা হয় দুর্যোগের ডাকিনীতে। ব্রিটিশ নদী-প্রকৌশলী স্যার উইলিয়াম উইলকক্স ১৯২৮ সালে দেওয়া তাঁর এক বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, 'ইংরেজ আমলের গোড়াতেই সনাতন খাল-ব্যবস্থাগুলোকে কাজে লাগানো ও সংস্কার তো করাই হয়নি, বরং রেলপথের জন্য তৈরি বাঁধের মাধ্যমে এগুলো ধ্বংস করা হয়েছে।' ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জি থমসনও হিন্দু ও মুসলিম যুগের নদী-ব্যবস্থাপনার ধ্বংসের মাধ্যমে বাংলার কৃষি ও জলদেহকে বিপর্যস্ত করার অভিযোগ তুলেছেন। উইলকক্স বলেছেন, 'বাংলার প্রাচীন রাজাদের সামনে সমস্যা ছিল মাটিকে উর্বর করা, ম্যালেরিয়া ঠেকানো ও নদীর স্ফীতিজনিত চাপে ভাঙন মোকাবিলার উপায় বের করা।...বাংলার আদিযুগের কতিপয় রাজা তখন প্লাবন-সেচ পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রচলন ঘটান। এটাই শত শত বছরের জন্য বাংলার সম্পদ ও সুস্বাস্থ্যের নিশ্চয়তা এনে দিয়েছিল। অববাহিকা-সেচ যেমন মিসরের জন্য, স্থায়ী-সেচ যেমন ব্যাবিলনের জন্য, তেমনি বাংলার জন্য উপযুক্ত ছিল এই প্লাবন-সেচব্যবস্থা।' উইলকক্স মনে করেন, 'বাংলার প্রাচীন সেচব্যবস্থাই কেবল পারে সেই সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে। অথচ প্রাচীন সেচব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়া তৎকালীন সেচ বিভাগ আর সব পথেই চেষ্টা করেছে। তাতে মাটি আরও অনুর্বর হয়েছে, মাছের আধার ধ্বংস হয়েছে, ম্যালেরিয়া মহামারী আকার পেয়েছে এবং নদীস্ফীতিজনিত চাপে নদীর পাড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দেশ ভরে গেছে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় পৌর্তিক কাজ দিয়ে। একবার সেই প্রাচীন ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া গেলেই দেশটা যেন জাদুকরের জিয়নকাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠবে, আপনাদের সাবেক সমৃদ্ধি আবার আপনাদের দোরগোড়ায় উঁকি দেবে।' কিন্তু তাঁর কথায় কান দেননি তখনকার শাসকেরা। ভারতীয় নদীবিশেষজ্ঞ প্রশান্ত মহলানবীশ সেই ১৯২৭ সালেই বলেছিলেন, বাঁধের ফলাফল হিসেবে তলানি জমে নদীতল ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসবে। পরিস্থিতি এখন আরও খারাপ হয়েছে। একদিকে নদী মরছে, অন্যদিকে পলি দুই পাশের প্লাবনভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে না পারায় মাটি অনুর্বর হচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক হিসাবে নদীবক্ষে পলি জমে ১৭টি নদী মরে গেছে, আরও আটটি মারা

যাওয়ার পথে। অন্যদিকে দেশের প্রধান তিনটি নদী জায়গায় জায়গায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে।

ব্রিটিশদের মতো পাকিস্তান আমলের নীতিনির্ধারকদেরও এ দেশের নদ-নদীর চালচলন-সম্পর্কিত ধারণা এবং কিসে এ দেশের মঙ্গল, সে বিষয়ে ততটা নিষ্ঠা ছিল না। ১৯৬৪ সালের ক্রুগ মিশনের প্রস্তাবিত মাস্টারপ্ল্যানে ইউএসএইডের দেওয়া ২০০ কোটি ডলারের প্রকল্পে দেশের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় তৈরি হয় ৫৮টি বড় বাঁধ। ১৯৮০-এর শেষাশেষি মোট সাত হাজার ৫৫৫ কিলোমিটার বাঁধ, শ'খানেক পোল্ডার এবং আট হাজারের মতো জলনিয়ন্ত্রক কাঠামো বানানো হয়। কিন্তু 'সকলই গরল ভেল' হয়ে যায়। ২৯ মার্চ *প্রথম আলোয়* প্রকাশিত এক নিবন্ধে বুয়েটের পানি ও বন্যা-ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জহির উদ্দীন চৌধুরী লিখেছেন, 'এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের সাহায্যে প্লাবনভূমিকে বন্যামুক্ত করে আমন ধানের উৎপাদন বাড়ানো।...কিন্তু বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্প ও আমন ধান উৎপাদনের ৩০ বছরের উপাত্ত নিয়ে গবেষণার ফল দেখায় যে সার্বিকভাবে আমন ধানের উৎপাদন বাড়েনি। তবে মোট ধান উৎপাদন ব্যাপকভাবে বাড়লেও তার কৃতিত্ব মূলত শুষ্ক মৌসুমে সেচব্যবস্থার।...বাঁধের সাহায্যে প্লাবনভূমিকে বন্যামুক্ত করার কারণে বন্যার পানি জমার জায়গা কমে গেছে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে অন্য এলাকায় বন্যার উচ্চতা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর বিরূপ প্রভাবের শিকার হয়েছে দরিদ্র জনপদ। এভাবে বন্যার ঝুঁকি এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় কেবল স্থানান্তর হচ্ছে, আসলে বন্যা কমছে না। বরং বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কারণে বহু জলাভূমি সংকুচিত বা ধ্বংস হয়েছে।'

এরপর, ১৯৮৭-৮৮ সালের বন্যার পরে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় নেওয়া হয় ফ্লাড অ্যাকশন প্ল্যান। অনেকেই তখন এর বিরোধিতা করেন, কিন্তু সরকার শোনেনি। অতি-উৎসাহী একদল আমলা ও পানিবিশেষজ্ঞ হই হই করে এর পক্ষে দাঁড়ান। যাঁরা বিরোধিতা করেন, তাঁদের কোণঠাসা হতে হয়। কিন্তু ক্ষতিকর প্রমাণিত হওয়ায় জনদাবির মুখে প্রকল্পটি বাতিল হয়। জনমতের চাপে বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের সরকার গঠিত টাস্কফোর্স দেখায়, এরশাদ সরকার জনমতের তোয়াক্কা না করে কিছু দাতা দেশের মদদে দিনের পর দিন এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে গেছে। কারণ, তাদের হাতে তখন বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প। অবশেষে পরিবর্তন আসে ২০০০ সালের জাতীয় পানি-ব্যবস্থাপনা নীতিমালায়। এর খসড়ায় স্পষ্ট করে বলা হয়, শহর ও উপকূলীয় এলাকা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে নতুন করে বাঁধ নির্মিত হবে না। পুরনো বাঁধ-পোল্ডারগুলোও মূল্যায়নের ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে বাতিল করার কথাও বলা হয়। বন্যানিয়ন্ত্রণের নির্মাণকাজে শত শত কোটি টাকার খেলা ও কারচুপির সুযোগ আছে, তার প্রলোভন মহা শক্তিশালী। এই নতুন নীতিমালা কার্যকর হওয়ার ভরসা তাই কম।

দ্বিতীয়ত, যে গঙ্গা থেকেই দেশের সব প্রধান নদীর জন্ম, ফারাক্কায় সেই গঙ্গায় বাঁধ বসিয়ে বাংলাদেশকে পানিবঞ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে যে ৫৪টি যৌথ

নদীর মাধ্যমে ভারতের মিতালি, তার ৪৭টিতেই বাঁধ দিয়ে মিতালিকে বিবাদে পরিণত করা হয়েছে। ভারতের আন্তঃনদীসংযোগ প্রকল্প দিয়ে বঙ্গোপসাগরগামী প্রায় সব নদী থেকে জল সরিয়ে নেওয়ার প্রকল্প চলছে। কেবল উত্তর-পূর্ব ভারতেই নির্মিত হচ্ছে ১৬০টি বাঁধ ও ব্যারেজ। দীর্ঘ মেয়াদে এর ফল হচ্ছে ভয়াবহ। এখন খবর বেরিয়েছে, চীন ব্রহ্মপুত্রের উৎসে ইয়ারলু সাংপু নদীতে বাঁধ দিয়ে জলবিদ্যুৎ বানানোর প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আমাদের এবং প্রতিবেশীদের এসব কার্যকলাপেরই ফল হল বাংলাদেশের সাম্প্রতিক নদী-বিপর্যয়। এর সঙ্গে বৈশ্বিক উষ্ণতার সরাসরি সম্পর্ক নেই। এ ধরনের বহু ক্ষতিকর বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদীশাসন ও উপকূল রক্ষা প্রকল্পে কল্পনাতীত পরিমাণ অর্থ নষ্ট করা হয়েছে। আইয়ুব খানের উন্নয়নের দশক থেকে শুরু করে এরশাদের স্বৈরশাহীর সময় হয়ে বর্তমান পর্যন্ত এমন অনেক প্রকল্পে ঠিকাদার-আমলা-মন্ত্রী-বিশেষজ্ঞদের বিপুল লাভ হয়েছে সত্যি, কিন্তু দারিদ্র্য বেড়েছে, কৃষিজীবী ও জলজীবীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দেশের পরিবেশ-প্রতিবেশ হয়েছে বিপন্ন। প্রাচীন আমলে নদী ও পানি-ব্যবস্থাপনা কাজে সমাজ তথা কৃষিজীবীদের অংশীদারী ছিল। দিনে দিনে তা এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে গেছে, যা লোকায়ত জ্ঞান ও লোকের স্বার্থ দেখার দায় ততটা বোধ করে না। প্রকৃতি বিপন্ন হলে জনসমাজও যে দুর্বল ও দরিদ্র হয়ে যায়, এই বুঝ আজ বড় প্রয়োজন।

প্রকৃতির মুক্তি ও মানুষের মুক্তি যেখানে অভিন্ন

আজ আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের বাস্তবতার সঙ্গে বিদ্যমান পুঁজিবাদী কাঠামোর কার্যকারণের সম্পর্কটি ধরতে হবে। জলবায়ু বিপর্যয় সম্পন্ন হলেও পুঁজিবাদ থাকবে, পৃথিবীর অপূরণীয় ক্ষতি করে হলেও তা মুনাফার নয়া নয়া রাস্তা খুঁজবে। পৃথিবীর ছয়শ কোটি মানুষ এর কাছে জিম্মি। পুঁজিবাদ গত তিনশ বছরে উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ, ফ্যাসিবাদ, জাতিগত গণহত্যা, দেশদখল, সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন-নির্যাতনের পর্ব পার হয়ে এখন প্রকৃতিহত্যার চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজিবাদকে কি অপূরণীয় মানবিক ও প্রাকৃতিক ক্ষতির বিনিময়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে দেওয়া হবে, নাকি পুঁজিবাদের ধ্বংসের বিনিময়ে মানবপ্রজাতি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করবে। একসময় দাসশ্রম ছাড়া অর্থনীতি চলতে পারত না। প্রকৃতি পুঁজির নতুন দাস, প্রকৃতির এই দাসত্ব উচ্ছেদ মানুষের মুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। প্রকৃতি মুক্ত না হলে মানুষ মুক্ত হবে না, এই কথা আজ দিবালোকের মতো সত্য ও স্পষ্ট। তা যদি আমরা পারি, তাহলে সেটাই হবে মানুষের সত্যিকার মুক্ত ইতিহাস। যেখানে প্রকৃতিকে জয় করা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজ-রাষ্ট্র ও রাজনীতি নির্মাণই হবে সভ্যতার নতুন দিশা। সেই সভ্যতা নির্মাণের কাজ আর জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদ মোকাবেলা তাই একই সংগ্রামের এপিঠ-ওপিঠ। আজকের দুনিয়ায় বিশ্বমানবতাকে সেই সংগ্রামের ডাক সেই প্রকৃতিই পাঠাচ্ছে। এটাই নয়া জামানায় পরিবেশ ও মানুষের মুক্তির রাজনীতি। তাই এ

পিঠের মানুষ অপর পিঠের সংগ্রামের প্রয়োজনটা যত দ্রুত বুঝবে, ততই সেই মুক্তি ঘনিয়ে আসবে। তখনই কেবল শুরু হবে মানুষ ও প্রকৃতির মৈত্রীর যৌথ ইতিহাস, যে মানুষ নিজেই প্রকৃতির অংশ এবং যে প্রকৃতি মানুষের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও মিলনের লীলায় লীলায়িত।

[লেখক: প্রাবন্ধিক, সংগঠক। সাংবাদিক, দৈনিক প্রথম আলো।]

প্র ব ন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তন: জনমত কোন দিকে?

মো. আ ব্দু ল আ উ য়া ল

'বি'শ্ব-জলবায়ু পরিবর্তন' বিষয়টির একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তো আছেই কিন্তু আমরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকে না গিয়ে যদি সাধারণ জীবনযাপনের মধ্যে যে ব্যবহারিক দিকটি রয়েছে– সেদিকে তাকাই, তাহলেও বিশ্ব জুড়ে জলবায়ুর যে পরিবর্তন ঘটেছে সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। যা সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যই আতঙ্কজনকভাবে সবার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। আমরা যদি চলতি বছরটির কথাই ধরি তাহলে দেখব পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তন চোখে পড়বার মতো। যেমন সারা ইউরোপ জুড়ে এ বছর যে পরিমাণ ঠাণ্ডা পড়ল ও শৈত্য-প্রবাহ হল; এটা তো অতীতের যে কোনো সময়ের রেকর্ড অনুসারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। গোটা ইউরোপে এরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। সেখানে এতটাই দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রাত্যহিক জীবনযাপনের ওপরও মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। সেখানে শুধু যে ঠাণ্ডা বা সাধারণ তুষারপাত হয়েছে তা নয়, বরং প্রচণ্ড তুষারঝড়ও হয়েছিল। সরকারি অফিসগুলো বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল, মার্কেট ও দোকানপাট অধিকাংশ বন্ধ রাখতে

হয়েছিল। ফলে অফিসের কাজকর্ম বাসায় বসে করতে হয়েছিল। এখন আমাদের প্রশ্ন হল জলবায়ুর এমন অবস্থা হল কেন?

কিছুদিন পূর্বে পশ্চিম বাংলায় চুয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা হল এবং সেখানে মানুষজন মারাও গেল। বাংলাদেশেও তাপমাত্রা ভীষণরকম বেড়ে গেছে; আর একই দিনে কখন শীত কখন গরম পড়বে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সন্ধ্যার সময় গরমে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে আবার সেই রাতের শেষভাগে শীতের প্রকোপে গায়ে লেপ-কাঁথা দিতে হয়। গ্রীষ্মকালে গরমের প্রচণ্ডতার কারণে হিটস্ট্রোকে লোকজন মারা যাচ্ছে আবার শীতকালে শীতের প্রচণ্ডতার কারণেও লোকজন মারা যাচ্ছে। ইউরোপের জলবায়ুর মতোই আমাদের এই অঞ্চলের জলবায়ু নিয়েও প্রশ্ন জাগে, এরকম হল কেন?

আমরা প্রকৃতির সঙ্গে যেভাবে বৈরী আচরণ করছি আসলে তার ভেতরেই এর কারণটি নিহিত আছে। আমরা যদি নিজেদের কাছেই প্রশ্ন রাখি যে, আমরা প্রকৃতির সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করছি? আমরা কি যথাযথ আচরণ করছি নাকি আমাদের আচরণের মধ্যে কোথাও সমস্যা আছে? যদি আমাদের বিবেক, নৈতিকতা ও যুক্তিবোধ দিয়ে মনে হয় আমরা যথাযথ আচরণ করছি না, তাহলে আমাদের বুঝে নেয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, প্রকৃতির সঙ্গে এই বৈরী আচরণের মধ্যেই জলবায়ুর এই ভারসাম্যহীনতার বিষয়টি লুকিয়ে আছে।

চলতি বছরে বাংলাদেশের জলবায়ুর কথা যদি ধরি তাহলে দেখা যাবে– বৈশাখ মাস চলে যাচ্ছে অথচ এখনো কোনো বৃষ্টিপাত হল না, ফলে কৃষিপ্রধান এই দেশটির মাঠের পর মাঠ ফসল পুড়ে গেছে। যার প্রভাব জাতীয় অর্থনীতির ওপর এসে পড়বে, সাধারণ মানুষের জীবনেও এর বিরূপ প্রভাব এসে পড়বে। সুতরাং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে শুধু একটু বেশি ঠাণ্ডা বা একটু বেশি গরম লাগল তা কিন্তু নয়। জলবায়ু মানে কিন্তু একটি দেশের অর্থনীতি এবং সেদেশের মানুষের অস্তিত্ব। অর্থাৎ জলবায়ু ঠিক না থাকলে বাংলাদেশের মতো কৃষিপ্রধান একটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে ভীষণভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

খরা মৌসুমে বাংলাদেশের অনেক জায়গাতেই সমস্ত পুকুরগুলো শুকিয়ে যায়, খাল-বিল-ঝিল শুকিয়ে যায় এমনকি অগভীর ও গভীর নলকূপেও পানি পাওয়া যায় না। এতে করে চাষবাসের প্রয়োজনীয় পানি পাওয়া যায় না। যা চাষাবাদ ও স্বাভাবিক জীবনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। আর পুকুর শুকিয়ে যাওয়া কিংবা নলকূপের পানি না-পাওয়ার কারণ হল ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া। যা নানাভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমুদ্রের উপকূলবর্তী দেশ হিসেবে এ-দেশ পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যেমন আছে আবার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় এখানে মরুকরণের সম্ভাবনাও কম নয়।

আমার লেখায় ঘুরেফিরে বারবার সিঙ্গাপুরের কথা আসে। সেখানেও বিল্ডিং হয়েছে আর ঢাকা শহরও বিল্ডিং-এ ছেয়ে গেছে। কিন্তু এই দুই জায়গার পার্থক্যটা কী?

সিঙ্গাপুর শহর হয়েও যেন সবুজ এক বিশাল গ্রাম আর ঢাকা শহরের কোথাও কোনো গাছ নেই, পানি নেই– ঢাকা এক পরিকল্পনাহীন ইটের জঙ্গল। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ কী সেটা আমাদের পরিকল্পনাহীনতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তাছাড়া সমুদ্র উপকূলে আমাদের অবস্থান; সমুদ্র তলদেশ জেগে উঠছে ক্রমেই; সেদিক থেকে সব কিছু মিলিয়ে আমাদের বিপদ অক্টোপাসের মতো ধেয়ে আসছে। এই জাতিকে কে বাঁচাবে! যাদের নিজেদের সম্পর্কেই ন্যূনতম দায়িত্ববোধ নেই, সেই জাতির যা হবার তাদের তো তা-ই হবে।

তবে সিঙ্গাপুর যেহেতু বিশ্বের বাইরে নয়, তাই বিশ্বের জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রভাব সিঙ্গাপুরে কিছুটা হলেও পড়েছে। সিঙ্গাপুর নিজের চেষ্টায় সেখানকার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও নিচে নামিয়ে এনেছিল কিন্তু অন্যান্য দেশের অতি কার্বন নিঃসরণের কারণে সিঙ্গাপুরের জলবায়ুও ইদানিং কিছুটা প্রভাবিত হতে দেখা যায়। যেই সিঙ্গাপুরকে "গার্ডেন-সিটি" না বলে বলা হয় "সিটি ইন এ গার্ডেন", সেই সিঙ্গাপুরকে জলবায়ুজনিত কারণে ক্রমাগত বেশ কিছুদিন বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকতে হয়। বৃষ্টির অভাবে ইদানিং তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি হতে দেখা যায়। এ সবের জন্য সিঙ্গাপুর কোনোভাবেই নিজে দায়ী নয়, দায়ী অতি কার্বন নিঃসরণকারী দেশগুলোই।

সারা পৃথিবীতেই এক শ্রেণীর মানুষ ও প্রতিষ্ঠান দ্রুত ও মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে উন্নয়ন ঘটাতে গিয়ে পরিবেশের প্রতি ন্যূনতম যত্নশীল হওয়ার বিষয়টি তারা আর মনে রাখতে চাইছে না। মানুষের কাণ্ডজ্ঞানহীন সীমাহীন উন্নয়ন প্রক্রিয়াই প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতার প্রধান কারণ। আমরা কী করব আর আমাদের কী করা উচিত নয়– মানুষ হিসেবে এই বিষয়টিই আমরা ভুলে বসে আছি। মানুষ নাকি সৃষ্টির সেরা জীব। এই কথাটির অর্থ কি এই যে অন্যসব সৃষ্টির ওপর মানুষ তার নিজের স্বার্থে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে? মানুষ তার ক্ষমতা দিয়ে নামেমাত্র মানুষ হয়েছে কিন্তু সার্বিক বিচারে মানুষ পশুর চেয়েও হিংস্র এবং আগ্রাসী। কেননা হিংস্র প্রাণীরাও তাদের প্রয়োজনের অধিক খাদ্য শিকার করে জমিয়ে রাখে না বরং যখন যেটুকু প্রয়োজন তারা সেটুকুই শিকার করে। কিন্তু মানুষ? মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর পরও এত বেশি অতিরিক্ত সম্পদ জমিয়ে রাখে যা শুধু তার ভোগবিলাসিতার কাজে আসে। সুতরাং সেই ভোগবাদী পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেণী অন্যসব প্রাণী ও প্রাকৃতিক উপাদান-এর ওপর অবিচারমূলকভাবে প্রভাব ফেলছে। তারই ফলে বিশ্বের জলবায়ুর ওপরও এর নেতিবাচক প্রভাব চরমভাবে এসে পড়ছে। জলবায়ুর ওপর এই প্রভাব একদিনে পড়েনি বরং তা শত শত বছরের অপরিকল্পিত ও অতি ভোগবাদী জীবনযাপনের কারণে এসে পড়েছে।

যেমন উন্নত দেশের কোটি কোটি কারখানার কালো ধোঁয়া, কোটি কোটি গাড়ির ধোঁয়া বা কার্বন শত শত বছর ধরে বাতাসে নিঃসরিত হয়েছে। মাটির নিচ থেকে বেহিসেবির মতো পানি তুলে আনা হয়েছে। মাটির নিচ থেকে যথেচ্ছভাবে তেল-গ্যাস-

কয়লা ইত্যাদি তুলে এনে সেগুলো জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে বাতাসের মধ্যে যুগের পর যুগ কার্বন নিঃসরণ করা হয়েছে। ইত্যাদি কারণে জলবায়ু দূষিত হয়েছে। এছাড়া এমন সব গাছ ছিল যা প্রকৃতিবান্ধব হিসেবে কাজ করত, সেই সব গাছ ধ্বংস করে এমন সব গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে যা প্রকৃতিবান্ধব তো নয়ই বরং মারাত্মকভাবে সেগুলো প্রকৃতি ধ্বংসকারী।

ফলে কালে কালে, যুগে যুগে, শত শত বা হাজার বছর ধরে জলবায়ু ক্ষেত্রে এইভাবে বিষক্রিয়াগুলো ঘটেছে।

সে কারণে পৃথিবীর সর্বত্র আজ জলবায়ু চরমভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখেছি যে ছয়টি ঋতু সমান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আবির্ভূত হত। কিন্তু এখন আমরা কী দেখছি? প্রকৃতির মধ্যে এই যে আবহাওয়া ও জলবায়ুর বিপর্যয় সেটা কী? আমরা কি ব্যস্ত জীবনের মধ্যে একটু অবসর করে নিয়ে এ বিষয়ে এতটুকু ভাবনা-চিন্তা করি? শীতকাল এসেই যেন চলে যায়; বর্ষাকালে পানি সে-রকম আসেই না অথবা বন্যায় সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়; গ্রীষ্মকালে মাত্রাতিরিক্ত গরম। এই যে তিনটি ঋতুর কথা বললাম, এর বাইরে শরৎ, হেমন্ত এবং বসন্তের যেন অস্তিত্বই টের পাওয়া যায় না। কিন্তু এমনটি হল কেন? এটা কি শুধুই প্রাকৃতিক নিয়মের কারণে হয়েছে নাকি প্রকৃতির ওপর মানুষের যে অত্যাচার সে বিষয়টিও দায়ী? সারা পৃথিবীতে গত পঞ্চাশ-একশ বছরে মানুষ যে পরিমাণ ভোগবাদী হয়েছে এবং সেটা হতে গিয়ে প্রকৃতির ওপর যে অত্যাচার করেছে সেটা মানুষেরই অস্তিত্বের জন্য আজ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রাসঙ্গিক কারণে উল্লেখ করা দরকার যে, আমাদের গাড়ি, বাড়ি, ফ্রিজ, টিভি, উড়োজাহাজ সবই দরকার। কিন্তু কতটা দরকার? এক শ্রেণীর মানুষের বল্গাহীন ভোগবিলাসিতার কারণে এই সব প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে অতি ভোগের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। প্রশ্ন হল একজন মানুষের কয়টা গাড়ি দরকার? একই জীবনে কতগুলো মডেলের গাড়ি দরকার? কতটা আভিজাত্যপূর্ণ গাড়ি দরকার? ইত্যাদি প্রশ্নগুলো কি উন্নত দেশের অতি ভোগবাদী মানুষগুলো ভেবে দেখেছেন? তারা ভাবেননি বলেই পৃথিবীর জলবায়ুর আজ এই দশা হয়েছে। মোট জনসংখ্যার মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বছরে যেখানে যুক্তরাষ্ট্র ১৮.৬৭, কানাডা ১৭.৪৪ টন সেখানে বাংলাদেশে বছরে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ মাত্র ০.২৫ আর ভারতে ১.৩ টন। সুতরাং বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মোটেও আমরা নিজেরা দায়ী নই। বরং উন্নত, উচ্চাভিলাষী দেশগুলোই এককভাবে দায়ী। অথচ তারা আমাদের দায়ী করবার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এর সমাধান কি ক্ষতিগ্রস্তদের অর্থদণ্ডের মাধ্যমে কিংবা ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে হওয়া ঠিক? যে কারণে এই কার্বন বাতাসে নিঃসরিত হয়ে জলবায়ুর বিপর্যয় ঘটাচ্ছে সেই কারণকে প্রতিহত না-করে শুধু অর্থদণ্ড বা ঋণ-সুবিধা এর সমাধান হতে পারে না। সে কারণে বিশ্বজুড়েই আজ এ-বিষয়ে জনমত তৈরি হওয়া দরকার।

কিন্তু বিশ্বজনমত আজ কোন পথে? বাংলাদেশের জলবায়ু বিপর্যয়ের জন্য বাংলাদেশ প্রধানত দায়ী নয় এবং যারা প্রধানত দায়ী– সে-সব দেশসহ কোপেনহেগেনে বিশ্বসম্মেলনে সবাই বসেছিল। যদিও এভাবে এত বড় সম্মেলনের নজির এই প্রথম সৃষ্টি হল। সেদিক থেকে হয়তো এর একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য থাকতে পারে, কিন্তু এই সম্মেলন থেকে বিশ্বজুড়ে কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের কোনো উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। ফলে পৃথিবীর মানুষের সামনে জলবায়ু বিপর্যয়ের প্রতিকারের জন্য এখনো পর্যন্ত কোনো উপায় খোলা নেই। তবে এই বিপর্যয় যে রোধ করা দরকার সে-ব্যাপারে অন্তত বিশ্বজুড়েই ব্যাপক জনমত তৈরি হচ্ছে।

[লেখক: পুরকৌশলী (সিভিল ইঞ্জিনিয়র)। প্রবন্ধ/নিবন্ধকার। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়রস লি.। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব।]

জলবায়ু পরিবর্তন: বাংলাদেশে এর প্রভাব, প্রস্তুতি ও করণীয়

মো. জ য় না ল আ বে দী ন

কোনো নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার বহুবিধ অবস্থার গড়পড়তা হিসাবকে 'জলবায়ু' বলে। তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, বায়ু, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি আবহাওয়ার অন্তর্ভুক্ত। এবং এইগুলোর একটি নির্দিষ্ট এলাকার গড়কেই আমরা জলবায়ু বলে থাকি। এ বিষয়ে অক্ষাংশের গুরুত্বও যথেষ্ট। একটি এলাকার জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ধারণে সহায়তাকারী প্রভাবগুলোর মধ্যে (১) এলাকাটির অবস্থান বা সমুদ্র থেকে এর দূরত্ব (২) সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা (৩) ভূ-সংস্থান (৪) বায়ুপ্রবাহের দিক (৫) সামুদ্রিক স্রোত এবং (৬) ঘূর্ণিঝড়– এই প্রভাবগুলোর কারণে পৃথিবীর একেক এলাকার জলবায়ু একেক রকম হয়ে থাকে। অক্ষাংশ এবং এই প্রভাবগুলোর ওপর ভিত্তি করে জলবায়ুকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগগুলো হচ্ছে: মহাদেশীয় জলবায়ু, সামুদ্রিক জলবায়ু, উপকূলীয় জলবায়ু এবং পর্বতমালা ও মালভূমির জলবায়ু।

পৃথিবী ও সূর্যের দূরত্ব সারা বছর সমান থাকে না। তাই পৃথিবীপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও সারা বছর একই সমান থাকে না। আহ্নিক গতির ফলে দিন ও রাত্রি হয়। বার্ষিক গতির ফলে ঋতু বদলায়। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে ঋতু বদলায় একইভাবে। তবে উভয় গোলার্ধের ঋতুকাল বিপরীত। অর্থাৎ উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পর বিভিন্ন বায়ুস্তরে সূর্যের যে কিরণ প্রবেশ করে, জলবায়ুর ওপর তার সূক্ষ্ম প্রভাব পড়ে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ও বায়ুস্তরের মধ্যে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার কারণে সৌরতাপেরও পরিবর্তন ঘটে। পৃথিবী যে তাপশক্তি বিকিরণ করে তার বহুলাংশই মেঘ ও জলীয় বাষ্পে আটকা পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে এর অনেকাংশ অবশ্য পৃথিবীর বুকে আবার ফিরে আসে। এভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি নির্দিষ্ট মান বজায় থাকে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলে কয়েক প্রকার বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এগুলো হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু ও আকস্মিক বায়ু। আয়ন বায়ু, প্রত্যয়নবায়ু ও মেরুপ্রবাহ হচ্ছে নিয়ত বায়ুর আওতাভুক্ত। তেমনি সাময়িক বায়ুপ্রবাহের আওতাভুক্ত হচ্ছে মৌসুমি বায়ু, স্থল বায়ু ও সমুদ্র বায়ু। আকস্মিক বায়ুর আওতায় পড়ে কালবৈশাখি, আশ্বিনের ঝড়, হারিকেন, টাইফুন, টর্নেডো, ঘূর্ণিঝড় ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত। নিয়ত, সাময়িক ও আকস্মিক বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

দুই

জলবায়ু পরিবর্তন

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি একসময় মানুষের চিন্তাজগতের বাইরে ছিল। যদিও প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত জলবায়ু সবসময়ই পরিবর্তিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কারণগুলো হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইডসহ বড় বড় আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সূর্যের আলো ও তাপ নির্গমনের তারতম্য এবং সূর্য ও পৃথিবীর অবস্থান পরিবর্তন। বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির নানা বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বে জলবায়ুর পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে আবার অনেক প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। এই ধরনের বড় বিপর্যয়ের ফলে পৃথিবীর মানচিত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সমুদ্র পর্বতে পরিণত হয়েছে– পর্বতের জায়গায় সমুদ্র সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনে মানুষ জাতির তেমন কোনো ভূমিকা শিল্পবিপ্লবের পূর্বে ছিল না। মানুষ-সৃষ্ট বড় বড় শিল্প, কল-কারখানা, গাড়ি, উড়োজাহাজ প্রতিনিয়ত আকাশে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গত করছে। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা অস্বাভাবিকহারে বেড়েই চলেছে। তাছাড়া বিশ্বে মানুষ বৃদ্ধির ফলে বনভূমি উজাড় হওয়ায় গাছ যে পরিমাণ অক্সিজেন ছাড়ত ও কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্রহণ করত তা হ্রাস পেয়েছে। এর ফলে বিশ্বব্যাপী জলবায়ুতে ব্যাপক পরিবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে– যা মানবসভ্যতা ও বিশ্বের সার্বিক পরিবেশের জন্য বিরাট হুমকি স্বরূপ। জলবায়ুর এই পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের নানা

দেশে ইতিপূর্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়ে গেছে। যেমন, যে দেশে ইতিপূর্বে বন্যা হত না সে দেশে বন্যা হচ্ছে। এর সর্বশেষ উদাহরণ হিসেবে গত ২৭ মে ২০১০ তারিখের দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি ও ক্যাপশন পাঠকদের জানার জন্য তুলে ধরতে চাই। পত্রিকায় পাতাটিতে মুদ্রিত ছবি দেখে প্রথমে আমি ভেবেছিলাম বাংলাদেশের কোনো এলাকার বন্যার ছবি 'আন্তর্জাতিক খবরের পাতায়' 'প্রথম আলো' ভুল করে ছেপেছে। কিন্তু ছবির ক্যাপশন পড়ে আমার ভুল ভাঙে। তাতে লিখা ছিল "মধ্য ইউরোপে কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে অনেক জায়গায় বন্যা দেখা দিয়েছে। এতে কমপক্ষে ১৪ জন মারা গেছে। হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পোল্যান্ড। গতকাল মধ্য পোল্যান্ডের উইসলা নদীর তীরবর্তী প্লাবিত এলাকার ওপর দিয়ে একটি হেলিকপ্টারকে টহল দিতে দেখা যায়– এএফপি"। আমার ধারণা পোল্যান্ডের এ বন্যা বিশ্ব আবহাওয়া পরিবর্তনের ফল।

তিন

প্রায় শত বছর আগে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জানা গেলেও গত চার দশক ধরে সচেতন বিশ্ববাসী এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে প্রথমে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। তাই ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে রিওডি জেনিরোর গ্লোরিয়া সমুদ্র সৈকতে প্রতিবাদী মানুষ মার্কিন প্রেসিডেন্ট জজ বুশের বিরুদ্ধে ফেটে পড়ে। সম্মেলনে বিশ্বের বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমানোর সিদ্ধান্ত হয়। গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মানবজাতিকে সচেতন করার জন্য আন্তর্জাতিক ফোরাম গঠনেরও কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ মাপা শুরু হয়েছে ১৯৫০ সাল থেকে। এ সংক্রান্ত তথ্য থেকে জানা যায়– ১০০০ বছর পূর্ব থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় সমান থেকেছে ২.৮০ পিপিএম (পার্ট পার মিলিয়ন)। এই সময়ে উত্তাপও প্রায় সমান থেকেছে ১৩.৮ সেলসিয়াস। ১৮০০ সালের পর থেকে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড ও উত্তাপ ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। এটা শিল্পবিপ্লবের জন্যই ঘটেছে। অতি সম্প্রতিকালে এ বৃদ্ধির হার আরো বেড়েছে। ২০০৭ সালে হয়েছে যথাক্রমে ৩.৫০ পিপিএম ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই বৃদ্ধির হার কম মনে হলেও তাৎপর্য অনেক।

দ্রুত গলছে আইসল্যান্ডের বরফ

গত ৩১ মে, ২০১০ দৈনিক 'আমার দেশ' পত্রিকায় বিবিসি'র বরাত দিয়ে প্রকাশিত খবরে বলা হয়– নতুন গবেষণায় জানা গেছে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার কারণে আইসল্যান্ডের বরফ দ্রুত গলছে। পাশাপাশি তলদেশের মাটিও উপরে উঠে আসছে আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতেই। গবেষক সিমন উডোউইনস্কি জানিয়েছেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির কারণে কানাডার উত্তরে গ্রিনল্যান্ড দ্বীপে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। আর এ

প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ছে গ্রিনল্যান্ডের দুই কিলোমিটার ঘন চলমান হিমবাহগুলোর ওপর। প্রধান গবেষক টিম ডিক্সন জানিয়েছেন, 'গত কয়েক বছরে নিশ্চিতভাবেই জানা গেছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনই গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলার প্রধান কারণ। কিন্তু বরফ গলার হার এখন এতটাই বেশি যে, বরফের তলদেশের মাটি এখন অনেক দ্রুতই দৃশ্যমান হচ্ছে'। এদিকে সর্বশেষ গবেষণায় জানা গেছে, কিছু কিছু উপকূলীয় অঞ্চল প্রতি বছর প্রায় এক ইঞ্চি করে উঁচু হচ্ছে। নেচার জিওসায়েন্সের গবেষণা অনুযায়ী, উপকূল অঞ্চলের উচ্চতা বৃদ্ধি যদি এই হারে চলতেই থাকে তবে ২০২৫ সাল নাগাদ একই অঞ্চল বছরে দুই ইঞ্চি করে উঁচু হবে। তবে গ্রিনল্যান্ডের বরফ গলার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা খুব দ্রুত বাড়ছে বলেই বিজ্ঞানীরা এ বিষয়টিকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়ার বিশ্ব জলবায়ুর আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ বৃদ্ধির ফলে ভূ-মণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে আদিকাল থেকে জমে থাকা বরফখণ্ড গলতে শুরু করেছে। সম্প্রতি উপগ্রহ থেকে গত কয়েক বছরে তোলা ছবি থেকে স্পষ্ট দেখা গেছে যে-প্রতি বছরই এই বরফের এলাকা ছোট হয়ে আসছে। এই বরফগলা পানি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়াচ্ছে– যার প্রভাবে বাংলাদেশের কৃষি, পরিবেশ, অর্থনীতি, আবাসন, জনস্বাস্থ্য, জনজীবনসহ সামগ্রিক বিষয়ে বিপর্যয় শুরুর প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন– বিশ্ব বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা না গেলে ২০২০ সালের মধ্যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি বিক্রমপুর পর্যন্ত এসে যাবে এবং উপকূলবর্তী জেলাসমূহ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। উপগ্রহের মাধ্যমে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি মাপার এক পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় ১৯৯২ সাল থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ২.৮ মি.মি হারে বাড়ছে। বর্তমানে এই বছরে উচ্চতা ৪ মি.মি-এ এসে দাঁড়িয়েছে। খুলনায় পানির এই উচ্চতা ৫.১৮ মি.মি. পাওয়া গেছে। তবে এর পুরোটাই বরফ গলার কারণে হয়েছে তা নয়, এর বেশির ভাগই অধিক তাপে পানি আয়তনে সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে হয়েছে; যা আবার ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি জোগায়। তাই ১৯৭০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত এক জরিপে দেখা গেছে যে এ সময়ে তীব্রতর ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ১৬ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে। সর্বশেষ এ সংক্রান্ত একটি তথ্য দৈনিক 'কালের কণ্ঠ' পত্রিকা গত ২৭ মে ২০১০ তারিখে প্রকাশ করেছে। পত্রিকাটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সূচক ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ ১০ দেশ সম্পর্কে যে প্রতিবেদন ছেপেছে তাতে বলা হয়েছে সবচেয়ে ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের পরে আছে ইন্দোনেশিয়া, ইরান, পাকিস্তান, ইথিওপিয়া, সুদান, মোজাম্বিক, হাইতি, ফিলিপাইন ও কলম্বিয়া। কালের কণ্ঠের উক্ত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় "প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিশ্বে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে বাংলাদেশ।"

চার

গত ৩০ বছরে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এ দেশে প্রায় দুই লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যা একক দেশ হিসেবে বিশ্বে সর্বোচ্চ অবস্থানে রয়েছে। গত ২৫ মে ২০১০ ব্রিটিশ গবেষণা সংস্থা ম্যাপলক্র্যাফট প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ পায়। সংস্থার প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি সূচক বা এনডিআরআইয়ে বাংলাদেশকে রাখা হয়েছে সর্বোচ্চ ঝুঁকির ১৫ দেশের তালিকায় ১ নম্বরে।

জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের ষড়ঋতুতে গত কয়েক বছর যাবৎ পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলেই গত কয়েক বছর ধরে পৌষ-মাঘ মাসের শীতকাল ক্ষণস্থায়ী হচ্ছে। শীত কখন আসে কখন যায়, তা টের পাওয়া যায় না। আগে দেখা যেত জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে অথবা আষাঢ় মাসের শুরুতে বর্ষার পানি পুকুর, ডোবা, নালা ও খাল ডুবিয়ে দিত। যা এখন জ্যৈষ্ঠ মাসেই দেখা যাচ্ছে। গরমের দিনেও এখন ভোররাতে শীত লাগে এবং ঘন কুয়াশায় দেশ ছেয়ে থাকে।

আমাদের এ অঞ্চলের জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে হিমালয় পর্বত ও তাতে জমে থাকা হিমবাহের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বিশ্ব-তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া হিমালয় অঞ্চলে দারুণভাবে প্রভাব ফেলছে। কিছু দিন পূর্বে বাংলাদেশ ঘুরে গেলেন জাপানের বিখ্যাত পর্বতারোহী নঘুচীক্যান। তিনি হিমালয় পর্বতের বিভিন্ন অংশ /এলাকা ৪ বার সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন এবং হিমবাহের বিভিন্ন অবস্থা তাঁর স্থির ও মুভি ক্যামেরায় ধারণ করে রেখেছেন। হিমালয়ের হিমবাহের ওপর তাঁর সংগ্রহে গত ১০ বছরের তথ্য রয়েছে। বিক্রমপুরের পর্যটক-উদ্যোক্তা শাহ্ আলমের সাথে আলাপকালে নঘুচীক্যান তাঁর ধারণকৃত হিমালয়ের হিমবাহের বিভিন্ন বছরের ছবি ও তথ্য-উপাত্ত আমাকে দেখিয়ে বলেছেন যে বিশ্ব তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে হিমালয়ের হিমবাহের উচ্চতা ক্রমেই কমে আসছে। এ প্রভাবের ফল দেখতে হিমালয় থেকে প্রবাহিত প্রধান নদী যমুনা ও পদ্মা তিনি সরেজমিনে ভ্রমণ করেছেন। যমুনা ও পদ্মার বিভিন্ন স্থানের চর দেখেছেন ও চরাঞ্চলের মানুষদের সাথে আলাপ করে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে– হিমালয়ের হিমবাহ পূর্বের তুলনায় বেশি হারে গলার ফলে এ সব অঞ্চলে নদী ভাঙন, চর জাগা ও গরমের কালে নদীর পানি পূর্বের তুলনায় বেশি শীতল অনুভব হচ্ছে।

সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি সমুদ্রের জোয়ার-ভাটায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে। কুতুবদিয়া, মহেশখালি, সন্দ্বীপসহ ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা জেলার উপকূলীয় এলাকায় অস্বাভাবিক জোয়ারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ফসলের ক্ষেত, পুকুরে মিঠাপানির মাছ ও গবাদিপশু। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ ও রাজশাহী বরেন্দ্র এলাকার কৃষিজমিতে কয়েক মাইলব্যাপী যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে তা-ও

আবহাওয়া পরিবর্তনের ফল বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রপাতেও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিশ্বের তাপমাত্রা সহনীয়-পর্যায়ে হ্রাস করতে না পারলে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের শীর্ষে থাকবে বাংলাদেশ। এতে আমাদের কৃষিব্যবস্থা, পানিসম্পদ, মানুষ ও পশুপাখির স্বাস্থ্য, মৎস্যসম্পদ, খাদ্য-নিরাপত্তা, পরিবেশ, অবকাঠামোসহ দেশের সীমানায় এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।

পাঁচ

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও করণীয়

বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য বাংলাদেশ পিছিয়ে নেই। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। গত ৭-১৮ ডিসেম্বর ২০০৯ ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ১৯২টি দেশের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধিদের সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে করণীয় বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। এতে বাংলাদেশ থেকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল। এ দলে মন্ত্রী, আমলা, সাংবাদিক, বিশেষজ্ঞ ও এনজিও প্রতিনিধিরা ছিলেন। সম্মেলনে ভাষণ দানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী ধনী শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসমূহ। জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহকে সহায়তা করার জন্য তিনি একটি তহবিল গড়ার প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশের ভূমিকা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে। এই সম্মেলনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ বিশেষ করে দ্বীপরাষ্ট্র, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখার প্রস্তাব করে। অপর দিকে জি-৮ শিল্পোন্নত দেশগুলো চায় তা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে রাখতে। এ সম্মেলনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত বিশ্ব তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের কৃষি-ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনার ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টেকসই কৃষিপ্রযুক্তি গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ জন্যে বিভিন্ন শস্যের উদ্ভাবন, বিশেষ করে লবণাক্ত পানিতে টিকে থাকতে পারবে এমন বীজ উদ্ভাবন, পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য উৎপাদনে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খাদ্যনীতি গবেষণা ইনস্টিটিউট (IFPRI) ও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউট (BIDS)-এর সহায়তায় খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের খাদ্যবিভাগ আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিনিয়োগ ফোরামের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক-এর বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত জাতীয় খাদ্য-নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্ব পেয়েছে।

পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটে বনায়ন কর্মসূচিসহ নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বনায়ন করার পরিকল্পনা। এর অংশ হিসেবে চলতি অর্থ বছরে ৪ হাজার ৩১৪ হেক্টর এলাকা বনায়ন, ২ হাজার ৩৫৫ কিলোমিটার এলাকায় স্ট্রিপ বাগান সৃজন এবং ২৩ লাখ চারা রোপণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু গত ১০ মাসে লক্ষ্যমাত্রার ২৫ ভাগ কাজও সম্পন্ন হয়নি বলে বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনে পরিবেশ বিপর্যয় প্রতিরোধে সুন্দরবন এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় চলতি অর্থ বছরের বাজেটে ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও তার বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়নি বলে ৩০.০৫.২০১০ তারিখের দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে জানা যায়।

ছয়

পরিবেশ ও বন প্রতিমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ গত ২৯.০৫.২০১০ তারিখে তাঁর দপ্তরে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন যে, বহুপক্ষীয় দাতাদের দেয়া সহায়তা তহবিল (মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড (MDTF) এখন থেকে বাংলাদেশে জলবায়ু-ঝুঁকি মোকাবেলা তহবিল (BCCRF) নামে কাজ করবে। মন্ত্রণালয়ের সচিব মিহির কান্তি মজুমদার দৈনিক 'প্রথম আলো'কে বলেন– জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বৈশ্বিক জোটের (GCCA) দুই দিনের এশীয় সম্মেলন ৩০ মে, ২০১০ ঢাকায় শুরু হবে। এ সম্মেলন শেষে তহবিলের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় স্বল্পোন্নত দেশ ও ছোট দ্বীপদেশগুলোর অভিন্ন অবস্থানপত্র তৈরির লক্ষ্য সামনে রেখে গত ৩০.০৫.২০১০ তারিখে ঢাকায় শুরু হওয়া দু'দিন ব্যাপী সম্মেলনে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভুটান, কম্বোডিয়া, লাওস, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, নেপাল ও ইয়েমেনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EEU) সহায়তায় বাংলাদেশ সরকার এ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। সম্মেলন উদ্বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলায় কোপেনহেগেন চুক্তি অনুযায়ী ৩ হাজার কোটি (৩০ বিলিয়ন) মার্কিন ডলারের আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহবান জানান। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ে মেক্সিকোর কানকুনে অনুষ্ঠিতব্য সিওপি-১৬ সম্মেলনে আশাব্যঞ্জক ফলাফল বয়ে আনবে বলেও প্রধানমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন।

খাদ্য-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ধান, গম, তেল, মশলা, ফল-মূল, শাক-সবজি উৎপাদন করতে হবে জাতীয় চাহিদা নিরূপণ করে। দেশের অঞ্চল ভেদে আবহাওয়া, মাটির ধরন বিবেচনায় রেখে যে অঞ্চলে যে ফসল অধিক উৎপন্ন হবে সে ভাবে কৃষি-উৎপাদন ব্যবস্থাপনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। কৃষি-উৎপাদনের স্বার্থে কৃষিজমি অকৃষি কাজে ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বর্তমানে প্রতি

বছর ১% হারে কৃষিজমি বেহাত হয়ে অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী ১০০ বছরে বাংলাদেশে কৃষিজমি শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছবে।

গবাদি পশু-পক্ষী যথা গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস-মুরগি, কবুতরের চাষ বৃদ্ধি করতে হবে। যাতে দুধ, মাংসের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভর করতে না হয়। মিঠা পানিতে মাছ চাষ বাড়াতে হবে। লবণাক্ত পানির উপযোগী মাছ চাষের পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে মিঠা ও লবণাক্ত পানির মাছ নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানিও করা যায়।

পানি ব্যবস্থাপনা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। বর্ষাকালে আমাদের নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-পুকুর, দিঘি, বৃষ্টি ও পাহাড়ের ঢলের পানিতে ভরে যায়। এ পানি ধরে রেখে শীতকালে জলসেচের মাধ্যমে প্রতিটি জেলার জমিতে ফসল ফলাতে হবে– যাতে এক ইঞ্চি আবাদযোগ্য জমি পতিত না থাকে। পানি ব্যবস্থাপনার জন্য নদী, খালের উপর নির্মিত সেতু, ব্রিজে বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্লুইজ গেট নির্মাণের পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতে হবে। জমির ফসল যাতে পাহাড়ি আগাম ঢলে ডুবে না যায় সে জন্য পাহাড়-সংলগ্ন জেলাসমূহে নদীর বাঁধ যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ সব বাঁধে ডুবো সড়ক নির্মাণ করতে হবে যাতে বাঁধ সহজে ভেঙে না যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সিডর, আইলা, লাইলার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি যাতে দ্রুত কাটিয়ে ওঠা যায় সে জন্য দুর্যোগ-ব্যবস্থাপনা আরো শক্তিশালী করতে হবে।

সাত

নদী-সমুদ্র ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দ্রুত পুনর্বাসন করতে হবে। সমুদ্র-উপকূলবর্তী জেলাসমূহের অধীন উচ্চতাসম্পন্ন বাস-উপযোগী গুচ্ছগ্রাম গড়ে তুলতে হবে যাতে ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে এ সব গ্রাম ডুবে না যায়। জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্যঝুঁকির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের পুষ্টির বিষয়টি প্রাধান্য দিতে হবে। এ জন্যে কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্সদের উপস্থিতি ও সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে হবে।

খাদ্যাভাস পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে। শুধু ভাত নয়, ভাত-বিকল্প আটা, আলু, ফল-মূল খেয়েও সুস্থভাবে বাঁচা যায়– তা জনগণকে অবহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে মসজিদের ইমামদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজে লাগানো যেতে পারে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতায় এ বিষয়টি থাকতে হবে। কৃষি-উপকরণে ভর্তুকি অব্যাহত রাখতে হবে প্রয়োজনে কৃষি-ভর্তুকির পরিমাণ বাড়াতে হবে। কৃষিঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং তা অতি সহজে দ্রুততার সাথে যথাসময়ে কৃষকদের হাতে পৌঁছানো নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্যে ব্যাংক-শাখাহীন প্রতি ইউনিয়নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের শাখা খুলতে হবে।

কৃষিঋণ বিতরণে অনিয়ম কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। ব্যাংকে সৎ ও যোগ্য নির্বাহীদের উচ্চ পদে পদোন্নতি দিতে হবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে আমরা পৃথিবী নামক গ্রহটির মানুষ। এই গ্রহকে টিকিয়ে রাখার জন্য পরিবেশ ও ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। পরিবেশের সবচেয়ে বড় বান্ধব বৃক্ষ। বৃক্ষ তথা বনভূমি উজাড় বন্ধ করতে হবে। পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কাজ থেকে মানবজাতিকে বিরত থাকতে হবে। তাহলেই বিশ্ব বাঁচবে। বিশ্ব বাঁচলে বাংলাদেশও বাঁচবে– আমরাও বাঁচব।

তথ্যসূত্র

১. শিশু বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী
২. জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ– ফেরদৌস আরা কবির
৩. দৈনিক প্রথম আলো ও দৈনিক কালের কণ্ঠ তাং ২৭.০৫.২০১০
৪. দৈনিক যুগান্তর তাং ৩০.০৫.২০১০

২৭.০৫.২০১০
ঢাকা।

[লেখক : মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।]

জলবায়ু সমস্যা ও তার সমাধান

শাহ আলম সারওয়ার

একটা সময় ছিল যখন বাংলাদেশের জলবায়ু অনুসারে বছরের সময়গুলোকে ছয়টি ঋতুতে ভাগ করা যেত। এখন আর সেই ভাগগুলো করা যাচ্ছে না। আগে শীতকালে শীত পড়ত, গ্রীষ্মকালে গরম পড়ত, বর্ষাকালে বৃষ্টি হত ইত্যাদি। এখন এমন হয়েছে যে, কখন শীত পড়বে কখন গরম পড়বে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। আবহাওয়া বা জলবায়ুর সব ক্ষেত্রেই একটা গোলমেলে ব্যাপার লক্ষ করা যাচ্ছে।

এমনকি একটি দিনের আবহাওয়া লক্ষ করলে দেখা যায়, সন্ধ্যায় হয়তো গরম পড়ছে, শেষ রাতে আবার শীত পড়ছে আবার দুপুরের দিকে হয়তো গরম পড়ছে। একই দিনের বিভিন্ন সময়ে তাপমাত্রার ভীষণ রকম তারতম্য ঘটে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিকভাবে দেখলে অনেক শিল্পসমৃদ্ধ দেশের অতি কার্বন নিঃসরণের বিষয়টি এসব সমস্যার পেছনে নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে বড় কারণ। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের দিকেও তাকাই তাহলে স্বল্প পরিসরে হলেও এই জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণ কিছুটা খুঁজে পাব। যেমন ঢাকা শহরকে আমরা সম্পূর্ণভাবে গাছশূন্য করে ফেলেছি। পুরো শহরটি যেন ইটের পরিত্যক্ত ভাটা। কেউ কেউ অবশ্য এই শহরকে ইটের জঙ্গলও বলেছেন। এর কোথাও পর্যাপ্ত গাছ নেই; একটু জলাধার নেই!

কথা হচ্ছে এমন একটি শহরে বাস করে আমরা কী ধরনের আবহাওয়া আশা করতে পারি? উন্নত দেশসমূহের অতি শিল্পায়নের কারণে জলবায়ুতে কার্বনের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত বেড়েছে– এটি যেমন ঠিক-একইভাবে আমরা শিল্পায়নের দেশ না-হয়েও নিজেরাই নিজেদের অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে আছি। যেমন নদীমাতৃক দেশ হওয়া সত্ত্বেও আমরা আমাদের নগীগুলো ড্রেজিং মেশিন দিয়ে কাটার ব্যবস্থা করছি না। ফলে নদীর নাব্যতা ও গতি আমরা ধরে রাখতে পারছি না। যার বিরূপ প্রভাব পড়ছে আমাদের আবহাওয়া এবং জলবায়ুর ওপর। সুতরাং কথা হল অন্য দেশগুলোকে তো দায়ী করবোই কিন্তু আমরা কি আমাদের কর্তব্যটুকু সঠিকভাবে পালন করছি? এক্ষেত্রে আমার মনে হয়, নিজেদের ভুলগুলো শেধরানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। তা না হলে এ সমস্যা ভবিষ্যতে আরও জটিল জায়গায় পৌঁছে যাবে; যা মোকাবেলা করার ক্ষমতা পরবর্তী জেনারেশনগুলোর না-ও থাকতে পারে।

দুই

সরাসরি এবং এককভাবে আমেরিকা বা ইউরোপের দেশগুলোকে আমি দায়ী করতে চাই না। সে-সব দেশের মানুষেরা বিলাসী জীবন-যাপন করে এটা ঠিক আছে। কিন্তু তাদের সেই যাপিত জীবন একদিনে তৈরি হয়নি। এর পেছনে ইতিহাস আছে, এর একটা বিশাল ধারাবাহিকতা আছে। দীর্ঘ ধারাবাহিক জীবনের নানা যুগ-কাল পার হয়ে তারা বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সুতরাং হঠাৎ করে তাদের বিলাসী জীবন শুরু হয়েছে সেটা বলা যাবে না। যে বিলাসী জীবন তারা যাপন করে সেটাকে তারা স্বাভাবিক জীবন হিসেবেই মনে করে। যাকে আমরা বিলাসী বলছি সেটা হয়তো তাদের জীবন যাপনের মান। সুতরাং সেই মান রক্ষা করতে গিয়ে অবশ্যই তাদের দেশে অনেক বেশি শিল্পায়ন ঘটেছে। আর এই শিল্পায়ন ঘটাতে গিয়ে শুরুতেই হয়তো এর খারাপ প্রভাবগুলো তারা বুঝতে পারেনি। তবে অবশ্যই অনেক বছর ধরে তাদের কারখানার কালো ধোঁয়া ও বিভিন্ন রাসায়নিক গ্যাস বাতাসে নিঃসরিত হয়েছে, সেই কার্বন গ্যাসই জলবায়ুর বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে পরবর্তীকালে চিহ্নিত হয়েছে। অবশ্য এটা মানুষ বুঝতে পেরেছে শিল্পায়ন শুরু করার অনেক পরে। যখন সে-দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে শিল্পের কারণে জলবায়ুর ক্ষতি হচ্ছে, তখন তারা চাইলেই মূহূর্তের মধ্যে কিন্তু শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিতে পারছে না। কারণ ইতোমধ্যে তারা ভীষণভাবে ঐ শিল্পের প্রতি নির্ভরশীল এবং শিল্পের পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তাদের সে নির্ভরশীলতা এবং অভ্যস্ততার পেছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস এবং ধারাবাহিকতা রয়েছে। সুতরাং হঠাৎ করে আইন করে, ভয় দেখিয়ে, শাস্তির ব্যবস্থা করে রাষ্ট্র নিজেও এই শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিতে পারবে না। অন্যদিকে ঐ দেশগুলোর রাষ্ট্রীয় চাপের বাইরে নিজেদের উদ্যোগেও নিজেদের কারখানাগুলো হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয়া সম্ভব হবে না।

তবে হ্যাঁ, তারা যে বিষয়টি এখন অনুধাবন করছে না এমন নয়। কেননা ইতোমধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে তাদের প্রাত্যহিক জীবনেও এর নানা রকম প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন শীতকালে এমন শীত ও শৈত্যপ্রবাহ থাকে এমনকি তুষার ঝড় হয়; যার ফলে স্বাভাবিক জীবনধারা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। তখন সরকারি ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়, বিমান ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল বন্ধ ঘোষণা করতে হয়। তখন ঘরে বসেই অনেক কাজ সারতে হয়। এতে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে অনেক আর্থিক ক্ষতিও হয়ে থাকে। এতে অর্থের ক্ষতি ছাড়াও অনেক সময় জীবনও বিসর্জন দিতে হয়।

সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ কিন্তু সবসময় প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছে। আমার ধারণা ইউরোপ-আমেরিকার মানুষের ওপর যখনই বড় ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলবে এবং তাদের অতি বিলাসী জীবনের কারণেই এগুলো হচ্ছে এটা তখন তারা বুঝতে পারবে– তখনই তারা ঐ বিলাসিতা হ্রাস করার কথা ভাবতে বাধ্য হবে।

আর জলবায়ু পরিবর্তন এখনো একটা বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয় হিসেবেই আছে। এটা তখনই সাধারণ মানুষের বিষয় হয়ে উঠবে যখন এর কারণে বড় ধরনের বিপর্যয় নেমে আসবে। তবে এটা ঠিক, কেউ তো আর বিপর্যয় ইচ্ছে করে ডেকে আনে না। অনেক বিপর্যয় আছে অনিবার্যভাবে নেমে আসে। জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণেও বড় ধরনের বিপদ যখনই নেমে আসবে তখনই ওরা ভারসাম্যপূর্ণ একটি উপায়ের দিকে অগ্রসর হবে। শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য কার্বন নিঃসরণকারী উৎস হ্রাস করার ক্ষেত্রে তখন ওরা সত্যিকার অর্থে আন্তরিক হবে।

আরেকটা বিষয় হল, অনেক সময় পূর্ণাঙ্গরূপে আমরা ধরেও নেই যে তাদের অতি বিলাসী জীবনের কারণেই অতিরিক্ত কার্বণ নিঃসরিত হচ্ছে এবং সে কারণেই জলবায়ুর এই বিপর্যয় হচ্ছে, তারপরও এই সব মানুষের মধ্যে তখনও বোধোদয় হয় না। এই কারণে সবাই হয়তো অবাক হবে, ভড়কে যাবে, বিপদগ্রস্ত হবে এবং কার্বনের কারণেই এটা হচ্ছে সেটা বুঝতে পারবে তারপরও এই সিদ্ধান্তে তারা উপনীত হতে পারবে না যে কারখানা বন্ধ করে দেবে, গাড়ির চাকা আর ঘুরাবে না ইত্যাদি। কারণ সেটা তাদের পক্ষে হয়তো সম্ভবও নয়। গত এপ্রিল ২০১০ মাসে ইউরোপে যে একটা আগ্নেয়গিরি গ্যাস নিঃসরণের ফলে হয়ে গেল, তাতে জনজীবন যেভাবে বাধাগ্রস্ত হলো, তারপরও নিশ্চয়ই জলবায়ুতে কার্বণ নিঃস্বরণ করা একবিন্দুও কমেনি। তবে হ্যাঁ, এভাবে একের পর এক বিপর্যয় আসতে থাকলে তখন কিন্তু ওরাও ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হবে। আসলে মানুষ কিন্তু এমনই; খুব সহজে তার অভ্যস্ততা থেকে ফিরে আসতে চায় না। খুব বড় এবং ক্রমাগত ধাক্কা খেতে খেতে একসময় হয়তো হুঁশ হয়।

কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা বা শিল্পোন্নত দেশের অতি কার্বন নিঃসরণের কারণে আমরা ভোগান্তি পোহাব কেন? এটি একটি যৌক্তিক প্রশ্ন। বিপদ আসলে শুধু যে আমাদের ওপর আসবে তা কিন্তু নয়। আমাদের অবস্থান উপকূলবর্তী হওয়ায় আমাদের দেশ নোনা পানিতে তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পৃথিবীর অনেক দেশই অবশ্য আছে যেগুলো উপকূলবর্তী হওয়ায় সেসব দেশও প্রচণ্ড ঝুঁকির মধ্যে আছে। এই ঝুঁকি সারা পৃথিবীর। সুতরাং বিপদ আসলে পৃথিবীর সকল দেশের জনগণের ওপরই আসবে। সে-কারণে এই বিপদের মোকাবেলাও করতে হবে সবাইকে মিলে। পৃথিবীর অতি উন্নত দেশ কিন্তু মেনে নিয়েছে যে তাদের কারণেই প্রধানত জলবায়ুর এ অবস্থা হচ্ছে। বলতে হবে এই যে মেনে নেয়া, সমস্যা মোকাবেলার লক্ষ্যে এটি একটি বড় ধরনের অগ্রগতি। ধনী দেশগুলো যেহেতু তাদের দায় মেনে নিয়েছেন, এখন প্রয়োজন তাদের বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর চাপ সৃষ্টি করা। এই চাপ প্রয়োগের কাজটি ক্রমাগত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলে, তাহলেও জলবায়ু সমস্যা একটি সমাধানের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

[লেখক: প্রবন্ধ/ নিবন্ধকার। ব্যাংক কর্মকর্তা।]

ফে র দৌ সী সু ল তা না

২০০৯ সালে লম্বা ছুটি থাকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম দেশের বাইরে। বেড়ানোর ভূগোলটা ছিল সিঙ্গাপুর-ব্যাংকক-ঢাকা। সিঙ্গাপুরে যেদিন গেলাম তার পরদিন সকালে ছিল সাইট সিইইং অর্থাৎ ট্রাভেল এজেন্টদের পক্ষ থেকে তোফা। আশেপাশে দর্শনীয় এলাকায় ওদের উদ্যোগেই ভ্রমণ। শিক্ষিত, মার্জিত গাইড– এটা বাড়তি পাওনা। আমরা একেকজন একেক দেশের নাগরিক– বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া; না, পশ্চিমা কোনো দেশের কেউ আমাদের ভ্রমণসঙ্গী ছিলেন না। একটা মাইক্রোবাসে আমাদের চড়িয়ে মহিলা গাইড তার পরিশীলিত কণ্ঠে নিজের পরিচয় দিলেন। আমরা কে কোন দেশ থেকে এসেছি তা জেনে নিলেন। গাড়ি ধীরে ধীরে চলছে, গাইড মিষ্টিকণ্ঠে ধারাবর্ণনা দিয়ে চলছেন। এখন আমরা যাচ্ছি শুনতে শুনতে। একবার নিজের চোখ দিয়ে আর একবার ক্যামেরার চোখ দিয়ে দেখছিলাম ছিমছাম, গোছানো ছবির মতো সুন্দর পরিচ্ছন্ন নগরী। ভিউকার্ডের ছবির মতো। গাইড তাদের দেশের সরকার, প্রাকৃতিক সম্পদ এসবের বর্ণনা দিচ্ছেলেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন আমাদের পানি আসে মালয়েশিয়া থেকে। ইনফ্যাক্ট আমরা এমন কিছু উৎপাদন করি না । বেশির ভাগই বাইরে থেকে আসে। আমরা শুধু সুন্দর ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে চলি। আমাদের সিংহভাগ আয় আসে টুরিজ্যম থেকে। তাই আমরা আমাদের দেশকে ছবির মতো সাজিয়ে রাখতে পছন্দ করি। গাইড বলে চলেন, আমরা প্রতি বছর একটা করে গাছ লাগাই। এটি আমাদের ডিউটি। নিজের বাড়িতে জায়গা না থাকলে রাস্তায়, বা পাবলিক প্রপার্টিতে গিয়ে নিজ উদ্যোগে লাগিয়ে আসতে হয়। অথবা বাড়ির আঙ্গিনায় বা ছাদের টবের গাছ লাগাতেই হবে। কারণ আমরা চাই গ্রিন সিঙ্গাপুর। গাছ যত বেশি থাকবে আমাদের প্রাকৃতিক বিপর্যয় তত কম হবে। তাই বাধ্যতামূলকভাবে গাছ লাগাতে হয়। আমাদের সরকার আসে সরকার যায় কিন্তু এসব নীতিমালাগুলো অপরিবর্তিত থেকে যায়।

শুনছিলাম খুব তন্ময় হয়ে। কেন যে সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরই আর আমরা আমরাই তা চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখিয়ে দিলেন লেডি। জলবায়ু পরিবর্তনের বিশ্বব্যাপী ক্ষতিকর প্রভাবে আমরা কম-বেশি সবাই তো ক্ষতিগ্রস্ত হব। কিন্তু এই অবস্থার জন্য যে দায়– স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে তা কি এড়িয়ে যাওয়া যায়? ইউনাইটেড

ন্যাশনস ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অব ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ (IPCC) ওয়র্কিং গ্রুপ-(II) ৬ বছর ধরে ১৩০টি দেশের ২৫০০ বিজ্ঞানীর মতামতের ভিত্তিতে যে রিপোর্ট তৈরি করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বিশ্বব্যাপী গরিব দেশগুলো সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে; কিন্তু এমন কোনো ব্যক্তি বা দেশ নেই যাকে এই ক্ষতি স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সব দেশ, অঞ্চল, ব্যক্তি এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এমনভাবে পরিবেশকে উল্টেপাল্টে দেবে যে এর থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকার কোনো সুযোগ কারুরই নেই। অনেকে মনে করেন এই উষ্ণতার ফলে জলবায়ুতে যে পরিবর্তন আসবে তাতে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে ফসলের উৎপাদন বাড়বে। শীতপ্রধান অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধির সময় এবং পরিমাণ বাড়লে শীতের প্রকোপে মৃত্যুর সংখ্যা কমবে কিন্তু অঞ্চলভেদে সাময়িক এই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শীতে মৃত্যুর সংখ্যা– এটি যেমন সত্যি তেমনি এর ফলে পুরো পৃথিবীতে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং এ থেকে সৃষ্ট রোগে মারা যাবে অসংখ্য মানুষ।

ফ্রেন্ডস অব দ্যা আর্থ ইন্টারন্যাশনাল-এর ক্লাইমেট ক্যাম্পেইনার ক্যাথরিন পিয়ারস বলেন, এটি এখন পরিষ্কার যে, গত ৫০ বছরের উষ্ণতাই আমাদের পৃথিবীকে এক বিপজ্জনক অবস্থানে নিয়ে গেছে। এখনো যদি আমরা নিজেদের সংশোধন না করি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এমন এক বিপর্যয়ে পড়ব তাতে পৃথিবীর দরিদ্রতম অংশের প্রচুর প্রাণহানি, অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং বাসস্থানের ক্ষতি হবে। এই জলবায়ু পরিবর্তন শুধুমাত্র জলবায়ু সংক্রান্ত নয়– এই বিষয়টির সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি; অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম, জড়িয়ে আছে আমাদের বৈশ্বিক নিরাপত্তা। সম্ভাব্য জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর অসংখ্য অসহায় দরিদ্র মানুষ খরতাপ, বন্যা, ঝড়, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি-দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন ধরনের অসুখে অসুস্থ অথবা মৃত্যুবরণ করবে। শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে অপুষ্টি, ডায়রিয়া এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হবে অসংখ্য মানুষ। পৃথিবীর ভূমি -লেভেল ওজনের কারণে পোকামাকড়ের মাধ্যমে রোগ বিস্তারের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতার গড় হিসাব ০.৭৪-এ উন্নীত হয়েছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ার কারণে নিচু অঞ্চলের আধিবাসীগণ আগের চাইতে অনেক বেশি বন্যার মোকাবেলা করছে। বর্তমানের চাইতে বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫ থেকে ২.৫ ডিগ্রি বাড়লে সাগরের উচ্চতা আরো বাড়বে।

বর্তমান শতাব্দীতেই আমরা বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনের বিষয়টি লক্ষ করছি। হিমালয়কে ঘিরে রয়েছে ৪টি দেশ– চীন, নেপাল, ভুটান এবং ভারত। যেখানে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ লোকের বসতি– সেই হিমালয়ে যে পরিমাণ পানি, বরফ এবং তুষার আকারে সংরক্ষিত হওয়ার কথা ছিল– তা হয়নি বৈশ্বিক

উষ্ণতার কারণে বরং পরিবর্তে হিমালয় থেকে নেমে এসেছে কাদা, ব্যাহত হচ্ছে পানি সরবরাহ। ২০২০ সাল নাগাদ শুধু মাত্র এশিয়ায় নয়, আফ্রিকাতেও বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে ২৫ থেকে ২৫০ মিলিয়ন মানুষ ব্যবহারযোগ্য পানির অভাবে কষ্ট পাবে। একই সময় আফ্রিকার বেশ কিছু দেশে যেখানে কম বৃষ্টিপাত হয় ঐসব এলাকায় ৫০ শতাংশ কৃষি-উৎপাদন কমে যাবে বলে আশংকা করা হচ্ছে। শতাব্দীর মধ্যভাগে আবহাওয়ার উষ্ণতার কারণে এবং একই সাথে মাটিতে পানির শুষ্কতার কারণে ল্যাটিন আমেরিকার আমাজান অঞ্চলের একটি অংশ ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট 'সাভানা' পড়বে বিপর্যয়ের মুখে। ক্যারিবিয়ান এবং প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ উঁচু হয়ে যাওয়ায় পানিসমস্যার সাথে সাথে আবহাওয়াও চরমভাবাপন্ন হয়ে উঠবে। ফলে এসব অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনে নেমে আসবে বিপর্যয়। কারণ আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে ছোট ছোট দ্বীপগুলোতে পানির প্রবাহ পূর্বের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে ফলে পানির অভাবে তাদের জীবন-জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে। বিশেষ করে জেলে এবং পর্যটনশিল্প সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আয়ের উৎসের উৎপত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা আসবে এটা বলাই বাহুল্য। মানুষ পৃথিবীকে জয় করার আগে বা বলা যায় প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন করার আগে আবহাওয়ার পরিবর্তন হত স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মেই। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্পবিপ্লবের ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে আবহাওয়া এবং পরিবেশের ওপর একধরনের প্রভাব পড়ে। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণই গ্রিনহাউজ গ্যাস তৈরি করে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি: বনায়ন ধ্বংস, ফ্যাক্টরি, ফার্মিং-এর ফলে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এবং জলবায়ু-উষ্ণতার সূচনা হয়।

এক শ্রেণীর লোক বলবার চেষ্টা করেন যে, বৈশ্বিক উষ্ণতা বা জলবায়ুর পরিবর্তন এবং এর থেকে সৃষ্ট বিপর্যয় প্রকৃতির আচরণ– কিন্তু এ-সম্পর্কিত মতবাদটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই মতবাদ প্রথম পর্যায়ে মানুষ কিছুটা বিশ্বাস করলেও এখন আর তা মেনে নিতে পারছে না। উন্নত বিশ্বের সরকারগুলো এবং ঐসব দেশেরই মদদপুষ্ট বিজ্ঞানীরা অনুন্নত বিশ্বকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এসব কথা ছড়াচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন-এর ফলে যা ঘটতে পারে বলে আগাম সতর্কতা বিজ্ঞানীরা দিয়েছিলেন– সারা বিশ্বের প্রকৃতিই এখন তেমন আচরণই করছে। গ্লোবাল ওয়ার্মিং অথবা বৈশ্বিক উষ্ণতা কেন হচ্ছে? সারা পৃথিবীব্যাপী গ্রিনহাউজ গ্যাস-এর অতি ব্যবহার পৃথিবীর খুব কাছে বায়ুস্তরে সারফেস তৈরি করছে। এই গ্রিনহাউজ গ্যাস, প্রকৃতি এবং মানুষ তৈরি করে চলেছে। কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, নিউট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরোকার্বন এবং ওয়াটার ভেপোর এইগুলো গ্রিনহাউজ গ্যাসে থাকে। এটি সত্যি যে গ্রিনহাউজ গ্যাসের প্রভাবে প্রকৃতিতে উষ্ণতা রয়েছে। তা নইলে অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বাসের অযোগ্য পরিবেশ তৈরি হত।

মানুষ ১৫০ বছর ধরে গ্রিনহাউজ গ্যাস তৈরি করে চলেছে। বিশেষত গত ৬০ বছর ধরে মানুষের সৃষ্ট গ্রিনহাউজ গ্যাস এত বেড়েছে যার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি গ্রিনহাউজ গ্যাস পৃথিবীকে প্রাণী ও মানুষের বাসযোগ্য করেছে আর মানুষের তৈরি গ্রিনহাউজ গ্যাস সেই ভারসাম্য বিনষ্ট করছে।

অতিরিক্ত গ্রিনহাউজ গ্যাস প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করেছে যেসব কারণেঃ

তেল,গ্যাস এবং কয়লাকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে। রেফ্রিজারেশন, ঠাণ্ডা করার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি জাতীয় প্রডাক্ট-এর জন্য ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ব্যবহার করা হয়। যা গ্রিনহাউজ গ্যাস তৈরি করে।

যেসব কাজে বা যেসব প্রক্রিয়ায় মিথেন ব্যবহার করা হয় বা মিথেন নির্গত হয়– যেমন গবাদি পশুর মল, ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ যেখানে ব্যাকটেরিয়া-জাত মিথেল ব্যবহার করা হয়। এছাড়া সেপটিক প্রসেস এবং সারেও মিথেন রয়েছে।

গাছ উজাড় করে বন ধ্বংস করা।

মনুষ্যসৃষ্ট সবচাইতে বড় গ্রিনহাউজ গ্যাস হল কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ। এই ক্ষতিকর গ্যাস-এর ৭৭% নির্গত হয় কয়লা, জ্বালানি, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেল-এর ব্যবহার থেকে এবং ২২% আসে বন ধ্বংস করা থেকে। যানবাহন, কলকারখানা, এনার্জি এবং পাওয়ার ব্যবহারের ফলে উল্লেখযোগ্য হারেই কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়ে তা বাতাসে মিশে যাচ্ছে যা গ্রিনহাউজ গ্যাস-কে প্রভাবিত করছে– বলা যায় আরো উত্তপ্ত করছে।

"২০০৫ সালে ইউনিয়ন অব কনসার্ন সায়েন্টিস্ট-এর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় আমেরিকাতে বার্ষিক যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত হয় তার এক-চতুর্থাংশ আসে যানবাহন থেকে। এর মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ প্রতিদিনই যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে। আর মানুষ ছুটে চলেছে অজানা বিশ্বকে জানবার আশায়। কাজের খোঁজে অথবা নিজের কোনো পছন্দের জায়গায়। ছুটে চলার যেমন শেষ নেই তেমনি কার্বন ডাই অক্সাইড-এর নির্গমনও তেমনি বেড়েই চলেছে বিরামহীন।"

প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম বদ্বীপ অঞ্চল। এই নদীগুলোর উৎপত্তিস্থল নেপাল, ভারত এবং চীন। এই ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশের মাটি বহুমাত্রিক গুণসম্পন্ন। কিন্তু বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাপে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় ১৫

কোটির ঘনবসতির এই দেশে অন্তহীন সমস্যার মাঝে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতিতেও রয়েছে দুর্বলতা। এর সুযোগে বনভূমির প্রায় ৯০% শতাংশই অবলুপ্ত হয়েছে। ৫০% মিঠাপানিও হয়েছে ব্যবহারের অনুপযোগী। ফলে ১.৪ শতাংশ বনভূমি-আচ্ছাদিত এই বদ্বীপ অঞ্চল এখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে । গত ১০০ বছরের বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়েছে বনভূমি ধ্বংসের কারণে। দ্যা ওয়ার্ল্ড কনভেনশন ইউনিয়নের মতে বাংলাদেশের ৪০% মিঠাপানির বিভিন্ন প্রজাতির মাছও বিলুপ্ত প্রায়।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ হবে সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। পৃথিবীর বৃহত্তম এই বদ্বীপ অঞ্চল এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম রিভার সিস্টেম এরিয়া বলে খ্যাত এই বাংলাদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার বৃদ্ধির কারণে সবচাইতে বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ(GCC)-এর মতে সম্ভাব্য বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সমুদ্র-তলদেশের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগত বিপর্যয়ের পড়বে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিবেশও বদলে দেবে। ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ৮% নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবে। ৮ মিলিয়ন মানুষ দুর্ভিক্ষে; বছরে ৭০ মিলিয়ন লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এছাড়া সমুদ্রের উচ্চতা বাড়ার ফলে প্রধান প্রধান নদীগুলোতে বন্যা দেখা দেবে। উপকূলীয় অঞ্চলসমূহে নোনা জলের বিস্তৃতি ঘটবে। আবহাওয়া পরিবর্তনের পূর্বাভাস সাম্প্রতিককালে বেশ ভালোভাবেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ঘণ্টায় ২২০ কিলোমিটার বাতাসের গতিবেগ নিয়ে সিডর যে আঘাত হানে তাতে প্রায় ৩০০০ লোক মারা যায় এবং বাড়িঘর, পশুপাখি ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রায় সবই বিনষ্ট হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ২০৫০ সালের পরে প্রতি বছর ৭০ মিলিয়ন লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে, ৮ শতাংশ লোকে অনাহারে মারা যাবে এবং ৭ শতাংশ অঞ্চল পানির নীচে স্থায়ীভাবে তলিয়ে যাবে। এই জলবায়ু পরিবর্তনে শুধু যে পরিবেশের পরিবর্তন হবে তা নয় এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিও বাধাগ্রস্ত হবে। ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক-অর্থনৈতিক এই বিপর্যয়কে মোকাবেলায় বাংলাদেশ ক্লাইমেন্ট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (BCCSAP)-এর মাধ্যমে প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। এর প্রস্তুতির জন্য এখনি বাংলাদেশের ৫০০ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন এবং ৫-১০ বছরের মধ্যে আরো ৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশ সরকার ৪৫ মিলিয়ন ইউএস ডলার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড (MDTF)-এর মাধ্যমে আরো ১৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার প্রাপ্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রাপ্ত তথ্য মতে ৭০% বাংলাদেশী কৃষিজমি এবং বনভূমির বা প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। গ্রামীণ জীবনে দারিদ্র্যের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। ৫৩% গ্রামে এবং ৩৭% শহরে মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিনযাপন করে। গ্রামের ৭৭% বাড়িঘর দেখলেই বোঝা যায় তারা কতখানি অভাব-অনটনের মধ্যে দিনযাপন করছে। এর মধ্যে ১৮% রয়েছে একেবারেই হতদরিদ্র। গ্রামীণ জনপদের মানুষ ঐতিহ্যগত ভাবেই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল বিশেষভাবে যারা ভূমিহীন তারা তো জীবিকার জন্য নদী ও বনসম্পদের ওপর প্রকৃত অর্থেই নির্ভর করে আছে। বাংলাদেশের জনগণ আজন্ম বন্যা মোকাবেলা করে জীবনযাপন করছে। এদেশে প্রায় ১ মিলিয়ন জেলে আছে যারা পার্টটাইম মাছ ধরে আর প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৪ জন গ্রামবাসীই পানিবাহিত অর্থনৈতিক কাজ করে জীবন নির্বাহ করে। যেমন মাছ ধরা, নৌকা চালানো, লবণ চাষ, চিংড়ি চাষ, মৎস্য চাষ ইত্যাদি। এসব তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে যে জিনিসটি প্রকট হয়ে উঠে তা হল, বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সারা পৃথিবী এবং বিশেষত বাংলাদেশ যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর সব ধরনের লক্ষণই দেখা যাচ্ছে আবহাওয়া পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশকে এক সময় বলা হত নাতিশীতোষ্ণ দেশ। অর্থাৎ না শীত না গরমের দেশ। আর এখন? শীতের সময় শীত বেশি আর গরমের সময় প্রচণ্ড গরম পড়ছে। যখন বৃষ্টি হওয়ার কথা তখন তা হচ্ছে না। আর হলেও তা খুবই কম। আবার অসময়ে বন্যায় ভেসে যাচ্ছে আমাদের নিম্নাঞ্চল।

আমাদের বনাঞ্চল কমে যাওয়ার ফলে সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি আমরা নিজেরাই। আমরা প্রত্যেকেই যার যার সুবিধেমতো গাছ কেটেছি, আসবাব বানিয়েছি, জ্বালানি কাঠ হিসেবে পুড়িয়েছি, আবার ইটের ভাটার কয়লার পরিবর্তে কাঠকে জ্বালানি হিসেবে পুড়িয়েছি; বনভূমি উজাড় করে কাঠকে ব্যবহারিক কাজে লাগানো হয়েছে বটে কিন্তু একটি গাছ কাটলে ৫টি গাছ লাগাতে হয়– এই নীতিমালা কখনোই মানা হয়নি। না ব্যক্তি উদ্যোগে না সরকারি উদ্যোগে– কোনোভাবেই জনগণকে গাছ লাগানোয় উৎসাহিত করা হয়নি। ফলে আমাদের এই প্রিয়ভূমি আস্তে আস্তে বিরানভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। প্রয়োজনীয় বনভূমি না থাকায়, বন্যা খরা এবং সাইক্লোন আমাদের বার বার হানা দিচ্ছে। বন্যার প্লাবনের বেশির ভাগ পলিমাটিই গঙ্গা-মেঘনা- যমুনা বাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিলিত হচ্ছে। আশংকা করা হচ্ছে যদি এই রকমই চলতে থাকে তবে খুব সহসাই নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাবে। আর প্লাবিত হবে সারা দেশ, তলিয়ে যাবে নদী-সংলগ্ন এলাকা। ধসে পড়বে আশপাশের বাড়ি গ্রাম অঞ্চল। আর সমুদ্র-তলদেশ যখন কিছুটা উঁচু হবে তখন উপকূলীয় অঞ্চলগুলো পানির নিচে চলে যাবে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভালো রকম প্রস্তুতি আমাদের নেই। আমরা সেমিনার করছি এবং বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য দায়ী শিল্পোন্নত দেশগুলোকে নৈতিক চাপ

প্রদানের চেষ্টা করছি। কিন্তু তেমনভাবে গণসচেতনতা তৈরি করতে পারছি না। আমাদের দেশের ৮০ ভাগ লোকই জানে না বৈশ্বিক উষ্ণতা কী বা কেন এটা হয়েছে। জানে না এর ফলে পৃথিবীর অন্যন্য অঞ্চলের চাইতেও অনেক বেশি মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছি আমরা। সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হওয়ার আগেই গণসচেতনতা তৈরি করতে হবে। দেশের জনগণকে পরিবেশ দূষণ থেকে বিরত করতে হবে।

শুধু বুড়িগঙ্গা নয়, সারা দেশেই নদীতীর দখল করে চাষবাস হচ্ছে। ফলে নদী তার নাব্যতা হারাচ্ছে। হারাচ্ছে গতি। মরে যাচ্ছে স্রোতস্বিনী সব নদী-নালা-খাল-বিল। সারা দেশে জালের মতো বিস্তৃত জলাভূমি আর নেই। সব জায়গাতেই ক্ষীণ হয়ে গেছে নদী, ভরাট হয়েছে পলিমাটিতে। শীতে হাঁটু পানি– কোথাও কোথাও একেবারেই শুকিয়ে খটখটে হয়ে যায় খাল-বিল। ফলে সেচকাজের জন্য মাটির নিচের পানি শ্যালো মেশিনে তোলা হচ্ছে। পানির স্তর নেমে যাচ্ছে আরো নিচে। ঠিকমতো নির্দিষ্ট সময়ে ডিগিং হলে এরকম পানিশূন্য নদী নালা খাল বিল শীতকালে গরু-ছাগলের বিচরণভূমি হত না। সারা দেশের এই চিত্রের সাথে আছে ঢাকা এবং আশপাশের অঞ্চলে বুড়িগঙ্গাকে দখল নিয়ে সারা বছরের তামাশা। একদিকে জমি দখল করছে কিছু প্রভাবশালী লোক, বসতি স্থাপন করছে, দিনের পর দিন ভোগদখল করছে। হঠাৎ করে রাজউক আবার তা ভাঙার জন্য তোড়জোড় করছে। কোথাও কোথাও ভাঙছেও দৃশ্যত : ঐ পর্যন্তই।

অবৈধ ভূমি দখলকারী আদালতে যেয়ে স্থগিতাদেশ (Stay Order) নিয়ে আসছে আর বছরের পর বছর তারিখ পিছিয়ে বসবাস করছে নিশ্চিন্তে। কলকারখানায় বর্জ্য নদীতে মিশে নদীর পানি হয়ে যাচ্ছে বিষাক্ত। মিঠাপানির মাছ মরে যাচ্ছে। ঐ বর্জ্যে রোগজীবাণু ছড়াচ্ছে। ট্রলার, নৌকা বা জাহাজ চলাচলেও ঘটছে বিঘ্ন জলে ভাসা আবর্জনার স্তূপে। নদীর পানি দুর্গন্ধময় হয়ে যাচ্ছে। এই দূষণ সারা দেশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। রাস্তাঘাটে চলাচল করছে অনুপযোগী গাড়ি। ফলে কার্বন হাইড্রোজেনের বিষাক্ত ধোঁয়ায় নগরবাসী অতিষ্ঠ। যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করছে সভ্য মানুষ। কারণ পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট নেই নগরে। যেখানে সেখানে ময়লা ফেলা, আবর্জনার স্তূপ, পথেঘাটে বিপন্ন মানবতা। পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন কারো তৎপরতা নেই। সব কিছুই যেনো স্থবির। কেবল চালু আছে মিটিং, মিছিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, টিভি টক শো। এটাই শুধু অতিমাত্রায় সচল। ফলে পুরো দেশই কার্যত অচল। এই অচলায়তন ভাঙতে হলে ঘুম ভাঙাতে হবে দেশবাসীর। একমাত্র তারাই পারে এই ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করতে। প্রতিটি মানুষ যদি সঠিক কাজটি করে তবেই স্বয়ংক্রিয় ভাবেই নিজের চেহারা ফিরে পাবে পবিত্র এই স্বদেশভূমি। যদি আমরা সঠিক জায়গায় আবর্জনা ফেলি আর অন্যকেও না ফেলতে দেই আর সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা সেই আবর্জনা যথাসময়ে পরিষ্কার করে– ক্লিন হয়ে যাবে শহর-নগর-বন্দর।

যদি আমরা জলাভূমি, নদীর পাড় দখল না করি আর অন্যকেও না দখল করতে দেই তাহলে নদী তার আপন চেহারা ফিরে পাবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি দিয়ে নদী খাল বিলকে ডিগিং-ড্রেজিং করে সরকার, অত্যাধুনিক যন্ত্র দিয়ে নদীর গভীরে তলদেশে পরিষ্কার করে, নদীতে পানির ক্ষমতা বেড়ে যাবে। অল্প বৃষ্টিতেই মানুষের বাড়িঘরে পানি উঠবে না। আর শুকনো মৌসুমে নদীতেও পানি থাকবে। অতি মুনাফার আশায় যারা বনভূমি লুণ্ঠন করছে তাদের যদি প্রতিরোধ করি– যদি নিজের গাছটি কাটার আগে ৫টি করে গাছ লাগাই, যদি সারা দেশে বছরে প্রত্যেকে অন্তত একটি করে গাছ লাগাই বাংলার শ্যামল শোভা ফিরে আসবেই আবার। বনভূমি যখন রক্ষক হবে তখন ঝড়, সাইক্লোন-এর গতিরোধ তো সে-ই করবে। বনভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে জীববৈচিত্র্য রক্ষা পাবে। পশুপাখি ফিরে পাবে তাদের অভয়ারণ্য। প্রাকৃতিক ভারসাম্যও ফিরে আসবে। এটুকুতো আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। আমরা যদি এটুকু প্রাথমিকভাবে করে উঠতে পারি– তারপরেই না যেতে পারি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। বলতে পারি সোচ্চার কণ্ঠে, পৃথিবীর মানুষের যথেচ্ছাচারে আমাদের প্রাণ বিপন্ন। আমাদের বাঁচতে দাও।

আর যদি নিজেই বসে আছি যেই গাছের ডালে তাই-ই কাটতে থাকি; ধপাস করে - পপাত ধরনীতল– এটাকে ঠেকানো তো মুশকিলই হবে। বাংলাদেশের মানুষ পারে না এমন কাজ নেই। খালি হাতে মনের জোড় সম্বল করে যে জাতি মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, জয়কে ছিনিয়ে আনতে পারে, পৃথিবীর বুকে এক নতুন মানচিত্র এনে দিতে পারে তারা এসব কাজ অতি সহজেই করতে পারবে। জাগিয়ে দিতে হবে এদের। উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাহলেই সহজ হয়ে যাবে বাকি সব কাজ। গ্রিনহাউজ এফেক্ট থেকে নিজেদের রক্ষা করতে হলে প্রথমে নিজের চারপাশকে শংকামুক্ত রাখতে হবে।

রাজনৈতিক দল– সুশীল সমাজ, জাতির বিবেক বলে খ্যাত সাংবাদিক সমাজ, বুদ্ধিজীবী মহল, গায়ক-শিল্পী সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে গণসচেতনতামূলক পরিবেশ বাচাঁও আন্দোলনে শরীক হলে জেগে উঠবে আবার পুরো বাংলাদেশ। তখন সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখবে কী অবলীলায় এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবেলা করে টিকে গেছি আমরা এই পৃথিবীতে। আমাদের মনোবল ছুঁয়ে যাবে পৃথিবীর বিবেককে, আমাদের এই ১৫ কোটি মানুষের হাত ধরবে ৫০০ কোটি মানুষ। ধরবেই।

পৃথিবীব্যাপী মানুষের এই মুহূর্তে করণীয়ঃ

ফসিল ফুয়েল– অর্থাৎ তেল, গ্যাস, কয়লা যদি সহনীয় মাত্রায় ব্যবহার করা হয় তাতে কার্বন ডাই অক্সাইড পরিবেশে কম প্রভাব ফেলবে তাহলে গ্রিনহাউজ এফেক্ট তথা বৈশ্বিক উষ্ণতার তারতম্য ঘটাবে। সুতরাং আমাদের ফসিল ফুয়েল-এর ব্যবহারিক মাত্রা যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। এর জন্য এবাউট ডটকম-এর এনভার্নমেন্ট

ইস্যুতে ল্যারি ওয়েস্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা কমানোর ১০টি সাধারণ উপায় বলেছেন। এগুলো হল:

ক) কম ব্যবহার, পুনরায় ব্যবহার এবং পুনঃ পুনঃ ব্যবহার: আপনি যখন বাজারে যাবেন তখন এমন দ্রব্য কিনবেন যেটা একবার নয় আবার এবং প্রয়োজনে বারবার ব্যবহার করা যায়। এক্ষেত্রে একবার ব্যবহার করা যায় এমন জিনিস পরিহার করাই উত্তম। ল্যারি ওয়েস্ট-এর মতে– ঘরে ব্যবহারযোগ্য তৈজসপত্র পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের মাত্রা যদি বাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলে বছরে অন্তত ২৪০০ পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড কম খরচ করা সম্ভব।

খ) ঘরের দেয়াল, দরজা, জানালা আবহাওয়া গরম বা ঠাণ্ডা প্রতিরোধক কিছু দিয়ে মুড়িয়ে দিতে হবে যেনো গরম বা ঠাণ্ডা কম লাগে।

ঘুমানোর সময় তাপমাত্রা বাড়িয়ে রাখা যেতে পারে। শীতে বা গরমে ঘরের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি কমিয়ে বা বাড়িয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড খরচের মাত্রা কমানো যেতে পারে। শীতে তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি নিচে আর গরমে ২ ডিগ্রি বাড়িয়ে বছরে ২০০০ পাউন্ড কার্বন ডাই অক্সাইড কম ব্যবহার করা সম্ভব।

গ) ঘরের বাতি পরিবর্তন : ঘরে কমপ্যাক্ট ফ্লোরোসেন্ট লাইট ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণ বাল্ব-এর চাইতে ১০ গুণ বেশি টেকসই হবে এবং কম বিদ্যুত খরচ হবে এবং এর তাপও ৭০% কম হবে।

ঘ) গাড়ির ব্যবহার: যতখানি সম্ভব গাড়ির ব্যবহার কমিয়ে ফেলতে হবে। আশেপাশে কোথাও যেতে হলে পায়ে হেঁটে অথবা প্রয়োজনে বাইসাইকেল ব্যবহার করা যেতে পারে। যা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। প্রয়োজনে স্কুলের জন্য স্কুলবাস আর অফিসের জন্য অফিসবাস ব্যবহারে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার কমবে। এতে তেল কম খরচ হবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সুরক্ষা হবে।
গাড়ি টিপটপ কন্ডিশনে থাকলে কার্বন ডাই অক্সাইড কম খরচ হবে।

ঙ) নতুন গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে এটি জ্বালানি-সাশ্রয়ী কিনা। ঘরে ব্যবহারের তৈজসপত্র ও বাল্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে কম জ্বালানি খরচ এবং দীর্ঘস্থায়িত্ব এবং পুনশ্চ ব্যবহার উপযোগী জিনিসই উত্তম।

চ) শীতের সময়ে শাওয়ারের জন্য হিটার ১২০ ডিগ্রিতে সেট করুন– ফলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। কম গতিসম্পন্ন শাওয়ার ব্যবহারের জন্য ভালো ।

ছ) অহেতুক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা যাবে না। যখন ঘর থেকে বের হবেন অফ সুইচ ব্যবহার করা ভালো, টিভি, ভিডিও, কম্পিউটার ব্যবহারের পর সুইচ অফ করলে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড কম খরচ হবে।

জ) প্রত্যেকের একটি করে গাছ লাগানো উচিত। জেনে রাখা ভালো গাছ এবং উদ্ভিদ, লতা-গুল্ম কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে। পৃথিবীতে গাছ প্রাকৃতিক উপায়ে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে বায়ু বিশুদ্ধকরণের কাজটি করে থাকে। কিন্তু অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং আর মনুষ্যসৃষ্ট এমন অনেক দ্রব্যাদি রয়েছে যা অবিরাম কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে যাচ্ছে। গাছ এবং বনভূমির পরিমাণ এই তুলনায় নিতান্তই কম। তাই দ্রুত গাছের সংখ্যা বাড়াতে হবে। একটি গাছ তার জীবদ্দশায় ১ টন কার্বন গ্রহণ করে।

ঝ) অনেক ইউটিলিটি কোম্পানি আছে যারা এলাকাভিত্তিক জ্বালানি সাশ্রয়ের রিপোর্ট নিয়ে থাকে, শুধু তাই নয় কিভাবে জ্বালানি সাশ্রয় করে নিজের চাহিদাও পূরণ করা যায় এ সম্পর্কিত অফারও তারা দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে এদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

ঞ) বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-পড়শী প্রত্যেকের সাথেই ভালো পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে মত বিনিময় এবং প্রয়োজনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে হবে। পাবলিক, প্রাইভেট অনুষ্ঠানগুলোতে এবং নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিবেশবান্ধব কর্মসূচি নেয়ার ক্ষেত্রে প্রভাবিত করতে হবে।

[লেখক: প্রবন্ধ/নিবন্ধকার, আইনজ্ঞ। ব্যাংক কর্মকর্তা।]

জলবায়ু পরিবর্তন : পৃথিবীর ধ্বংস কি অনিবার্য?

আ দি ত্য চৌ ধু রী

জলবায়ুর ওপর নির্ভর করে বিশ্বে যে-সভ্যতা হাজার হাজার বছরে গড়ে উঠেছে, সেই জলবায়ুর বিপর্যয়ের কারণেই বিশ্ব জুড়ে নানা রকম বিরূপ প্রভাব পড়ছে। একইভাবে বাংলাদেশের ওপরও সেই প্রভাব এসে পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তন বা বিপর্যয়ের প্রধান কারণ হল তাপমাত্রার পরিবর্তন। তাপমাত্রার পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের মৌসুমি বায়ুর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এখানে বৃষ্টিপাতের ধরন ও গতির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। অতি তাপ এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে আমাদের ফসলের চাষ-বাসের ক্ষেত্রে ভীষণ অসুবিধা দেখা দিচ্ছে। সে-জন্যই মূলত আমাদের দেশে খাদ্যের ঘাটতি চরম আকার ধারণ করবে। যে-দেশের মানুষের সংখ্যা এত বেশি, সে-রকম দ্ররিদ্র একটি দেশে খাদ্যঘাটতি একটি বড় ধরনের দুশ্চিন্তার বিষয়। খাদ্যশস্য যেমন ধান, আলু, গম, ভুট্টা, সরিষা, ডাল ইত্যাদি ফসলের চাষবাস ব্যাহত হলে সেটা আমাদের জাতীয় অর্থনীতির ওপরও ভীষণভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সে ক্ষেত্রে বসে থাকলে চলবে না। হাত গুটিয়ে বসে থাকলে আমাদের জনগণের জীবনও বিপর্যয়ের মুখে পড়বে।

প্রশ্ন হল, পৃথিবী জুড়ে জলবায়ুর এই অবস্থা সৃষ্টি হল কীভাবে? আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে, পুঁজিবাদের মূল যে ভিত্তি "মুনাফা" অর্থাৎ যে কোনো উপায়ে মুনাফা করতে হবে এবং নীতি-নৈতিকতার কোনো রকম বালাই যেখানে নেই– শুধু মুনাফার পথকে সুগম রাখার উদ্দেশ্যে প্রতি মূহূর্তে যে চেষ্টা সেই সীমাহীন মুনাফা করার প্রক্রিয়াই এজন্য মূলত দায়ী। উন্নত দেশের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো জানে না এই মুনাফা আহরণের সমাপ্তি আসলে কোথায় কিংবা কতটা মুনাফা তাদের দরকার। যেহেতু এটি কোনো ব্যক্তিমানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং এটি একটি পদ্ধতিগত ব্যাপার– সে-কারণে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি এই মুনাফা'র পদ্ধতির মধ্যে থেকে নীতি-নৈতিকতার কথা বলে কিংবা সেই পথ অবলম্বন করে তাহলে সেই ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি নিজের অবস্থান থেকে ছিটকে পড়বে এবং সেই স্থলে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এসে জায়গা করে নেবে। যেমন নৈতিক কারণে কোনো কোম্পানি তাদের কোনো পণ্য যদি এমনভাবে তৈরি করে যে সেটা ভোক্তা দীর্ঘদিন ব্যবহার করতে পারবে– তাহলে সেই কোম্পানির পরবর্তী পণ্যটি কিনতে কিন্তু সেই ভোক্তা

আগ্রহী হবে না। কাজেই নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে কোম্পানিগুলো এমনভাবে পণ্য তৈরি করে যে সেটা যেন অল্পদিনেই ব্যবহার উপযোগিতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সেই প্রতিষ্ঠানের পণ্য ক্রমাগত বিক্রি হয় এবং সেই প্রতিষ্ঠানটি তার যে লক্ষ্য অর্থাৎ সীমাহীন মুনাফার পথে সফল হয়। কাজেই বল্গাহীন মুনাফা ও নৈতিকতা একসঙ্গে চলতে পারে না। আর এই বিষয়টির সঙ্গেই জড়িত অতি ভোগবাদিতার বিষয়টি।

উন্নত দেশসমূহ শিল্প-কলকারখানার দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে রয়েছে। এবং এই এগিয়ে থাকাটাই পৃথিবীর জলবায়ুর জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা, ইউরোপ-চীন ইত্যাদি দেশসমূহের জনগণ তাদের পরিশ্রম ও মেধা দিয়েই শিল্পে এতটা উন্নতি করেছে। কিন্তু শিল্পে উন্নতি লাভ মানেই হল বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, মিথেন, ইথেন এবং নাইট্রোস অক্সাইড– এই কয়টি গ্যাস বেশি নিঃসরণ করা; যে গ্যাসের কারণেই জলবায়ুর উষ্ণতা বেড়ে গেছে বহুগুণ। গত একশ-দেড়শ বছর আগের জলবায়ুর সঙ্গে যদি আগামী একশ-দেড়শ বছর পরের জলবায়ুর উষ্ণতার তুলনা করা যায়– তাহলে দেখা যাবে পৃথিবীর জলবায়ুর উষ্ণতা হয়তো পাঁচ-ছয় সেলসিয়াস বেড়ে যাবে। এখন প্রশ্ন হল তখন ঐ উত্তপ্ত পৃথিবীর অভিশাপ আমরা বহন করব কেন? যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশের কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ বছরে মাথাপিছ মাত্র .২৫ টন, সেখানে ইউরোপে কিংবা আমেরিকায় বছরে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ ১৭ বা ১৮ টন-এর মতো, চীনে ২১ টনের মতো। সুতরাং পৃথিবীকে গরম করে তোলার ক্ষেত্রে উন্নত এই সব দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ কী ধরনের সম্পর্ক বজায় রাখবে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে তো আমাদের কোনো লাভ নেই। সুতরাং তাদের সঙ্গে আমাদের এমন সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে যাতে আমরা যে শিল্প-কারখানায় এখনো পিছিয়ে আছি, সেই দিক থেকে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি।

বিশ্ব-জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতি কী কী হতে পারে তা এখনই ঠিক করে নেয়া প্রয়োজন। এবং সেই অনুসারে এদেশের গবেষক মহল ও রাষ্ট্রের নির্বাহীদের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। কৃষিপ্রধান এই দেশটির কৃষিক্ষেত্র প্রায় পুরোপুরি প্রাকৃতিক বৃষ্টি ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভরশীল। কাজেই সেই জলবায়ুই যদি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের কৃষির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে।

সব মিলিয়ে আমরা যদি কার্বন কম নিঃসরণ করে অধিক "শক্তি" উৎপাদন করার জন্য শিল্পগুলো চালিয়ে যেতে পারি– সে উদ্দেশ্যে উন্নত প্রযুক্তি আমাদানি করতে পারি এবং সে ক্ষেত্রে উন্নত দেশের সহযোগিতা আমাদের দরকার।

এছাড়া আন্তর্জাতিকভাবে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কার্বন গ্যাস কমানোর জন্য, সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেও বাংলাদেশকে ভূমিকা রাখতে হবে। আলোচনা চলছে যে, উন্নত দেশগুলো প্রতি বছর কার্বনের পরিমাণ কমাবে এবং সেই নির্ধারিত পরিমাণে কার্বন নিজের দেশে কমাতে না পারলে তার একটি অংশ অনুন্নত দেশে কার্বন কমানোর ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় তারা দেবে।

কাজেই বাংলাদেশকে তার স্বার্থ যেমন দেখতে হবে একইভাবে কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে। তবে প্রশ্ন হল উন্নত দেশগুলো কি তাদের নিজ নিজ দেশে কার্বন কমানোর বাস্তবমুখী কোনো উদ্যোগ আদৌ গ্রহণ করতে পারবে? ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বাগড়া দিয়ে বসেছে। কার্বন গ্যাস নিঃসরণ কমানো দরকার সেই কথা তারা মানেন কিন্তু তাদের জনগণকে গাড়ির ব্যবহার কমাতে বলতে পারবেন না। তারা তাদের আবাসস্থলের সৌকর্য কমাতে বলতে পারবেন না। সুতরাং এই একই কথা যদি যুক্তরাষ্ট্র দিনের পর দিন বলে যায় তাহলে পৃথিবীর সকল দেশ বসে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমানোর যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা হয়তো ভেস্তে যাবে। যে-দেশ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশকে গ্রাহ্য পর্যন্ত করে না, শেষ পর্যন্ত তাদের অবস্থান এবং বাস্তব সিদ্ধান্ত তারা কী নেবে সেটা নিয়ে সবার মনেই সংশয় দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, তাহলে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কী? পৃথিবীর ধ্বংস কি তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই? প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবীর ধ্বংস যুক্তরাষ্ট্রের হাতে নয় বলে বলতে হয় পুঁজিবাদের হাতে। যেখানে পুঁজিবাদের মূল উদ্দেশ্য শুধু সীমাহীন মুনাফা করা, পৃথিবী সেখানে বসবাসের অযোগ্য হয়ে গেলে যাক– এই যখন অবস্থা তখন পৃথিবী নামক গ্রহটির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ছে।
কথা হল তারপরও মানুষের চেষ্টা তো আর থেমে থাকে না। মানুষ বসেও নেই। কিছু মানুষ তারপরও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এদের চেষ্টায় শেষ রক্ষা তো হলেও হতে পারে। আমরা আশাবাদী মানুষ। হতাশ না হয়ে আমরা চাই আশায় বুক বাঁধতে।

[লেখক: বিষয়ভিত্তিক প্রাবন্ধিক। পেশা:ব্যবসায়।]

প্র ব ন্ধ

বিশ্ব-আবহাওয়া বনাম বাংলাদেশ পরিবেশ

এ বি এম মূ সা

মালদ্বীপ সরকার গিয়েছিল ভারত মহাসাগরের তলদেশে, নেপাল সরকার উঠেছিল হিমালয়ের চূড়ায়। বিশ্বের ছোট-বড় বাকি প্রায় সব দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধান গিয়েছিলেন কোপেনহেগেনে। মালদ্বীপের মন্ত্রিসভার সমুদ্র-তলদেশে ডুব দেওয়া আর নেপালের মন্ত্রীদের পর্বতারোহণ এবং কোপ মহাসম্মেলনের একটিই উদ্দেশ্য ছিল। বিশ্ব-জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে জনজীবনের যে চরম ক্ষতি হবে, এ সম্পর্কে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ, অন্তত একটি হইচই সৃষ্টি করা। সামগ্রিক ক্ষতির সাধারণ বিশ্লেষণ হচ্ছে, মালদ্বীপ অচিরেই পানির নিচে তলিয়ে যাবে। নেপাল হিমালয়ের বরফ-গলা পানির নিচে ডুবে যাবে। অন্য অনেক দেশ জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে, অথবা বর্তমানে বিলীন আটলান্টা দেশটির অনুসরণে মহাবিশ্বকে একটি মহাসাগরে পরিণত করবে। মালদ্বীপ ও নেপালের অভূতপূর্ব কর্মসূচিতে বিশ্বে কতখানি সাড়া পড়েছিল বোঝা যায়নি। তবে কোপেনহেগেন সম্মেলনে সমবেত রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানেরা 'শেষের সেদিন ভয়ংকর' বলে অনেক দিকনির্দেশক না হলেও 'মূল্যবান' বক্তব্য দিয়েছেন। যেসব দেশকে পরিবেশ বিপন্ন করে ভবিষ্যতে পৃথিবী ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হচ্ছে, সেখান থেকেও লক্ষাধিক প্রতিবাদকারী তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানাতে সম্মেলনের বাইরে জড়ো হয়েছিল।

কোপেনহেগেন সম্মেলন তথা জলবায়ু পরিবর্তন, উচ্চ পরিমণ্ডলে উষ্ণায়ন, কার্বন নামের একটি পদার্থের নিঃসরণ ইত্যাকার জটিল বিষয়াদি নিয়ে যে মহা হইচই হয়ে গেল, তা নিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ উদ্বেগজনক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ সেসবের গুরুত্ব কতখানি বুঝেছেন, তা বলতে পারব না। তবে আমি নিজে কোপেনহেগেন থেকে বিশেষ সংবাদদাতাদের প্রতিবেদন আর রাষ্ট্রপ্রধানদের শলাপরামর্শ ও গলাবাজির খবরগুলো পড়ে বিশ্ব সম্মেলনটির প্রাথমিক উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব স্বল্পমাত্রায় অনুধাবন করার কোশেশ করেছি। মূল উদ্দেশ্যটি পুরোপুরি বুঝিনি, তবে একটুখানি ঘটকা লেগেছে, এর মধ্যে টাকা-পয়সার বিষয়টি কেন উঁকি

মেরেছে। উষ্ণায়ন আর হিমমণ্ডল সৃষ্টির জন্য 'উন্নত' দেশগুলোকে দু-চার পয়সা নয়, দুই হাজার কোটি টাকা জরিমানা করে তহবিল গঠন ও লেনদেনের বিষয়টিও বুঝতে চেয়েছি। কারণ, সম্মেলনের কার্যসূচিতে বিষাক্ত গ্যাস নিঃসরণের কুফলের চেয়ে ক্ষতিপূরণ অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সম্মেলন শেষের সিদ্ধান্ত থেকে এমনটি মনে হয়েছে, কারণ ভাবছি বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ যা হারাবে, টাকা দিয়ে কি তার সব পাওয়া যাবে? রাজনৈতিক বক্তব্যও আমাকে বিভ্রান্ত করেছে।

আশির দশকে বিশ্বপরিবেশ নিয়ে সবার মনে প্রাথমিক দুশ্চিন্তা অথবা চিন্তাভাবনার সঞ্চার করেছিল 'গ্রিনহাউস' আন্দোলন। তাদের মূল বক্তব্য ছিল উন্নত দেশগুলোর শিল্পায়ন, এমনকি সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় অথবা বিলাসসামগ্রী শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের এয়ার কন্ডিশনার, ফ্রিজ-টেলিভিশন এমনকি যন্ত্রচালিত যানবাহনের গ্যাস নিঃসরণ বিশ্ব পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সহজ কথায়, তারা বিশ্বকে জানাতে চেয়েছে, গ্যাস নিঃসরণ পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতার বলয় সৃষ্টি করছে। এ বলয়ের কারণে পৃথিবী বরফের নিচে চাপা পড়বে। কারণ, সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছানোর পথে একটি আস্তরণ পড়বে। এটি ছিল পরিবেশ ধ্বংস নিয়ে সাধারণ ধারণা। গ্রিনহাউস আন্দোলন পরে রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কালক্রমে গ্যাস নিঃসরণের বিরুদ্ধে তাদের জোরদার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং কার্যক্রম পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ইউরোপের কয়েকটি দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের কারণেই গ্রিন পার্টি এখনো একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল।

গ্রিনহাউস আন্দোলনের এত বছর পর আচম্বিতে গ্যাস নিঃসরণের বৈশ্বিক উষ্ণতার দুশ্চিন্তাটি আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আবহাওয়া পরিবর্তনে ভয়ংকর পরিস্থিতি উদ্ভবের আশঙ্কা, ভীতি ও দুশ্চিন্তা সাম্প্রতিককালে পরিবেশ-সম্পর্কীয় বিচিত্র সব কারণে এত বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমাদের নিজেদের বন ধ্বংসের দায় কে নেবে? পরিবেশজনিত বর্তমানের নিজস্ব দুর্ভাবনা ভিন্ন ধরনের সমস্যা, যা আমাদেরই সৃষ্ট। আমাদের নীতিনির্ধারক মহারথীরা কোপেনহেগেনে আসন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে মহা দুর্ভাবনা প্রকাশ করেছেন। নিজ দেশের পরিবেশ ধ্বংস নিয়ে তাঁরা কতখানি উদ্বিগ্ন, নিজ দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে কতখানি আন্তরিক? এ কারণে বিশ্ব পরিমণ্ডলে ভয়ংকর পরিস্থিতি আর স্বদেশে পরিবেশ ধ্বংস, এই দুইয়ের মধ্যে কোনো সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা, এই ভাবনাকে গুরুত্ব দিতে হচ্ছে। আগেই বলেছি, বাংলাদেশে পরিবেশ ধ্বংসের আশঙ্কাটি দেশেরই স্বার্থান্বেষী ও তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী ও পৃষ্ঠপোষকদের সৃষ্টি। বিশ্ব নিয়ে দুশ্চিন্তার বৃহত্তর পরিধির তুলনায় আমাদের দেশের জনগণের কাছে নিজেদের সংকটের গুরুত্ব অধিকতর। তা কি কোপ সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী আমাদের নেতারা বোঝেন? বুঝলেও কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন?

উল্লেখ্য, বিশ্বের সব বিজ্ঞ, স্বল্প বৃহৎ শক্তিমান ব্যক্তি কোপেনহেগেনে একত্র হয়ে দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছে। একটি হচ্ছে, বৃহৎ দেশের শিল্পায়নের পরিধি সংকুচিত

করতে হবে। দুই, যেহেতু তাদের শিল্পায়ন দুনিয়ার বাকি সব, এমনকি তাদের নিজেদের দেশের মানুষের নিরাপত্তা ও বিশ্ব ভূ-পরিমণ্ডলের অস্তিত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়েছে, সে জন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এরই মধ্যে এ দুটি বিষয় বিশ্বগ্রাসী সমস্যাবলির রাজনৈতিক নাকি অর্থনৈতিক পরিধির অন্তর্ভুক্ত, তা নিয়েও কোপেনহেগেনে ধুমধাড়াক্কা আলোচনা হয়েছে। কী অদ্ভুত ব্যাপার, বিশ্ববায়ুতে ক্ষতিকর প্রভাবটি প্রথম দিকে গণমানুষের অস্তিত্ব সংকটের প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় এসেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা গেল, এটি অর্থনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য আলোচ্য বিষয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে, কী আর করা যাবে, এখন ক্ষতিপূরণ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে। সেই ভাবনাই হবে গরিব দেশগুলোর জন্য অধিকতর লাভজনক। সুতরাং ভবিষ্যতে ক্ষতির মাত্রা বাড়লে ক্ষতিপূরণের অঙ্কের পরিমাণ বাড়বে কি না, তা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি কে কত পাবে, তা নিয়েই মজাদার দরকষাকষির শেষ খবর পড়ে বেশ মজাই পেয়েছি। তদুপরি আমরা, মানে বাংলাদেশ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সুতরাং সর্ববৃহৎ অঙ্কটি পেতে হবে, এই সত্যটি সম্মেলনে অনেকেই মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। তাই পাওয়ার অঙ্কটি ৭০০ কোটি টাকা কিংবা অনেক বেশি বলে নির্ধারিত হতে পারে। বুঝতে পারছি, এখন থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি দেশগুলো কোপেনহেগেন থেকে এ প্রাপ্তি নিয়েই দিন গুণতে থাকবে। গোণা শেষ হওয়ার আগে পৃথিবী ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। যাক না, নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকির খাতা দেখার কেউ থাকবে না।

এ তো গেল অর্থনৈতিক আর পরিবেশগত সমস্যা। সর্বশেষ খবরটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়, যা শনিবারের *প্রথম আলোতে* ছাপা হয়েছে। প্রথম পৃষ্ঠার খবরটি হচ্ছে, 'কোনো চুক্তি নয়, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে শেষ হতে চলেছে কোপ-১৫, কোপেনহেগেন সম্মেলন।' পড়ে মাথা চুলকাচ্ছিলাম, কথা হচ্ছিল আলো-বাতাস নিয়ে, মধ্যিখানে টাকা-পয়সার ফয়সালা নিয়ে দরকষাকষি চলেছে। তাতে বুঝলাম শেষ পর্যন্ত রাজনীতি এল কোথেকে! সম্মেলনে ১৯৩টি রাষ্ট্রের পরিবেশবিদ আর অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের আওতামুক্ত হয়ে বিশ্ব জলবায়ু পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত রাজনীতিবিদদের হাতে চলে গেল? তবে অবাক হইনি, আমরাও তো নিজের দেশের পরিবেশ সমস্যা শেষ পর্যন্ত দলীয়, স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় ক্ষমতার রাজনীতির পঙ্কিল পানিতে ডুবিয়েছি। এ জন্যই আমাদের বন-পাহাড়, জঙ্গলজলাশয় আর নদী-নালা ধ্বংসের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন দেশীয় রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধরেরা ও তাদের স্বার্থের ভাগিদারেরা। হয়তো এরই পাল্টা ব্যবস্থায়, আমাদের এখন জলবায়ু-সংশ্লিষ্ট বিশ্ব তহবিল নিয়ে ভাবতে হবে। 'দূষিত পদার্থ নির্গমন বন্ধ হবে, নাকি কমিয়ে আনা হবে, তা নির্ধারিত না হলেও জাতিসংঘ ঘোষিত জলবায়ু তহবিল পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত ও ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ব্যাপারে বেশির ভাগ রাষ্ট্র একমত হয়েছে।' পত্রিকার পাতায় শেষ খবরটি পড়ে আশ্বস্ত হয়েছি। কোপেনহেগেন থেকে আমরা আর কিছু না-ই পাই, হয়তো প্রচুর টাকা-পয়সা পাব।

কত, ৭০০ কোটি নাকি আরও বেশি? তার পরের ভাবনা, (১) এই টাকা দিয়ে আমরা কী করব? (২) বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়, নিজ দেশের পরিবেশ রক্ষা নিয়ে তাদের যে দুর্দশা ভোগ করতে হয়, তা লাঘবে এই অর্থ ব্যবহৃত হবে কি?

অভাজনের ওপরের প্রশ্নগুলোর মাজেজা হচ্ছে, কখন সারা বিশ্ব রসাতলে যাবে, তা নিয়ে কোপে যাঁরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, নিজ দেশের তলিয়ে যাওয়ার, সিডরে উড়ে যাওয়ার, বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার ব্যাপারে উঁচুমহলে যাঁরা বসে আছেন, তাঁরা কী ভাবছেন, তা জানতে ইচ্ছে করছে। ঢাকা শহর যে এখনি বছরের অর্ধেক সময় পানির নিচে তলিয়ে থাকে, নদীমাতৃক বাংলাদেশ যে মরুভূমির দেশ হবে, তা কি শুধু বিশ্ব-আবহাওয়া উষ্ণায়নের কারণে? এ প্রশ্নের জবাব কোপেনহেগেন সম্মেলনে যোগদানকারী আমাদের সরকারের নীতিনির্ধারকদের কাছে দাবি করা কি অন্যায় হবে? অপ্রাসঙ্গিক হলেও একটি কৌতুককর বক্তব্য রসবোদ্ধা পাঠকদের সমীপে পেশ করছি। বিশ্বনেতাদের দুশ্চিন্তা হল, প্রথমত বরফ গলছে এবং এ কারণে সব মহাসমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে। দ্বিতীয়ত, ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে কার্বন নামের একটি বায়বীয় পদার্থ আবহাওয়ার উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে। রসালো বক্তব্য হচ্ছে, দ্বিতীয়টি নিয়ে আমাদের কোনো দায়দায়িত্ব বা দুশ্চিন্তা নেই। দেশের প্রায় সব শিল্প আমরা নিজেরাই এরই মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি, আমাদের অন্তত কার্বন নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই।

আবারও বলছি, উপরিউক্ত দুটি জটিল বিষয় নিয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিরা যখন মাথায় মাথা ঠেকিয়ে নিষ্কৃতির উপায় খুঁজছেন, তখন আমরা বঙ্গোপসাগরতীরের বেড়িবাঁধের গাছ কাটছি, উপকূল অঞ্চলের বন ধ্বংস করছি। এ কি বিশ্ব-পরিবেশ সমস্যা, নাকি আমাদের নিজেদের দুশ্চিন্তা? বলাবাহুল্য, আমাদের বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রীকে অবশ্য কোপেনহেগেনে এ নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করেনি। নেপালের মন্ত্রীরা যখন হিমালয়ে উঠে বরফ-গলা বন্ধ করা নিয়ে নজিরবিহীন বৈঠক করছেন, আমরা তখন বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ আর বালু নদী ভরাট করছি। নদীর স্রোত বন্ধ করে, জলাশয় ভরাট করে জমি-বাড়ি, কল-কারখানা, ব্যবসা প্রসারিত করছি। মালদ্বীপের মতো ক্ষুদ্র দ্বীপগুলো পানিতে ডুবে যাবে– তা নিয়ে আলোচনা করতে যারা কোপেনহেগেনে গেছেন, তাঁদের উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা নিজ দেশে হুমকি-ধমকিতেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। যাঁরা বিশ্ব-পরিবেশ ধ্বংস বন্ধের উপায় নির্ধারণে সুদূর কোপেনহেগেনে গেছেন, তাঁরা কি ঘর হতে শুধু দু পা ফেলিয়া আশুলিয়া, বুড়িগঙ্গার অপর পাড়ে, সীতাকুণ্ড অথবা হাতিয়া গিয়েছিলেন?

জানি, উপরিউক্ত 'অবান্তর' প্রশ্নগুলো ওপরের মহলের অনেককে ক্ষুব্ধ করবে। এমনিতেই তাঁরা কোপেনহেগেন থেকে এখনই কিছু না-পাওয়ায় মনঃক্ষুণ্ন। তার পরও আশা করব, শত-হাজার কোটি যদি বাংলাদেশ পায়ও, সেই টাকার একটি ক্ষুদ্রাংশ উপকূলীয় অঞ্চলে আবার বনায়ন, বেড়িবাঁধগুলো পুনর্নির্মাণ, তুরাগ-বালু শীতলক্ষ্যা-বুড়িগঙ্গা পুনরুদ্ধারে, জলাশয় ও জমি দখলকারীদের উচ্ছেদে ব্যয় করা হবে।

ভবিষ্যতে আমাদের গ্রহটির পানির নিচে তলিয়ে যাওয়া নিয়ে হাজারো মাইল দূরের শহরে দুশ্চিন্তার অবসানের উপায় নির্ধারণে সুচিন্তিত ও বাস্তব প্রস্তাব দিয়ে তাঁরা বিশ্ববাসীর বাহবা ও হাততালি পেয়েছেন। এখন দেশের মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য নদী-নালা, খাল-বিল, জলাশয়, বন রক্ষায় ও লবণাক্ততা প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নিলে অন্তত দেশবাসীর প্রশংসা পাবেন। সোমবারের *প্রথম আলোর* শিরোনাম 'বাংলাদেশের জলবায়ু কূটনীতি সফল, বাকি লড়াই ক্ষতিপূরণ আদায়ের'। তাই তো আমার জিজ্ঞাসা, সেই লড়াই সফল হলে কি ঢাকা শহরের পানি উদ্ধার করা খাল দিয়ে তরতর করে নেমে যাবে? বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা, আশুলিয়া, কেরানীগঞ্জ রক্ষা পাবে?

[লেখক: বর্ষীয়ান সাংবাদিক।]

হারালো কোথায় সেই চেনা পৃথিবী!

আ বে দ খা ন

মনে পড়ে ছোটবেলার কথা। পাঠশালায় পণ্ডিতমশাই পড়াতেন আমাদের দেশ ষড়ঋতুর দেশ। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ হল গ্রীষ্ম, আষাঢ়-শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র-আশ্বিন শরৎ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ-মাঘ শীত এবং ফাল্গুন-চৈত্র বসন্ত। ছয় ঋতু কিংবা বারো মাস নিয়ে অনেক শিশুতোষ ছড়াও আওড়াতাম সেসময়। আজ প্রায় তার সবটুকুই শুষে নিয়ে গেছে নিষ্ঠুর সময়। বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত সেসব ছড়ার চরণ মনে নেই বটে তবে এটুকু মনে আছে সমাজ-আচার-অনুষ্ঠান-প্রকৃতি এ সবই জড়িয়ে থাকত সেসব ছড়ার ছত্রে ছত্রে।

সে সময় বৈশাখ মাসেই ঈশান কোণে ঘনকালো মেঘের কুণ্ডলি তারপর হঠাৎ শেকল-ভাঙা কয়েদির মতো ছুটে বেড়ানো কালবৈশেখির ঝড় উপড়ে পড়া বিশালদেহী গাছ অথবা আগুন-ঝরানো রোদের তাত, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসেই আকাশঝরা বর্ষা–

"মাঠ-ঘাট থৈ থৈ খাল বিল ভরছে।" ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই পুজোর তোড়জোর, ঢাকের দ্রিম দ্রিম শব্দ, কার্তিক-অগ্রহায়ণ চেনা যেত নবান্ন উৎসবের ভেতর দিয়ে। পৌষ-মাঘ নিয়ে বচন ছিল 'পোষের শীত মোষের গায়, মাঘের শীতে বাঘ পালায়।' আর কোকিলের ডাক, পাখির কুজনধ্বনি, মধুপের গুঞ্জন জানিয়ে দিত 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।' ক্যালেন্ডার দেখার দরকার হত না, প্রকৃতিই বলে দিত কোন ঋতু কোন মাস চলছে।

কিন্তু এখন সবই ওলটপালট হয়ে গেছে। বর্ষা আসছে দেরিতে, দেরিতে আসছে শীতও। বসন্তকাল আসে বুঝি কিন্তু কবে শুরু হয় তা বোঝা যায় না। শীতের পরিধি এতই সংকীর্ণ যে, আসতে না আসতেই চলে যায়। শুধু শহরে হলে কথা ছিল। কিন্তু এর প্রভাব পড়েছে গ্রামবাংলায়ও। হয়তো খুব বড় আকারে এখনও নয়, কিন্তু যেভাবে সবকিছু বদলে যাচ্ছে তাতে গ্রাম যে বেশি দিন রেহাই পাবে, মনে হয় না।

এই যে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাবার ব্যাপারটি ঘটছে তা কিন্তু কেবল ঋতুচক্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আমাদের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অনেক প্রাণী অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অনেক গাছ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, আমরা অনেক লতাগুল্মের সন্ধান পাচ্ছি না যেগুলো একসময় আমাদের সম্পদ ছিল। ভূপ্রকৃতিও বদলে যাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। সাগরের বুক ফুলে উঠে ভাসিয়ে দিচ্ছে উপকূল এবং তার পার্শ্ববর্তী জনপদ, লবণাক্ততার গ্রাসে চলে যাচ্ছে ফসলী জমি, মৎস্যসম্পদ কমে যাচ্ছে।

এ তো গেল একটা দিক। দেখা যাক মানবদেহে এর কী প্রভাব পড়ছে? আমাদের দেশের মানুষ অতখানি স্বাস্থ্যসচেতন নয় এবং সরকারেরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ নেই বলে আমরা সাদা চোখে বুঝতে পারছি না কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটছে নিঃশব্দে। হৃদরোগীর সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে, নানা ধরনের ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে ক্রমান্বয়ে, চর্মরোগ বাড়ছে মারাত্মকহারে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ক্রমাগত, শ্রবণশক্তি হ্রাস পাচ্ছে, স্নায়ুবৈকল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমান্বয়ে। এর পেছনে পরিবেশের ক্রমবর্ধমান ভারসাম্যহীনতা যে নীরবে মুখ্য ভূমিকা পালন করে চলেছে, আমরা তা ঠিক বুঝেও উঠতে পারছি না।

মালথাসিয়ান থিওরির একটা প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল এই যে, জনসংখ্যা একসময় প্রাকৃতিক নিয়মেই নিয়ন্ত্রিত হবে। মানুষ প্রকৃতিকে শাসন করতে গিয়ে একসময় প্রকৃতিরই নির্মম রোষের শিকার হবে। মালথাস-এর এই ব্যাখ্যা যদিও অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ কিংবা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বহুকাল যুক্তিগ্রাহ্য তত্ত্ব হিসেবে তেমনভাবে আদৃত হচ্ছিল না, কিন্তু সম্প্রতি এটা নিয়ে নতুনভাবে ভাবনা শুরু হয়েছে। যেভাবে পৃথিবীর সবুজ বেষ্টনী ক্রমান্বয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, যেভাবে আধুনিক এবং ভোগবাদী জীবনব্যবস্থার প্রয়োজনে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী পৃথিবীর অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে এবং বাড়িয়ে দিচ্ছে কার্বনডাই অক্সাইডের মাত্রা, যেভাবে ক্লরোফ্লুরোকার্বনের ব্যাপক নিঃসরণ পৃথিবীর উপরিভাগের উপর থাকা ওজোনস্তরের ক্ষতিসাধন করে

চলেছে, তাতে যদি মানবজাতির অস্তিত্বসংকট দেখা দেয় সেটা কি আমাদের জন্য কোনোভাবেই শুভসংবাদ হবে?

এরই মধ্যে কিন্তু অনেক ঘটনা ঘটছে যেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় হিসেবেই বিবেচনা করছি কিন্তু এই বিপর্যয়ের পেছনের কারণ নিয়ে একেবারেই ভাবছি না। কক্সবাজার, টেকনাফ-উখিয়া'র অতি সম্প্রতি পাহাড়ধসের যে ঘটনাটি প্রায় ষাট-সত্তরটি প্রাণ হরণ করল সেটা কি নিতান্তই প্রকৃতির দোষ? প্রকৃতিকে রুষ্ট করল কে? মানুষই তো। পাহাড় কেটে কেটে পাহাড়কে বিকলাঙ্গ এবং ক্ষীণতনু করল কে? সে তো মানুষই। বনভূমি উজাড় হয়ে যাচ্ছে, কে করছে? এই আমরাই। আমি সুন্দরবন-সংলগ্ন এলাকার মানুষ। আমরা তো জানি সুন্দরবনের বিস্তার কতখানি ছিল একসময়। সাতক্ষীরা জেলার বিস্তীর্ণ অংশ ছিল সুন্দরবনের অন্তর্গত। আজ তো লোকালয়ই গ্রাস করতে উদ্যত সুন্দরবনকে। ময়মনসিংহের বিশাল অঞ্চল জুড়ে ছিল বনাঞ্চল। ভাওয়াল গড় তো বিভাগপূর্ব আমলের ময়মনসিংহের মধ্যেই পড়তো। এখন গেছে এর অনেকটাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের বনসম্পদ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। পরিসংখ্যানের দিকে যদি আমরা চোখ রাখি তা হলে দেখব ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে আমাদের এই বর্তমান বাংলাদেশে বনাঞ্চলের পরিমাণ ছিল ৩৫ শতাংশ, পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে সেটা কমে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশ, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে অর্থাৎ এক দশক আগে সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হত মোট বনাঞ্চলের পরিমাণ ১২ শতাংশের মতো, কিন্তু বেসরকারি হিসেবে সেটা কিছুতেই ৯ শতাংশের বেশি হবে না। আর এই এক দশকে বনখেকো কর্মচারী আর লোভী প্রভাবশালী মহলের বদৌলতে এই অঙ্ক কোথায় এসে নেমেছে কে জানে!

হিসেব তো কেবল বনাঞ্চল নিয়েই নয়, এই নদীমেখলা বাংলাদেশের নদীগুলোরই বা হল কী? কত নদী, কত খাল, কত জলাধার হারিয়ে গেছে চিরকালের জন্যে। এর কারণটাও তো আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। অন্ধের মতো নিজের অস্তিত্বকে যদি ধ্বংস করে ফেলি আমরা তা হলে দোষ দেব কাকে?

আমরা যে কেবল আমাদের কারণেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তা তো নয়। কয়েক বছর আগে জার্মানিতে গ্রিন পার্টির এক শীর্ষস্থানীয় নেতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক সাইকেল ব্যবহার করেন চলাচলের জন্যে। তাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছিল পরিবেশ দূষণ নিয়ে। তিনি পশ্চিমা বিশ্বকে রীতিমতো তুলোধুনো করলেন। বললেন, তোমাদের দেশে কার্বন নিঃসরণের মাত্রা এক শতাংশেরও কম আর এইসব তথাকথিত উন্নত বিশ্বে এই মাত্রা ২০ শতাংশের কাছাকাছি। ওদের এই ঘাতক কর্মকাণ্ডের ফল ভোগ করতে হচ্ছে পৃথিবীর সবাইকে। বিশেষ করে অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে ভুগতে হবে একেবারেই বিনা অপরাধে। আজ যে ওজোনস্তর ক্ষয়ে যাচ্ছে, হিমবাহ গলে যাচ্ছে, এমনকি হিমালয়ের বরফমালাও যে সরে যাচ্ছে এ দায় তো তাদেরই যারা পৃথিবীটাকে তাদের রসায়নাগারে পরিণত করেছে। এত বছর পরে যখন পৃথিবী

জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন তখন মনে পড়ছে সেই ভদ্রলোকের কথা। কে জানে তিনি এখনও বেঁচে আছেন কি না।

আমাদের ছোটবেলায় কয়েকটি বিতর্কবিষয় সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ, না অভিশাপ?' 'বিজ্ঞান দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ' কিংবা 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' সে সময় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় উচ্চকিত থাকতেন বক্তারা। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এখন বৈশ্বিক জলবায়ুর যে উদ্ভট আচরণ চলছে তাতে ফলাফল এবং দৃষ্টিভঙ্গী যদি উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে তাহলে বোধহয় খুব একটা অবাক হতে হবে না।

কাজেই পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার কাজ শুরু করতে হবে এবং তা এখন থেকেই।

[লেখক: সম্পাদক, দৈনিক কালের কণ্ঠ।]

জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বুঝছি

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

বিজ্ঞানীদের গবেষণায় গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি জানা গেছে প্রায় শত বছর আগে। অন্তত চার দশক ধরে সচেতন বিশ্ব এটি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছে, সম্মেলন করছে, সমঝোতার মাধ্যমে প্রতিকারের চেষ্টাও করছে। তা সত্ত্বেও এতে অবিশ্বাসীদের পক্ষও প্রবল ছিল, এই সেদিন পর্যন্ত। আর এই অবিশ্বাসীদের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার। ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে রিও ডি জেনিরোর গ্লোরিয়া সমুদ্রসৈকতে প্রতিবাদী এনজিওদের তাঁবু থেকে বের হওয়া বিক্ষোভে আমিও ছিলাম– অবিশ্বাসী নির্বিকার জর্জ বুশের (সিনিয়র) মুণ্ডুপাত করতে। ওই তাঁবুতেই অনানুষ্ঠানিক আলাপে বক্তব্য শুনি কেনিয়ার পরিবেশবাদী তরুণী ওয়াঙ্গারি মাথাইয়ের। আমাদের হিরো হয়ে এসেছিলেন তরুণ সিনেটর আল গোর, মার্কিন প্রশাসনকে ধিক্কার জানাতে। তাঁরা দু'জনই শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন

২০০৫ ও ২০০৭ সালে। ২০০৭ সালে এসেই মনে হল, জলবায়ু পরিবর্তনের অবিশ্বাসীরা হঠাৎ হালে পানি হারিয়ে ফেলেছে। এটি ঘটতে পেরেছে প্রধানত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বশেষ ফলাফলগুলোর অনিবার্যতা ও স্পষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণের কারণে। এই লেখায় তার সামান্য পরিচিতি দিতে চাই।

গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার মূল কথা হল বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড (ও অন্যান্য আরও দু-একটি গ্যাস) বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর কারণে ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ বাড়ছে। গড় উত্তাপ বহুদিন ধরে মাপা গেলেও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ সরাসরি সূক্ষ্মভাবে মাপা যাচ্ছে মাত্র ১৯৫০ সাল থেকে। উত্তাপের সঙ্গে এর সরাসরি সম্পর্ক দেখাতে হলে আরও প্রাচীন উপাত্ত দরকার। সেটি সম্প্রতি পাওয়া যাচ্ছে লাইব্রেরিতে, তবে বইয়ের লাইব্রেরিতে নয়, বরফের লাইব্রেরিতে। চির-বরফের অঞ্চলে নলকূপ খোঁড়ার মতো প্রক্রিয়ায় বহু মিটার লম্বা নিরেট নলাকৃতি বরফ আস্ত তুলে আনা হয়– যাকে বলা হয় আইসকোর। প্রতিবছরের তুষারপাতে নতুন এক স্তর বরফ জমে জমে এই আইসকোরে রয়েছে হাজার বছরের বরফ। গত বছরেরটি সবার ওপরে, আর প্রাচীনতমটি সবার নিচে। স্তরের অবস্থান থেকে বলা যায়, কোন বরফ কোন বছরের। আর তাতে আটকা-পড়া বুদবুদের মধ্যে জমা বাতাস বিশ্লেষণ করে জানা যায় সে বছর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কত ছিল। তা ছাড়া সাধারণ পানির সঙ্গে সব সময় খুব সামান্য পরিমাণে ভারী আইসোটোপ গঠিত ভারী পানি থাকে। ওই স্তরের বরফে ভারী পানির অনুপাতটি তখনকার গড় উত্তাপটিও নিখুঁতভাবে বলে নিতে পারে।

এতে দেখা যাচ্ছে, এক হাজার বছর আগে থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় সমান থেকেছে ২৮০ পিপিএম (পার্ট পার মিলিয়ন)। এই সময় গড় উত্তাপও প্রায় সমান থেকেছে ১৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এর পর থেকে হঠাৎ আশ্চর্যজনকভাবে দুটিই সমানে বেড়েছে, ক্রমবর্ধমান হারে। স্পষ্টত শিল্পবিপ্লবই এর কারণ। অতি সাম্প্রতিককালে এসে বাড়ার হার অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে– ২০০৭ সালে হয়েছে ৩৫০ পিপিএম আর ১৪ দশমিক ৪ ডিগ্রি। এই শূন্য দশমিক ৬ ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু এর তাৎপর্য অনেক।

উত্তাপ বৃদ্ধির প্রথম নাটকীয় ফল হয়েছে উত্তর-দক্ষিণ মেরুর চারদিকে অনেকখানি জায়গায় বহু যুগ ধরে সঞ্চিত বরফ গলতে থাকা। সম্প্রতি উপগ্রহ থেকে পর পর বছরগুলোতে ছবি নিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এই বরফ-এলাকা দ্রুত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। বরফ-গলা পানি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়াচ্ছে– যার বড় ভুক্তভোগী বাংলাদেশ। অকুস্থলে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) স্থাপন করে ক্রমে দ্রুততর বরফ-গলার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। বড় আশঙ্কার কথা হল, এর মধ্যে চক্রবৃদ্ধি হারের একটি পাগলা ঘোড়া কাজ করছে। উত্তাপ বাড়ছে বলে বরফ গলছে। বরফ গলছে বলে চকচকে বরফ থেকে আগে সূর্যকিরণ প্রতিফলিত করে উত্তাপ যেটুকু কমত, এখন আর তা হচ্ছে না। ফলে উত্তাপ আরও দ্রুত বাড়ছে। তাই বরফ আরও দ্রুত গলে প্রতিফলন আরও দ্রুত কমছে। এভাবে একটি আর একটিকে ক্রমাগত

উস্‌কে দিয়ে চলেছে চক্রবৃদ্ধি। এ রকম চক্রবৃদ্ধি আরও কয়েকটি রয়েছে। সমুদ্রের পানি আগে যত কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করে আটকে রাখতে পারত, উত্তপ্ত হলে তা পারে না, বাতাসে ছেড়ে দেয়। তাতে উত্তাপ আরও বাড়ে, ফলে বাতাসে ছেড়ে দেওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডও বাড়ে। আরও একটি চক্রবৃদ্ধি হল, উত্তরের বিস্তীর্ণ জায়গায় একটু তলার মাটি রয়েছে বরফ-শীতল হয়ে পার্মাফ্রস্ট রূপে। উত্তাপ বাড়াতে এর সঙ্গে জমে থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইড ও মিথেন (উভয়ে গ্রিনহউস গ্যাস) বাতাসে যাচ্ছে। ফলে উত্তাপ আরও বাড়ছে, পার্মাফ্রস্ট আরও দ্রুত গ্যাস ছাড়ছে।

প্রশ্ন হল, সামনে এরা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এর উত্তর পাচ্ছি সম্প্রতি অতি উন্নত কম্পিউটার মডেলিং থেকে। জোয়ার মাপার টাইডগেজ থেকে সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা অনেক দিন ধরে মাপা হচ্ছে, এখন উপগ্রহের সাহায্যেও মাপা হচ্ছে। ১৯৯২ সালের কাছাকাছি বছরগুলোতে এটি বছরে ২ দশমিক ৮ মিমি হারে বেড়েছে। বর্তমানে এই বার্ষিক বৃদ্ধি ৪ মিমিতে দাঁড়িয়েছে। আমাদের খুলনার কাছে স্থানীয় পরিমাপে বৃদ্ধি ৫ দশমিক ১৮ মিমিও পাওয়া গেছে। সমুদ্রে এই পানি বৃদ্ধির পুরোটা বরফ-গলার ফল নয়, এর বেশির ভাগ অধিক তাপে পানি আয়তনে সম্প্রসারিত হওয়ার ফল। সমুদ্রে উষ্ণতর পানির আরেকটি ফল হল অধিক বাষ্পীভবন, যা আবার জমে পানি হওয়ার সময় প্রচুর সুপ্ততাপ বের হয়ে আসে। এটিই ঘূর্ণিঝড়ের শক্তি জোগায়। ১৯৭০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত জরিপে দেখা গেছে, এ সময় তীব্রতর ঘূর্ণিঝড়গুলোর সংখ্যা (ক্যাটগরি ৪ ও ক্যাটাগরি ৫) ১৬ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশ হয়েছে। আমাদের সিডর বা আইলাজাতীয় ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ক্রমে যে বাড়বে এ তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

এসব উপাত্ত নিয়ে আমাদের মডেল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী বলছে, তা আগামী দশকগুলোতে, পঞ্চাশ বছর কিংবা এক শ বছর পর কী হবে, তার প্রায় নিখুঁত ভবিষ্যদ্বাণী দিতে পারছে। অবশ্য ভবিষ্যতে আমাদের আচরণের বিভিন্ন দৃশ্যকল্পের জন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী বিভিন্ন হচ্ছে। সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক দৃশ্যকল্পে আমরা যেভাবে চলছি, সেভাবে বা তার চেয়েও খারাপভাবে চলব। উন্নত, উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা ক্রমে বাড়বে, বাড়বে জৈব বর্জ্য ও তার থেকে মিথেন নিঃসরণ। এসবের প্রতিকারে কথা হবে মেলা, কাজ হবে নগণ্য। যারা সুবিধায় আছে তারা আসলে ছাড় দেবে খুবই সামান্য। সে ক্ষেত্রে মডেল দেখাচ্ছে এ পর্যন্ত শূন্য ৬ ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধি এ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বেড়ে ১০ গুণ হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়বে অন্তত এক মিটার, বাংলাদেশের অন্তত ১৭ শতাংশ সমুদ্রে চলে যাবে। আরও ভয়ানক আশঙ্কা হল উত্তাপ বৃদ্ধি ২ দশমিক ৪ ডিগ্রি অতিক্রম করলে সেই পাগলা ঘোড়া এমন লাফ দেবে যে মেরু অঞ্চলের সব বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠ কয়েক মিটার বাড়বে। এ রকম পরিস্থিতি কল্পনা করতেই শিউরে উঠতে হয়। সেই সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরা, কৃষি ও খাদ্য ধ্বংস ইত্যাদি যোগ করলে তো কথাই নেই। এরপর পৃথিবীটি আর কত দিন মানুষের বা অন্যান্য প্রাণীর বাসযোগ্য থাকবে, সেটিই হবে চিন্তার বিষয়।

অন্যদিকে সবচেয়ে কাম্য দৃশ্যকল্পটিতে সর্বত্র মানুষের সব কর্মকাণ্ড নাবয়নযোগ্য শক্তিতে চলবে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সহযোগিতা এমন পর্যায়ে যাবে যে ভোগ বাড়ানো নয়, পৃথিবীকে সবার জন্য স্বচ্ছন্দ করাটাই হবে লক্ষ্য। দারিদ্র্য দূর হয়ে শেষোক্তদের পক্ষেও এতে অবদানের ক্ষমতা বাড়বে, জনসংখ্যা কমবে, সব জৈব বর্জ্য রিসাইকেল হবে, জ্ঞান ও সেবানির্ভর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড দেশে দেশে সমতা ও সুবিচার বাড়াবে। মডেল বলছে, এই দৃশ্যকল্প পূর্ণ বাস্তবায়িত হলেও অতীত পাপের কারণে কিছু ক্ষতি হবেই, তবে তা সহনশক্তির মধ্যে থাকবে। শতাব্দীর শেষে গিয়ে গড় উত্তাপ বৃদ্ধি ২ দশমিক ৪ ডিগ্রি নিচে থাকবে। সমুদ্রপৃষ্ঠ ১০ সেন্টিমটিারের বেশি বাড়বে না। আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা নিজকে রক্ষার ও উন্নত জীবন গড়ার সুযোগ পাব।

এখন কোপেনহেগেনে বিশ্বসমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আমরা কোন দৃশ্যকল্প বেছে নেব।

[লেখক: অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।]

জলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশ

মি জা নু র র হ মা ন

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবর্তন যেভাবে ঘটছে সেটা অবাক হওয়ারই মতো। ছোটবেলায় আমরা মৃদুমন্দ বাতাস দেখেছি, সেই নির্মল বাতাসে আমরা খেলা করেছি। স্বচ্ছ পানিতে সাঁতার কেটেছি, স্বচ্ছ পানি আমরা পান করেছি। তখন পাখি ছিল, গাছ ছিল, প্রাকৃতিক নিয়মে গাছে গাছে ফুল ফুটত, সেই ফুল থেকে ফল হত, সেই ফল প্রাকৃতিকভাবে পেকে খাওয়ার উপযোগী হত। সকালবেলা ফুরফুরে বাতাসে মানুষজন হাঁটত, ব্যায়াম করত, দূষণমুক্ত খাবার খেত। সব মিলিয়ে প্রকৃতিই তখন আমাদের আগলে রাখত। সে কারণে তখন মানুষ সুস্থ থাকত, অনেক দিন আয়ু পেত এবং এত চর্মরোগ, হৃদরোগ তখন ছিল না।

কিন্তু সবকিছুই এভাবে বদলে গেল কেন? মুক্তিযুদ্ধে এই দেশ বিজয়ী হয়ে যখন স্বাধীনতা লাভ করল তখন দেশটির জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি। গত ৩৫-৪০ বছরে এক বিন্দু জমিও বাড়েনি; সেই একই জমির ওপর বাড়তি ৯-১০ কোটি মানুষের খাদ্য, বাসস্থানের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়েছে। একই পরিমাণ জমির ওপর এতগুলো বাড়তি মানুষের খাদ্য অর্থাৎ চাল, ডাল, আলু, গম ইত্যাদি ফসল ফলাতে গিয়ে হাইব্রিড পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে। আর হাইব্রিড মানেই হল ক্যামিক্যাল ব্যবহার করা। জমিতে অধিক ফসল ফলাতে গিয়ে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করতে হয়– ইত্যাদি কারণে আমাদের মাটি ও পানি দূষিত হয়ে যায়। এটি হল একটি দিক।

অন্যদিকে অতিরিক্ত মানুষের জন্য পোশাক, ঘরবাড়ি তৈরির দ্রব্যাদি উৎপাদন করার জন্য কারখানা সৃষ্টি করতে হয়েছে। এছাড়া মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি আরাম আয়েশী ও ভোগবাদী হয়েছে। সে জন্য নতুন নতুন কলকারখানা সৃষ্টি হয়েছে। সেই কলকারখানার চাকা ঘোরাবার জন্য জ্বালানিশক্তি পোড়াতে হয়েছে এবং সেই জ্বালানি তৈরির জন্য অন্য জ্বালানি ব্যবহার করতে হয়েছে। এইসব কারণে কারখানা থেকে অতিরিক্ত কার্বন-জাতীয় গ্যাস নিঃসরিত হয়েছে। এই কার্বন গ্যাসই পৃথিবীর জন্য এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের জন্য মরণফাঁদ হয়েছে। এই কার্বন গ্যাসের জন্য তাপমাত্রা বেড়ে গেছে যার ফলে বরফ বেশি গলছে এবং বাংলাদেশের জলবায়ু ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে।

বৃষ্টির দিনে বৃষ্টি নেই, শীত কালে শীত নেই আবার কোনো দিন এমন বৃষ্টি হয় যে জলাবদ্ধতা তৈরি হয়ে যায়, ফসল ডুবে যায়। শীতের দিনেও কোনো কোনো দিন এমন শীত পড়ে যা সহ্যক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

বাংলাদেশে যে ছয় ঋতুর একটি ব্যাপার ছিল সেটা এখন আর নেই। বিশ্বের অনেক দেশ ঘুরে দেখেছি, সেসব দেশে প্রচুর গাছ লাগিয়ে এবং দূষিত কার্বন গ্যাসকে প্রক্রিয়াজাত করে জলবায়ুর উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যদিও অতি উন্নত দেশগুলো এত বেশি কার্বন নির্গমন করে যা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে যার দায় অবশ্য তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছে।

তবে মরু অঞ্চলের কোনো কোনো দেশ, বিশেষ করে আমি আবুধাবিতে দেখেছি, সমুদ্র থেকে পাইপের মাধ্যমে কিংবা খাল কেটে তার পানি নিয়ে সেই পানি দ্বারা কৃষিকাজ চালাচ্ছে। মরুভূমির মধ্যেও ফুলের আর ফলের বাগান তৈরি করে উষ্ণ মরুভূমির জলবায়ুকে শীতল আর মৃদুমন্দ করে তুলেছে। ওরা পারে কিন্তু আমরা পারি না কেন? আমাদের বাতাস তো এমনিতেই জলীয় বাষ্প পূর্ণ ছিল। আমাদের দক্ষিণে সমুদ্র আছে, উত্তরে বরফের পাহাড় আছে, আমাদের নদ-নদী আছে। এদেশে গাছ লাগালেই হয়। অথচ এত সুন্দর একটি দেশের জলবায়ু আজ হুমকির সম্মুখীন। নিশ্চয়ই উন্নত দেশ এক্ষেত্রে অনেকখানি দায়ী কিন্তু আমাদের যতটা অপরাধ আছে সেটা নিজেদেরটা নিজেরা কেন শুধরে নেই না। আমাদের স্বভাব কেন আমরা পরিবর্তন

করি না। জাতি হিসেবে আমরা তো শান্তিকামী, মুক্তিকামী, সেই জাতির কেন এই দশা হবে? আমরা কি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কোনো স্বচ্ছ বাতাস আর পানির দেশ রেখে যেতে পারি না?

দেখা গেছে মানুষ যখন প্রাকৃতিক নিয়মের খুব বাইরে এসে জোর খাটিয়ে কিছু করতে চায় তখনই প্রকৃতি বিরূপ আচরণ করতে শুরু করে। আমাদের নদীগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে, খাল-বিল ভরাট করে ফেলা হচ্ছে, গাছ নিধন করা হচ্ছে আবার গাছ কিছু লাগানো হলেও ফলের গাছ লাগানো হচ্ছে না, ইউক্যালিপটাস-জাতীয় গাছ লাগানো হচ্ছে। কাজেই প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে না থেকে প্রকৃতিকে যে দিন দিন আঘাত করা হচ্ছে, এতে করে প্রকৃতিও বিরূপ হয়েছে। আমরা তাই প্রকৃতির অভিশাপের মধ্যে পড়েছি। আজ আমাদের জলবায়ু উষ্ণ, বাতাসে ও পানিতে দুর্গন্ধ। সব মিলিয়ে আমাদের পৃথিবী আজ বিপন্ন হতে বসেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, আগামী একশ বছরে পৃথিবীতে ৫/৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কার্বন গ্যাস বেড়ে যাবে। এতে করে গরমে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠবে এবং অতিরিক্ত বরফ-গলা পানি সমুদ্রে পতিত হবে এবং সমুদ্রের পানি আরও বেড়ে যাবে– এতে করে কিছু দেশ সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে। বাংলাদেশ সমুদ্র-উপকূবর্তী একটি দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের একটি অংশ সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে। এছাড়া সমুদ্রের লবণাক্ততা বাংলাদেশের ফসলীজমির ভীষণ ক্ষতি করছে এবং ভবিষ্যতে আরও ক্ষতি করবে।

সার্বিকভাবে বিশ্ব আজ একমত হয়েছে যে, জলবায়ু একটি সমস্যা। এটি একটি নীতিগত অগ্রগতি। এই নীতিগত সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়নের পথ খুবই কঠিন তবে অসম্ভব নয়। জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ সেখানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে, এটি আমাদের জন্য অবশ্যই আশার কথা। তবে এটা ঠিক যে, জলবায়ু যেহেতু বাংলাদেশের একার কোনো সমস্যা নয়, সে-কারণে এই সমস্যা মোকাবেলা করাও বাংলাদেশের একার কোনো কাজ নয়। পৃথিবীর সকল দেশ একযোগে মেনে নিয়েছে যে, এটি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা; এই সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে, সে-বিষয়ে আলোচনা চলছে। সমাধানের উপায় মোটেও সহজ নয়, তবে আলোচনার পর আলোচনা হচ্ছে; উপায় খুঁজে বের করার জন্য উদ্যোগ চলছে। বাংলাদেশ সেখানে সবার সঙ্গে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই আছে। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এই কৃষিপ্রধানও প্রকৃতি নির্ভর। কাজেই জলবায়ুর আরও বিপর্যয় ঘটলে বাংলাদেশের কৃষি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং বাংলাদেশের স্বার্থেই এই বিপর্যয়ের হাত থেকে পৃথিবী রক্ষা পাক, সেটা সকল দেশ যেমন চাইছে– সেই সঙ্গে বাংলাদেশও চাইছে এবং বিপর্যয় ফেরানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

জলবায়ু-বিপর্যয় মোকাবেলা: বিরোধের মূলে বাণিজ্যস্বার্থ

হো মা য় রা আ হ্ মে দ

জলবায়ু ও পরিবেশ আন্দোলন বর্তমান বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে গত বছরের ডিসেম্বর মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব-জলবায়ু সম্মেলনকে কেন্দ্র করে পুরো বিষয়টি এখন সর্বত্র আলোচনা ও উদ্বেগের বিষয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক প্রভাবিত দেশগুলোর অন্যতম। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আমাদের জন্য কোনো কাগুজে বিষয় নয়, নির্মম বাস্তবতা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রাদুর্ভাব সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোয় দারিদ্র্যের তীব্রতা। একটি ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই আরেকটি দুর্যোগ হানা দিচ্ছে। হতদরিদ্র মানুষের ওপর এর প্রভাব তাই পড়ছে মারাত্মকভাবে। ত্রাণ, পুনর্বাসন, সতর্কীকরণ থেকে শুরু করে অন্য সব পদক্ষেপ স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন ও চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না।

জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে তাই খাপ খাওয়ানো ও পরিস্থিতি উন্নতির কৌশল (Adaptation and Mitigation Strategy) খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু এগুলো সবই স্বল্পমেয়াদি প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। অথচ দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মোকাবিলার জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী নয়, বরং বিশ্বের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর এই কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। আর দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণের প্রথম ধাপটি হচ্ছে উন্নত ও স্বল্পোন্নত নির্বিশেষে বিশ্বের সব দেশের গ্রিনহাউস গ্যাস বা কার্বন নিঃসরণ কমানো।

যেহেতু বর্তমানে বিশ্ব একটি অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তাই শিল্পায়ন সীমিতকরণের মাধ্যমে এই পদক্ষেপটি নিতে উন্নত দেশগুলো তো বটেই, স্বল্পোন্নত ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোও নারাজ। কেননা, এ জাতীয় যেকোনো কর্মসূচি বিশ্ববাণিজ্যের ওপর প্রভাব ফেলবে। অন্যদিকে উন্নত জীবনযাত্রা ও আধুনিক সরঞ্জামে ভরপুর জীবনাচার থেকে সরে আসতে উন্নত দেশের জনসাধারণ অনাগ্রহী। আর তাদের উন্নত জীবনযাত্রার মানের কারণে ধনী দেশগুলোর জনসংখ্যা তুলনামূলকভাবে খুব কম হওয়ার পরও তাদের মাধ্যমে দূষণের হার গরিব ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি। জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের এই টানাপোড়েনে সরকার ও জনসাধারণ সবাই পড়েছে উভয় সংকটে। এ কারণেই

কোপেনহেগেন সম্মেলন যে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে শুরু হয়েছিল, তা কার্যত পূরণ করতে পারেনি।

তবে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনের এ ফল একেবারে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। কারণ, উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও পরিবেশনীতির মধ্যে একটি স্পষ্ট বিরোধ রয়েছে। তাদের সবচেয়ে বেশি দূষণকারী কলকারখানাগুলো সর্বাধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। আবার বর্তমান সময়ে দূষণ কমানোর চেয়ে কর্মসংস্থান বাঁচানো তাদের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোপেনহেগেন সম্মেলনের আগে ও পরের ঘটনাগুলো উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে যে যুক্তি ও পাল্টাযুক্তির অবতারণা করেছে, তা একটি আন্তর্জাতিক গেম থিয়োরির প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায়।

এ ক্ষেত্রে পক্ষ রয়েছে তিনটি। প্রথমটি অবশ্যই উন্নত বিশ্ব, যারা সর্বাধিক শিল্পায়ন ও জীবনযাত্রার মানের কারণে দূষণের সিংহভাগের জন্য দায়ী। দ্বিতীয়টি মাঝারি আয়ের উন্নয়নশীল ও অগ্রসর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো (ভারত, চীন প্রভৃতি), যাদের রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে এবং জীবনযাত্রার মানও ক্রমান্বয়ে উন্নত হচ্ছে। তৃতীয় পক্ষটি হচ্ছে হতদরিদ্র ও নিম্নআয়ের দেশগুলো, যাদের শিল্পায়ন সবচেয়ে কম, জীবনযাত্রার মান সর্বনিম্ন, অথচ অনুপযোগী ও অসচেতন পরিবেশনীতির কারণে দূষণের পরিমাণ একেবারে কম নয়। এই তৃতীয় ধরনের দেশগুলোই আবার পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রত্যক্ষভাবে সর্বোচ্চ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ এই তৃতীয় দলটির অন্তর্ভুক্ত। অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ আমাদের পরিস্থিতিকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছে।

প্রথম দুই ধরনের দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। কেননা, ভারত বা চীনের রপ্তানির সিংহভাগ যায় উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর চাহিদা মেটাতে। অন্যদিকে বিপুল জনসংখ্যার এ দুটি দেশ আবার আমেরিকা, কানাডা ও ইউরোপের অনেকগুলো দেশের পণ্যের বিশাল বাজার। কাজেই একদিকে যেমন উন্নত দেশগুলো ভারত বা চীনের শিল্পায়ন কমানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করে নিজেদের আমদানি ব্যয় বাড়াতে পারে না, তেমনি আবার অভ্যন্তরীণ শিল্পায়ন সীমিত করে ও দূষণ কমিয়ে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে তাদের রপ্তানিমুখী শিল্পের অর্থনৈতিক সুবিধায় ছাড় দিতে পারে না। আর তাই যেকোনো 'সবুজ' পরিবেশনীতি গ্রহণের ক্ষেত্রে 'অন্যেরা আগে করলেই করা হবে'– এ রকম শর্তাধীন হয়ে পড়ছে। তবে কেউই প্রথম পদক্ষেপটি নিতে রাজি হয় না এ আস্থার অভাবে যে, একবার চুক্তি স্বাক্ষর করে ফেললে যদি অন্যরা কথা না রাখে তাহলে স্বাক্ষরকারী দেশ বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছিয়ে পড়বে।

অন্যদিকে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিযোগী। কিন্তু এরা আবার পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। সঙ্গত কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন এবং এ জন্য সংঘটিত দুর্যোগ মোকাবিলা ও পুনর্বাসনে এসব দেশ যেমন উন্নত ও মাঝারি আয়ের দেশগুলোর কাছে ক্ষতিপূরণ চেয়েছে, তেমনি আবার

সর্বাধিক দূষণকারী দেশগুলোকে চুক্তি স্বাক্ষর করার মাধ্যমে স্থায়ীভাবে দূষণ হ্রাস করার ব্যাপারে আবেদন জানিয়েছে।

সমস্যা হল, শিল্পায়ন ও অবকাঠামোগত দিক থেকে আবার এসব দেশ উন্নত তো বটেই, মাঝারি আয়ের উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকেও অনেক পিছিয়ে আছে। কাজেই পরিবেশ দূষণজনিত পুনর্বাসনের জন্য পাওয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ যদি তারা শিল্পায়নের কাজে ব্যয় করে, তবে একদিকে দূষণ বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে, আবার অন্যদিকে সুলভ শ্রমিকের কারণে উৎপাদন ব্যয় কমিয়ে তারা রপ্তানিমুখী শিল্পে মাঝারি আয়ের দেশগুলোর শক্ত প্রতিযোগী হিসেবে আবির্ভূত হবে। স্বাভাবিকভাবেই ভারত ও চীনের মতো দেশগুলো তীব্র প্রতিযোগিতার বিশ্ববাজারে আরও প্রতিযোগিতার মুখে পড়তে চায় না। ফলে কৌশলগতভাবে তারা কোনো অঙ্গীকার করছে না। এর পাল্টা জবাব হিসেবে উন্নত দেশগুলোও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে চুক্তি স্বাক্ষর করছে না। তাই সার্বিক ফলাফল থেকে যাচ্ছে শূন্য।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোপেনহেগেন সম্মেলনে বাংলাদেশের ব্যাপারে পশ্চিমা সাংবাদিক ও পরিবেশবাদীদের একটি মন্তব্য সবার নজর কেড়েছে। সেটি হল, 'বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনের একটি স্বাদ আছে: এর স্বাদ নোনতা।' কেবল বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছ্বাসই নয়– লবণাক্ততা আমাদের দুর্যোগপীড়িত জনজীবনে যোগ করেছে এক নতুন মাত্রা, যা কেবল কৃষিই নয়, দৈনন্দিন জীবনেও তৈরি করছে বিপর্যয়। কাজেই যখন একজন প্রথম বিশ্বের নাগরিকের মন্তব্য পড়ি, 'বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয় মাথা না ঘামিয়ে কার্যকরী বন্যানিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দিলে বেশি উপকৃত হবে', তখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে–আর কতদিন পৃথিবীর ক্ষমতাশীল ধনী দেশগুলো তাদের অবিমৃষ্যকারিতার দায় এড়িয়ে যাবে।

বিশ্বব্যাপী পরিবেশবিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আগে যা আশঙ্কা করা হয়েছিল, তারচেয়েও বেশি ভয়াবহ হবে। আর এর প্রমাণও পেতে শুরু করেছে বাংলাদেশ, মালদ্বীপসহ অন্যান্য দ্বীপ ও সন্দ্বীপ দেশগুলো। বিগত ডিসেম্বরের (২০০৯) ভয়াবহ তুষারঝড় উত্তরের উন্নত দেশগুলোতেও ডেকে এনেছে অভূতপূর্ব দুর্যোগ। কাজেই এ সমস্যা কোনো ব্যক্তি বা জাতিগোষ্ঠীর নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের। এখনই সর্বতোভাবে সংযমী হয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' আমরা সম্ভবত এড়াতে পারব না।

[লেখক: গবেষক, বিআইডিএস।

জলবায়ুর অতিপ্রচার দারিদ্র্যের মূলপ্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছে

আ বু ল বা র কা ত

[আজ ৩০ মে ২০১০। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতা'র পক্ষ থেকে আমরা মুখোমুখি হয়েছি দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের। হালখাতা'র এবারের বিষয় 'বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব'। আজ জনাব বারকাতের কাছ থেকে বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় ও বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব-এর অর্থনৈতিক দিক নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব জানতে চাইব। তিনি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সভাপতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।]

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় নিয়ে নানারকম আলোচনা, সমালোচনা, প্রতিক্রিয়া, প্রতি-প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও কোপেনহেগেনে সর্বশেষ বিশ্বসম্মেলন হয়ে গেল। আগামী ডিসেম্বরে আবার বিশ্বসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে কানকুনে। এমতাবস্থায় জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা প্রচেষ্টার অর্থনৈতিক দিকটি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে চাইব।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দারিদ্র্য একটি বড় বিষয় আপনি দারিদ্র্যের আসল কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে-বিষয়গুলোর কথা সবসময় বলে থাকেন, আপনার কি মনে হয় "বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়" দারিদ্র্যের সেই আসল কারণকে কোনোভাবে প্রভাবিত করছে?

আবুল বারকাত

প্রথমেই বলে রাখি আমি কোনো জলবায়ু বিশেষজ্ঞ নই। বিষয়টি নিয়ে যেহেতু এত বেশি আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে, স্বাভাবিকভাবেই নানামুখী আলোচনা, যুক্তি, পাল্টালোচনা, অতিযুক্তি দেখে আমার মধ্যেও কিছু চিন্তাভাবনা জন্ম নিয়েছে। এর আলোকেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দিতে চেষ্টা করব। জলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলার কারিগরি দিক নিয়ে নয় বরং এর অর্থনৈতিক দিকগুলো নিয়ে আমার কিছু মতামত রয়েছে। কোনো বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কথা বলতে চাইলে, ওই বিষয়ের সঙ্গে

সরাসরি সম্পৃক্ত থাকলে সেটা অনেক বেশি বস্তুনিষ্ঠ হয়; সেক্ষেত্রে আমার কথাগুলো খুব বেশি তথ্যভিত্তিক না-হলেও অবশ্যই উদ্দীপনামূলক হবে... জলবায়ু বিষয়টি বাংলাদেশের দারিদ্র্যের মূল কারণকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে। আমরা দারিদ্র্যের আসল কারণ হিসেবে বলি– বিভিন্ন সম্পদসহ ভূমি বা জলার ওপর গরিব মানুষের অধিকার বা মালিকানা বা অভিগম্যতা না থাকা। তখন আমাদের বলা হয় ওগুলো থেকেই-বা কী লাভ? জানি তো সব ডুবে যাবে। অতএব ভূমি সংস্কার, জলা সংস্কার, কৃষি সংস্কার– এসব বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। গত ৫০/১০০ বছরে যেহেতু এরকম কিছু হয়নি এবং ভবিষ্যতে এগুলো ডুবে যাবে তাই এসব বিষয়ে চিন্তা করার কোনো প্রয়োজনও নেই। অনেকে মুখ ফুটে এসব কথা না বললেও এটা অনেকেরই একটা যুক্তি। আর যুক্তি বলছি এ কারণে যে যখনই আমরা এসব বিষয়ে কথা বলি তখনই জলবায়ুর বিষয়টাকে সামনে নিয়ে আসা হয়। কাজেই আমার কাছে মনে হয় জলবায়ু পরিবর্তন একটা রিয়েলিটি এবং এটাকে কেন্দ্র করে বড় মাপের একটা রাজনীতি হচ্ছে। যে রাজনীতির ফলে জলবায়ুর অতিপ্রচার দারিদ্র্যের মূলপ্রসঙ্গ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে দিচ্ছে। এটা শুধু জলবায়ুর ক্ষেত্রেই না– অনেক ক্ষেত্রেই এরকম ঘটে থাকে বলে আমরা জানি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমরা এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু পত্র পত্রিকায় এই প্রসঙ্গ আড়াল করবার জন্য অন্যান্য বিষয়কে অনেক গুরুত্ব দিয়ে বড় বড় নিবন্ধ ছাপা হয়– জ্বালানি তেলের দাম বাড়ছে বিদ্যুৎ ঘাটতির কারণে বিনিয়োগ বাড়ছে না ইত্যাদি। এভাবে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের প্রসঙ্গটা যত বেশি রিয়েলিটির দিকে যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে অন্যান্য প্রসঙ্গ বেশি-বেশি সামনে আনা হচ্ছে। অতএব, এটা একটা পুরনো ট্রিকস। এই পুরাতন ট্রিকসেরই নতুন ফরম হতে পারে বিশ্বব্যাপী অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ভিন্ন কিছু ইস্যু নিয়ে বড় বড় মাপের সম্মেলন সভা সেমিনার ইত্যাদি করা।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়ের প্রেক্ষিতে অনুন্নত বা দরিদ্র্য দেশগুলোর একটি মহলের দাবি, দরিদ্র্য দেশগুলোকে উন্নত বা ধনী দেশগুলোর– পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের সমস্ত দায় ধনী দেশগুলার– এব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?

আবুল বারকাত

ধনী দেশগুলোর কাছে দরিদ্র দেশগুলোর জলবায়ুগত কারণে এই ক্ষতিপূরণ চাওয়া অযৌক্তিক নয়। ধরি, জলবায়ুর পরিবর্তনটা গত তিনশ বছরের একটি ১০০% পরিবর্তন। এই ১০০% পরিবর্তনের দাম হচ্ছে একশ টাকা। এই পরিবর্তনের একটি কারণ হল প্রাকৃতিক এবং অন্যটি হল মানুষের তৈরি। মানুষ সৃষ্ট কারণগুলো, যেমন

শিল্পায়ন, সিএফসি গ্যাস, কার্বন গ্যাস নিঃসরণ ইত্যাদি। এখন আমি যদি হিসাব করে দেখি জলবায়ুর যে পরিবর্তন তা প্রাকৃতিক কারণে হয়েছে ৫০% এবং মানুষের কারণে হয়েছে ৫০% এবং মানুষের কারণে সৃষ্ট পরিবর্তনের ৫০%-এর যদি ৫০ টাকা ধরি তাহলে এই পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি করেছে বিশেষ করে ধনি দেশগুলো। এই ক্ষতি তৃতীয় বিশ্বের কোনো মানুষ করেনি। এখন এই ধনী দেশগুলো যে পঞ্চাশ টাকার ক্ষতি করল; এই ক্ষতির বর্তমান মূল্য পঞ্চাশ টাকা। পরিবেশ দূষণের মাত্রা কিন্তু আজকেই থেমে থাকবে না; ধারাবাহিকভাবে চলতেই থাকবে। এটা পুঞ্জিভূত ক্ষতি। এই ক্ষতির স্টাটিক মূল্য পঞ্চাশ টাকা এবং ডায়নামিক ক্ষতি হচ্ছে এক হাজার টাকা; এখন এই পুঞ্জিভূত ক্ষতি যদি চলতেই থাকে তাহলে আমি তো এর ক্ষতিপূরণ চাইবই। এখন এই ক্ষতি পোষানোর দায়িত্ব আসলে কাদের? এই ক্ষতি পোষানোর দায়িত্ব চূড়ান্তভাবে ঐ ধনী দেশগুলোর ওপরই বর্তায়।

হালখাতা

ধনী দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধিজনিত জলবায়ু বিপর্যয়ের দায় স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু দায় স্বীকার করে নিলেই তো হবে না; কী বাধ্যবাধকতার কারণে ধনী দেশগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস হ্রাস করার উদ্যোগ বাস্তবিক অর্থেই গ্রহণ করবেন বলে আপনি মনে করেন?

আবুল বারকাত

ধনীদেশগুলো এর দায় স্বীকার করে নিয়েছে এবং তারা ইতোমধ্যে জলবায়ু দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনার জন্য একটা বড় অংকের টাকা কনট্রিবিউট করছে; কিন্তু এর দায়-দায়িত্ব দরিদ্র দেশগুলো কেন নেবে? যাদের কিনা জলবায়ু দূষণের ক্ষেত্রে কোনো দায় নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলো বলছে, না তোমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নিতে হবে না; আমরাই দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনব। কিন্তু আমার কথা হল কমিয়ে আনা তো দায়িত্বের একটা অংশ মাত্র। এবং এর বাধ্যবাধকতার জায়গাটি হল এই কমিয়ে আনাটা বাংলাদেশের কলিমুদ্দি বা সলিমুদ্দির স্বার্থের জন্য করবে না বরং যে কমাচ্ছে তার নিজের দেশের জন্যই সে কমাচ্ছে। অর্থাৎ নিজেরা যে চরম হুমকির মুখে পড়ছে এই কারণেই তারা বাধ্য হচ্ছে এই গ্যাস কমাতে। তাছাড়া তারা নিজেরাও বুঝতে পারছে যে কার্বন গ্যাস নিঃসরণের কারণে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে তার সাথে সহযোগী অনেক বিরূপ ঘটনাও ঘটছে।

হালখাতা

বিশ্বব্যাপী গ্রিন হাউস গ্যাস কমানোর যে যৌথ প্রয়াস চলছে, এতে করে অনুন্নত দেশসমূহের শিল্প-কারখানার ওপর এবং সেদিক থেকে বাংলাদেশের শিল্প-কারখানার ওপর কোনো প্রভাব পড়তে পারে কি?

আবুল বারকাত

আমি মনে করি উন্নয়ন করতে হলে শুধু কৃষির ওপর নির্ভর করলেই হবে না শিল্পায়নেও উন্নতি করতে হবে। শিল্পায়নে উন্নতি করতে হলে জলবায়ু দূষণের ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক কারণ যেগুলো রয়েছে যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনো অক্সাইড, মিথেন– এগুলো তো নিঃসরিত হবেই। তাহলে কি আমাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বলা হচ্ছে তুমি শিল্পায়নে যেও না; আর সেটা যেতে দেয়া না হলে উন্নতির যে মাপকাঠি আছে আমি তো সে মাপকাঠির উপরের দিকে যেতে পারব না। আমাদেরকে কি এটাও বলা হচ্ছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা পৃথিবী যে-জায়গায় চলে গেছে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শিল্পায়ন করে সে-দিকে যাওয়ার দরকার নেই! কেননা শিল্পায়ন মানেই তো জলবায়ু দূষণ করা। তাহলে বিষয়টা কি এরকম যে পৃথিবী দু'ভাগে বিভক্ত; একটা শিল্পে উন্নত পৃথিবী অন্যটা শিল্পে অনুন্নত পৃথিবী? মাঝখানে জলবায়ু দূষণের কথা বলে শিল্পে অনুন্নত দেশকে শিল্পে অনুন্নতই রাখা হচ্ছে! এরকম একটা বড় পলিটিক্স হতে পারে।

হালখাতা

কিন্তু ধনী দেশগুলো তো দরিদ্র দেশগুলোর শিল্প-কারখানা তৈরি করার ক্ষেত্রে সব ধরনের অবাধ সুযোগের কথা মেনে নিয়েছে; এর কারণ হল দরিদ্র দেশে শিল্প-উন্নয়ন যেহেতু একেবারেই হয়নি তাই এসব দেশের শিল্প-উদ্যোগকে তারা বাধাগ্রস্ত করতে চায় না। এব্যপারে আপনার মন্তব্য কী?

আবুল বারকাত

আমার মনে হয় একথা সত্য নয়। ধনী দেশগুলো আমাদের মতো শিল্প-অনুন্নত দেশে যে সব শিল্পের বিকাশ চাই তার মধ্যে আছে ক্ষতিকর কার্বন জাতীয় গ্যাস ও বর্জ্য নিঃসরণকারী শিল্প, শ্রমঘন শিল্প, এবং তাদের পুরাতন প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প, অর্থাৎ এমন কোনো শিল্প তারা আমাদের এখানে চাইবে না যা দিয়ে আমরা তাদের সাথে সম-প্রতিযোগি হতে পারি।

হালখাতা

প্রসঙ্গক্রমে জানতে চাই, অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অনেকটা পাশ কাটিয়ে জলবায়ু যে বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠল– এটাকে আপনি কোন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছেন?

আবুল বারকাত

হ্যাঁ, হঠাৎ করে গত দশ বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়টা বিশ্বের অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখা শুরু হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে যেসব বিষয়কে সম্পর্কিত করা হচ্ছে তার অনেকগুলো বিষয়ই বাস্তব এবং প্রাকৃতিক। কিন্তু এর অন্যান্য বিষয়গুলো নতুন কিছু নয়। যেমন উন্নয়ন-তত্ত্বে একসময় খুব প্রমিনেন্ট একটি ধারা ছিল যারা বলতেন যে অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ যত রকম উন্নয়ন আছে তার সঙ্গে পরিবেশ ও জলবায়ুর সম্পর্ক রয়েছে। তবে পরবর্তী দীর্ঘ সময়কাল ধরে উন্নয়নের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্কের বিষয়ে তেমন কিছুই বলা হয়নি। আবার গত ১০/১৫ বছর ধরে আমরা দেখছি যে জলবায়ু বিষয়টাকে অনেকে জলবায়ু পরিবর্তন বলছেন; অনেকে আবার Climate justice অর্থাৎ জলবায়ু নায্যতা বলছেন। এটা বলে যেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলে আমার ধারণা সেটা হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন মানবসভ্যতাকে এবং বিশেষ বিশেষ দেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এবং এর সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে কতগুলো ধারণা যেমন টেকসই উন্নয়ন, মানব সভ্যতা টিকে থাকা বা না-থাকা, জাতি, গোষ্ঠী টিকে থাকা বা না-থাকা ইত্যাদি ।

হালখাতা

"বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয়" বিষয়টি কি বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক অতি বেশি প্রচার পাচ্ছে? কেউ কেউ অবশ্য এরকম অভিযোগ তুলেছেন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

আবুল বারকাত

সব কিছুরই অতিপ্রচার খারাপ ফল বয়ে আনে। জলবায়ু বিষয়ে অতিপ্রচার তো হচ্ছেই এবং এ জন্য বড় বড় কুফল দেখা দিতে শুরু করেছে। জলবায়ু বিপর্যয় জনিত সৃষ্ট সমস্যার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি না। তবে আমার নিজস্ব ধারণাগুলো একটু ভিন্ন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একসময় বলা হত যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এখন আবার বলা হচ্ছে বিশ্ব গরম হয়ে যাচ্ছে। এবং সে কারণে এন্টার্কটিকা মহাসাগরের বা হিমালয়ের বিশাল বিশাল বরফ গলে যাচ্ছে; এর ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এবং বেড়ে যাওয়ার কারণে যারা সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় আছেন তারা ডুবে যাবেন। আর এই তালিকায় বাংলাদেশ উপরের দিকে ঝুঁকির মধ্যে আছে। এটা হতে পারে। কেননা পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ দেখানো যাবে না যে-দেশ এক কোটি বা দুই কোটি বছর আগে বর্তমানের মতো এমন ছিল। এমন দেশও আছে যারা পাঁচশত বছর আগে বা পাঁচ হাজার বছর আগে এমন ছিল না। এটা প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে হচ্ছে আবার কিছু ঘটছে মানুষেরও কারণে। যেমন যখন বাঁধ দেয়া হয় বা ব্রিজ নির্মাণ করা হয় তখন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে যায়। এমনও দেখা যায় একটা বড় নদীর উপর বিশাল একটা ব্রিজ নির্মাণ করা হল। পঞ্চাশ বছর পর দেখা যায় ঐ নদীটির উপরের ব্রিজটি আছে কিন্তু

নদীটি এখানে নেই; নদীটি স্থান পরিবর্তন করেছে।এ কারণে যখন একটি ব্রিজ নির্মাণ করা হয় তখন ব্রিজ বানাতে যে ব্যয় হয় তার চেয়ে একটু বেশি ব্যয় হয় রিভার ট্রেনিং-এ। অর্থাৎ নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে কী হবে সেটা ঠিক রাখার ক্ষেত্রে। এটা বিজ্ঞান। কাজেই আমার মনে হয় প্রকৃতির যেহেতু নিজস্ব একটা নিয়ম আছে, যেহেতু আমরা অতি বেশি চেষ্টা করি প্রকৃতিকে আমাদের নিজের বশে অনতে, ফলে দেখা যায় একটা সময় পরে প্রকৃতি খুব বেশি পরিমাণে নিজের নিয়মেই অনেক পরিবর্তন করে ফেলে। আমার মনে হয় প্রকৃতিকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের আয়োজনগুলো যথেষ্ট নয়; সেদিকে গুরুত্ব কম দেয়া হচ্ছে অন্যদিকে মানুষকে আতংকিত হওয়ার বিষয়গুলো নিয়ে অতিপ্রচার চালান হচ্ছে।

হালখাতা

তাহলে বড় বড় স্থপতি, ইঞ্জিনিয়র এঁরা যে বলে থাকেন, প্রাকৃতিক নিয়ম, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির ধর্ম নিয়ে গবেষণা করে বিষয়টিকে মাথায় রেখেই তারা সকল পদক্ষেপ গ্রহণ-করেন; তাদের এই সব কথা কি তাহলে ভিত্তিহীন?

আবুল বারকাত

আমার যেটা মনে হয়, আমি যদিও ঐ বিজ্ঞান তত বেশি বুঝি না, সেটা হল প্রকৃতির নিয়ম আমরা এখনও পর্যন্ত খুব বেশি জানি না। কিন্তু প্রকৃতির এই নিয়ম না জেনেই অর্থাৎ তার নিয়মকে জাস্টিফাই না করেই আমরা বাঁধ নির্মাণ করি, ব্রিজ নির্মাণ করি। অর্থাৎ আমরা সত্যিই প্রকৃতিকে সঠিকভাবে না জেনেই জানার ভান করে এসব করে থাকি। আমার মনে হয় আমরা প্রকৃতিকে এখনও খুব বেশি জানি না। কাজেই আমার ধারণা জলবায়ুর পরিবর্তনটা দু'ভাবে হচ্ছে। প্রথমত, প্রকৃতিকে না জেনে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করার কারণে এবং দ্বিতীয়ত, হচ্ছে মানবসৃষ্ট কারণে। যেমন প্রায় দুই তিনশত বছর আগে বিশেষ করে উন্নত বিশ্ব যখন শিল্পায়ন শুরু করল তখন কিন্তু বিজ্ঞান ছিল অর্থাৎ রসায়ন ক্যামেস্ট্রি ছিল, জলবায়ু সংক্রান্ত বিজ্ঞানও ছিল; তখন এসব শিল্প-কারখানায় গ্যাসঅয়েলসহ নানা প্রকার পাওয়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং শিল্পায়ন দিনে দিনে বৃদ্ধি করাও হয়েছে। তখন কিন্তু বলা হয়নি এভাবে ক্রমাগতভাবে শিল্পায়ন বৃদ্ধি করলে গ্যাস-অয়েল পুড়লে উষ্ণতা বাড়বে, দুশ তিনশ বছর পরে বিশ্বজলবায়ুর ওপর এরকম মারাত্মক খারাপ প্রভাব পড়বে।

হালখাতা

উন্নত দেশগুলো এখন যেভাবে সরব হয়েছে সেদিক থেকে দু'শ-তিন'শ বছর আগে জলবায়ু নিয়ে তারা কোনরকম কথা বলেনি– আপনার কি মনে হয় উন্নত দেশগুলো বুঝতে পেরেও বিষয়টি সম্পর্কে তখন চুপ ছিল?

আবুল বারকাত

এমন হতেই পারে বিশ্বপরিবেশের ওপর এরকম খারাপ প্রভাব যে পড়বে এটা আগে থেকেই তাদের জানা ছিল কিন্তু জেনেশুনেও তখন তারা কথা বলেনি। অতএব জানার পরেও যদি বলা না হয়ে থাকে তাহলে এটা বলা যায়, তখন খুব স্বার্থপর উন্নয়নের কথা ভাবা হয়েছিল। তখন হয়তো পশ্চিমের দেশগুলো বা পুবের কোনো দেশের বা আমেরিকা তার একটা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় তাদের নিজস্ব উন্নয়নের কথাই তারা ভেবেছে। এবং তা করতে গিয়ে তারা শিল্পায়নের একক সুবিধাগুলো ভোগ করেছে। এখন এগুলোর ফল তিনশত বছর পর পাওয়া যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জলবায়ু পরিবর্তনের পেছনে যে কারণগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেগুলো হল– প্রথমত, প্রকৃতির নিজস্ব কারণে পরিবর্তন, দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের অভাবজনিত কারণে পরিবর্তন এবং তৃতীয়ত, জ্ঞান ছিল কিন্তু সেটাকে চেপে রাখার কারণজনিত পরিবর্তন। এটা দেশীয় স্বার্থে হতে পারে অথবা শিল্পায়নের স্বার্থেও হতে পারে। এসব স্বার্থজনিত কারণে পরিবেশের এতটাই বিপর্যয় চোখে পড়ছে যে এটা না বলে এখন আর তাদের উপায় নেই। আমার প্রশ্ন হল এটা কেন? এক্ষেত্রে আমার যে ব্যক্তিগত ধারণা রয়েছে সেটা হল দারিদ্র্যের যে আসল উৎস অর্থাৎ আন্ডার লাইন বা রিয়েল কজ, সেখান থেকে আমাদের দৃষ্টিটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়ারই একটা বড় ধরনের প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। এটা দেশীয় কোনো প্রয়াস না, এটা আন্তর্জাতিক একটা প্রয়াস হতে পারে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা সংক্রান্ত সম্মেলনগুলোর আলোচনা-সমালোচনায় উঠে আসা অনেকগুলো ধাপের মধ্যে একটি বড় ধাপ হল "মিটিগেশন"। এই মিটিগেশনের ব্যাখ্যা নানাজন নানাভাবে করছে। আপনার কাছ থেকে মিটিগেশন এবং এই সংক্রান্ত এর অর্থনৈতিক দিকটি সম্পর্কে জানতে চাই...

আবুল বারকাত

জলবায়ু সম্মেলনে "মিটিগেশন" নামে একটি সমঝোতাচুক্তি হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে এটা কোনো চুক্তি নয়, সমঝোতা মাত্র। তা-ও আবার পৃথিবীর সকল দেশ এ-বিষয়ে একমত হয়েছে তা কিন্তু নয়। মিটিগেশন সমঝোতার আওতায় উন্নত দেশগুলো তাদের জন্য নির্ধারিত গ্রিনহাউস গ্যাসের কিছু অংশ হ্রাস করবে নিজ দেশ থেকে এবং কিছু অংশ দরিদ্র দেশ হ্রাস করবে যার ব্যয়ের অর্থটা উন্নত ওই দেশ দিয়ে দেবে। কিন্তু দরিদ্র দেশ যেটুকু কার্বন হ্রাস করবে তার ব্যয় তো চীন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা দিতে অস্বীকার করেছে এবং এই সব দেশ নিজেদের দেশেও গ্রিনহাউস গ্যাস হ্রাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। কারণ হিসেবে তারা বলেছে, শিল্পে এখনো তাদের উৎকর্ষতা আসেনি, সেজন্য তারা শিল্প হ্রাস করতে পারবে না। কার্বন গ্যাস হ্রাস করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রও। যুক্তরাষ্ট্র তার জনগণকে ভোগবিলাসিতা হ্রাস করতে

বলার ক্ষেত্রে অপরাগতা জানিয়েছে। সুতরাং প্রথমত "মিটিগেশন" সমঝোতাটি এখনো পর্যন্ত সর্বদেশ স্বীকৃত নয় এবং দ্বিতীয়ত দরিদ্র দেশের কার্বন হ্রাসের ব্যয়টা দিলেও সেটা কীভাবে দেয়া হবে এবং এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে কি-না– এই বিষয়গুলো পরিষ্কার নয়। ফলে এই ফর্মূলা আদৌ কার্যকর করা যাবে কি-না সেই ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে।

হালখাতা

বিশ্বজলবায়ু বিপর্যয় মোকাবেলা সংক্রান্ত সম্মেলনে একাধিক আলোচনা-সমালোচনায় উঠে আসা আরেকটি বড় ধাপ হল "অ্যাডাপটেশন"। এই অ্যাডাপটেশনের ব্যাখ্যাও নানাজন নানাভাবে করছে; আপনার কাছ থেকে অ্যাডাপটেশন এবং এই সংক্রান্ত অর্থনৈতিক দিকটি সম্পর্কেও জানতে চাই...

আবুল বারকাত

"অ্যাডাপটেশন" হল সমস্যা সমাধানের পথ না-করতে পেরে সমস্যাকে মেনে নিয়ে তার মধ্যেই বেঁচে থাকার নামান্তর। যেমন কারও জ্বর হলে জ্বরের ভাইরাসকে ধ্বংস না-করে শরীরে অনুভূত শীত নিবারণের জন্য অনেক গরম-কাপড়, মোটা কাঁথা ও লেপের সংস্থান করা। এ ধরনের চিন্তা তখনই আসে যখন মূল সমস্যায় আঘাত হানা এবং সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে বা না-থাকে। অ্যাডাপটেশন-এর আর্থিক দিকটিও বেশ মজার; সেটা হল জ্বর না সারিয়ে গরম-কাপড়, কাঁথা ও লেপ কেনার টাকাটা দিয়ে দেয়া। উষ্ণায়ন-এর মধ্যেও যাতে ধানের ফলল ঠিক থাকে সেই ব্যবস্থা করার জন্য আর্থিক ব্যয় যে-সব দেশ থেকে আসবে তারা কতদিন পর্যন্ত এবং কী পরিমাণে অর্থের দায় বহন করবে এটি একটি বিমূর্ত ভাবনা, কারণ এক্ষেত্রে দরিদ্র দেশের প্রাপ্য বুঝে পাওয়ার অধিকারের জায়গাটি পরিষ্কার নয়। যত সম্মেলনই হোক, এটা পরিষ্কার হওয়াও সম্ভব নয়। আর এই ব্যয়যোগ্য অর্থের সঠিক ব্যবস্থাপনাও একটি প্রায় অসম্ভব কাজ।

হালখাতা

ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যেও হালখাতাকে সময় দেয়ার জন্য হালখাতার পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আবুল বারকাত

হালখাতাকেও ধন্যবাদ। এর ধারাবাহিক পথচলার কারণে।

পরিবর্তিত পৃথিবী বিপর্যস্ত কৃষি

শা ই খ সি রা জ

আজ আর সেই পৃথিবী নেই। অনুকূল আকাশ, বিশুদ্ধ বাতাস, উর্বর মাটি, জীবনের হিসেবের সঙ্গে মেলানো জলবায়ু কিছুই নেই। সবই পাল্টে গেছে। সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তই ঠিক আছে শুধু। ঠিক নেই পৃথিবীর উত্তাপ কিংবা উষ্ণতা, ঠিক নেই জীবমণ্ডল, হিমালয়ের হিম কিংবা মেরু অঞ্চলের শুভ্র শীতল বরফময় প্রকৃতি। ঠিক নেই সমুদ্রের গভীর থেকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত প্রাকৃতিক শৃংখলা। ঠিক নেই ভূ-ত্বক এবং মাটির গভীর অঞ্চল। সবই পাল্টে গেছে। শান্ত নিরিবিলি ও অনুকূল প্রকৃতিতে আমরা যেন শত শত বছর অনেকটা ঘুমিয়েই ছিলাম। কেউ কোনোদিন ভালো করে বুঝেও উঠিনি পৃথিবীর এই করুণ দশার পেছনে সব দায় আমাদেরই। এ যেন এক ধরনের ইচ্ছামৃত্যু। অথচ আমরাই মুখে বলি এই ধরিত্রী বেঁচে থাক। বেঁচে থাক জীববৈচিত্র্যের স্বাভাবিক শৃংখলাগুলো। কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিশ্চিত এক আবাসভূমি কি রেখে যেতে পারছি আমরা ?

আসুন তাকাই এই পৃথিবীর দিকে। চারদিকে রীতিমতো শোর উঠেছে এই পৃথিবী আর বোধ হয় টিকবে না। হলিউডের মুভি 'ডে আফটার টুমরো'র কথা কি মনে পড়ে আপনাদের ? কিংবা সাম্প্রতিককালের সিনেমা 'টু থাউজেন্ট টুয়েল্‌ভ'-ই বা কী ইঙ্গিত দিচ্ছে?

হ্যাঁ, এই জীবমণ্ডল এমনই এক অবস্থার মুখোমুখি। পৃথিবীব্যাপী আকস্মিক বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা কিংবা কোনো কোনো অঞ্চলের অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা ও তুষারপাত সেই ইঙ্গিতকেই স্পষ্ট করছে। কোথাও কোথাও প্রকম্পিত হয়ে উঠছে ভূপৃষ্ঠ। যার সর্বশেষ শিকার হাইতি। মুহূর্তেই ২ লাখ প্রাণ নেই। দেশটির এই ধ্বংসস্তূপ গোটা পৃথিবীবাসীকেই জানান দিচ্ছে, আর বোধ হয় ভোগবিলাসে মত্ত থাকার সময় নেই। ঠিক আজ..এই এখন...কেমন আছে পৃথিবী ?

পৃথিবীর যে কুশল দিনে দিনে সবার কাছেই পৌছে গেছে তা আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি –পৃথিবী এখন জ্বরে আক্রান্ত। তাপমাত্রা এত বেশি উষ্ণ যে, এর গড় তাপমাত্রা ২ দশমিক ৮ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে উন্নয়নশীল ও অনুন্নত বিশ্বের ৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যাবে। আর সুপেয় পানির অভাবে পড়বে ৪ বিলিয়ন মানুষ। আবারো বলছি ৪০ কোটি মানুষ পানির জন্য হাহাকার করবে।
এই তথ্যগুলো, এই চিত্রগুলো মনে করিয়ে দেয় ফরাসি নৃতাত্ত্বিক সমাজবিদ ক্লদ লেভি স্ট্রসের সেই মন্তব্য – 'মনুষ্যপ্রজাতি ব্যতিরেকেই বিশ্বজগত তার যাত্রা শুরু করেছিল, এবং নিশ্চিতভাবেই তার সমাপ্তি ঘটবে মনুষ্যপ্রজাতি ছাড়াই'।
কিছুদিন আগেই শেষ হল বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কোপ-১৫। ওই সম্মেলনকে কার্বন নির্গমন বিষয়ক সম্মেলন বললেও ভুল হবে না। গোটা সম্মেলন জুড়েই ছিল কার্বন নির্গমনের আলাপ। উন্নত দেশগুলো কার্বন নির্গমনের প্রশ্নে বহুকাল ধরেই বেসামাল। যার করুণ ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে।
পৃথিবীর বর্তমান পরিণতি নিয়ে হলিউডের চলচ্চিত্রগুলো কিংবা দেশে দেশে তৈরি প্রামাণ্যচিত্রগুলো নিছক কল্পকাহিনী যে নয়, তার পূর্বাভাস দিচ্ছেন বিজ্ঞানীরাই। তারা বলছেন, পৃথিবী এগিয়ে চলেছে এক মহাবিলুপ্তির দিকে। প্রায় দেড় হাজার মিলিয়ন বছরের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে তারা দেখেছেন এ পর্যন্ত পাঁচবার ঘটেছে মহাগণবিলুপ্তি। আর তার কারণগুলো আজকের কারণগুলোর সঙ্গে অনেকটাই মিলে যায়। তা হচ্ছে– অত্যধিক তুষারপাত, উল্কাপাত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, গ্রহানুর আঘাত বা আগ্নেয়গিরি ইত্যাদি। এক একটি বড় ধরনের বিপর্যয়ের জন্য এসব সমস্যা এককভাবে কাজ করলেও আজকের পৃথিবীতে সবগুলো সমস্যা একসঙ্গে জেঁকে বসেছে।

আজ চারদিকে কথা উঠেছে উষ্ণায়নের। সত্যিকার অর্থে পৃথিবীতে বিরাজ করছে এক 'এক্সট্রিম ওয়েদার'। স্মরণকালে এমন চরম আবহাওয়া আর দেখা যায়নি। এভাবে চলতে থাকলে, এক সময় কিছু প্রজাতি বিলুপ্ত হবে, কিছু তাদের স্বকীয়তা হারাবে। সামান্য কিছু প্রজাতি টিকে যাবে। যার ফলাফল খাদ্যশৃঙ্খলে ভাঙ্গন।
আমাদের সামনে দাঁড়াবে, এক. খাদ্য সংকট, দুই. পানি সংকট. তিন. অপ্রতিরোধ্য সংক্রামক রোগ, চার. অসহনীয় জলবায়ু। সত্যি কথা বলতে, এই সবকিছুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা। আসুন আমরা দেখি এশিয়ার চেহারা।

পরিস্থিতি কোথায় দাঁড়ালে মালদ্বীপের রাষ্ট্রপ্রধান সেদেশের মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক করেন সমুদ্রের নীচে...কিংবা নেপাল সরকার বাধ্য হয় হিমালয়ের চূড়ায় উঠতে। এগুলো নিছকই বিশ্ববাসীর সামনে এক প্রতীকী সংকেত। খবর একটাই– পৃথিবী ভালো নেই। জলবায়ু পরিবর্তনে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় ৫৬ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ রয়েছে সবচেয়ে

বেশি ঝুঁকির মধ্যে! কোপেনহেগেন সম্মেলনে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে বাংলাদেশের নাম। অন্যদিকে বিশ্ব-জলবায়ু ঝুঁকি সূচকেও বাংলাদেশের নাম রয়েছে এক নম্বরে। গত ডিসেম্বরে প্রকাশিত ওই সূচকে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পর্যায়ক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশ, মায়ানমান, হন্ডুরাস, ভিয়েতনাম, নিকারাগুয়া, হাইতি, ভারত, ডোমেনিকান রিপাবলিক, ফিলিপিন ও চীনকে।

কোথায় আছি আমরা ? কোন ভয়াবহতা আমাদের গ্রাস করছে? আর কেনই-বা এই পরিস্থিতি ? এসব প্রশ্ন খোঁজার আগে ঠিক আজকের পরিস্থিতি ও পূর্বাভাসগুলো দেখে নিতে পারি আমরা। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পানির স্তর অনেক নীচে নেমে গেছে। যমুনা অববাহিকার জেলাগুলোতে প্রতি বছরের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে বন্যা, উত্তরাঞ্চলে বাড়ছে ভয়াবহ খরা, শীতে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে আসছে, পরিবেশ প্রকৃতির আচরণ হয়ে উঠছে একেবারেই অচেনা।
বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ১৭ ভাগ সাগরে তলিয়ে যাবে, এর বাইরে ৪০ বছরে কুতুবদিয়া এবং ৭০ বছরে ভোলা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর সমুদ্রের উচ্চতা আর মাত্র ৬৭ সেন্টিমিটার বাড়লে সুন্দরবনও হারিয়ে যাবে পানির নিচে। এরই মধ্যে আমাদের জীববৈচিত্র্যের বড় একটি অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ৬৩২টি পাখিপ্রজাতির মধ্যে ১২ প্রজাতি, ২২টি উভচর প্রাণীর মধ্যে ৮টি, ১২৬টি সরীসৃপ প্রজাতির মধ্যে ১৪টি, ১২০টি স্তন্যপায়ী প্রজাতির মধ্যে ১৩টি, ৭০৮টি মাছের প্রজাতির মধ্যে ৫৪টি এবং ১১০টি পশুপ্রজাতির মধ্যে ১০৬টির অস্তিত্ব হারিয়ে গেছে ইতোমধ্যেই।

আরো বিপর্যয় আমাদের কাছে দৃশ্যগত। যা উন্নত বিশ্বের কার্বন নির্গমনের মতোই এক ধরনের অমানবিক শোষণের পর্যায়েই পড়ে। আন্তর্জাতিক নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আমরা পাচ্ছি না। ভারত ফারাক্কা ও তিস্তামুখ বাঁধসহ বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত সবগুলো নদীর মুখে বাঁধ দেয়ার কারণেও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয়েছে মরুকরণ প্রক্রিয়া। ঠিক এই সময়ে দেশের নদীগুলো হাহাকার করছে বুক চিতিয়ে।
আর আমরা নিজেরাই নিজেদের পায়ে কুঠারাঘাত করছি পরিবেশ ও নদী দূষণের মধ্য দিয়ে। যা আমাদের স্বাভাবিক জীববৈচিত্র্য বিলুপ্তি ঘটানোর কাজটি ত্বরান্বিত করছে।
কোথায় যাব আমরা ? অথবা জানতে ইচ্ছে করে কোথায় ঠাঁই হবে এই দেশটির ? পরিণতিই-বা কী হবে ? এই সবগুলোর বিপর্যয় গিয়ে ঠেকবে কৃষিতে। আমাদের অস্তিত্ব যেখানে।

জলবায়ু সম্মেলন ও আমাদের অবস্থান

দিনের পর দিন বিপদ আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তনের নানা প্রভাব আমাদেরকে বিপর্যস্ত করছে। এতদিন এই উদ্বেগ শুধু আমাদের হিসেবে চিহ্নিত হলেও এটি এখন আর শুধু আমাদের নয়। ইতোমধ্যেই চিহ্নিত হয়ে গেছে আমাদের এই দেশটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠার পেছনে দায় কাদের। শিল্পোন্নত বিশ্বের মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমনের প্রভাবে পৃথিবীর জলবায়ুগত সকল স্বাভাবিকতাই দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। যেটি ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের উপর দিয়ে স্মরণকালের বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় 'সিডর' আক্রমণ হওয়ার পর নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের এই পরিণতি উন্নত দেশগুলোর বেসামাল আচরণের এক মারাত্মক প্রভাব ছাড়া কিছু নয়। এখন অবশ্যই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-জলবায়ু সম্মেলনে যেমনটি বলেছেন আমরাও বলছি উন্নত দেশগুলোকে ব্যাপক কার্বন নির্গমন হ্রাসে অবশ্যই আইনগত বাধ্যবাধকতার আওতায় আসতে হবে। এই আইনগত বাধ্যবাধকতা সৃষ্টিই এবারের জলবায়ু সম্মেলনে আমাদের অর্জন হিসেবে সূচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ২০২০ সাল নাগাদ শিল্পোন্নত দেশগুলোকে ১৯৯০ সালের পর্যায় থেকে অবশ্যই ৪৫ শতাংশ কার্বন নির্গমন হ্রাস করতে হবে। ২০১৫ সাল হতে হবে সর্বোচ্চ কার্বন নির্গমনের বছর। ২১০০ সালের মধ্যে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাত্রা ৩৫০ পিপিএমে নামিয়ে আনতে হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতার পরিমাণ রাখতে হবে এক দশমিক পাঁচ ডিগ্রির নিচে। তবে কোনো কারণেই তা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে মেনে নেয়া হবে না। ইতোমধ্যে আমরা সিডর, আইলা, প্রলম্বিত বন্যার মতো বড় বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় পার করেছি। আমাদের সামনে রয়েছে ভয়াবহ সব সংকেত। ২০৫০ সাল নাগাদ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশের ১৮ শতাংশ ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবে। ২ কোটি মানুষ জলবায়ু-উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে এবং ৪ কোটিরও বেশি মানুষ তাদের জীবনযাত্রা হারিয়ে ফেলবে। অবশ্য, আমাদের এই সংকেতের পাশাপাশি বিজ্ঞানীদের এমন পূর্বাভাসও রয়েছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারাবিশ্বে একশ' কোটি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়বে। সারা পৃথিবীর হিসেবে এই সংকেতটি খুব বেশি উদ্বেগজনক না হলেও আমাদের পরিণতি নিয়ে আমরা যথেষ্ট ভীত। আর আমাদের এই আতংক শুধু যে আমরাই ডেকে এনেছি তা নয়। উন্নত বিশ্বের উদাসীনতাই এই আতংকের পেছনে দায়ী। এখন বিশ্ব-জলবায়ু তহবিলের ১৫ শতাংশ বাংলাদেশের পক্ষে দাবি শুধু যৌক্তিকই নয়, সময়োপযোগী ও অত্যন্ত কার্যকর প্রস্তাব বলেই আমি মনে করছি। আমি ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষির নানা বিপর্যয় ও সংকট দেখছি। দেশে জলাবদ্ধ এলাকার আয়তন দিনের পর দিন বাড়ছে। বাড়ছে খরাপ্রবণ এলাকাও। প্রতিবছর খরার কবলে খরিপ মৌসুমে ২৩ লক্ষ হেক্টর জমি এবং বোরো মৌসুমে ১২ লাখ হেক্টর জমির ফসলহানি

ঘটছে। দক্ষিণ উপকূলীয় এলাকায় বড় একটি অংশ আজ বিরানভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। এদিকে লবণ-পানির আগ্রাসনের কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের ৩০ ভাগ ফসল কম হচ্ছে। লবণ-পানিতে আক্রান্ত জমির আয়তন ১০ লাখ হেক্টর। দিনের পর দিন সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে আমাদের দেশের ৭১০ কিলোমিটার উপকূলীয় জনপদের আড়াই কোটি মানুষের জীবন অনিশ্চয়তার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তার কেন্দ্রবিন্দু কৃষি। সবদিক থেকেই আক্রান্ত হচ্ছে কৃষি। জলবায়ুর পরিবর্তনের নানাবিধ প্রভাবে বিভিন্নভাবেই আমাদের খাদ্য-উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। দিনের পর দিন একেক এলাকা কৃষিতে পিছিয়ে পড়ছে। যদিও সরকার নানাভাবে কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা এমনকি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় বের করছে কিন্তু প্রকৃতিকে যদি আমাদের অনুকূলে না আনা যায় তাহলে এসব প্রয়াসই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

পানির প্রশ্নে কোথায় আছি আমরা ?

পানি শব্দটিই টলটলে একটি প্রস্রবণের কথা মনে করিয়ে দেয়। যা জীবন বাঁচানোর প্রধানতম নিয়ামক। পৃথিবীর যা কিছু ভোগ্য নিয়ামক তার মধ্যে সুশীতল পানিই অন্যতম। এই পানি সকল জীবপ্রকৃতির প্রাণশক্তির উৎস। পৃথিবীর মোট আয়তনের মধ্যে জলভাগ ৭০.৮০ এবং স্থলভাগ ২৯.২২। এই জলরাশির মধ্যে শতকরা ৯৭.৩ ভাগ হল লবণ-পানি আর ২.৭ ভাগ মিঠাপানি। এই মিঠাপানির মধ্যে হিমবাহ বা পর্বতচূড়ায় আবদ্ধ থাকে শতকরা ৭৭.২ ভাগ, ভূমিতে থাকে ২২.৪ ভাগ, বাতাসে থাকে ০.০৪ ভাগ, হ্রদ ও জলাভূমিতে ০.৩৫ ভাগ এবং নদীতে থাকে মাত্র ০.১ ভাগ। বিশাল জলরাশির সামান্যতম প্রাপ্য এই মিঠাজলের সংস্পর্শেই মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালাসহ প্রকৃতির সব উপাদানেরই চলাফেরা, জন্ম থেকে বেড়ে ওঠা।

শহর-নগরে সুপেয় পানির সরবরাহে সামান্য ছন্দপতন হলেই লঙ্কাকাণ্ড ঘটে যায়। মানুষ হয়ে ওঠে দিশেহারা। আর এসব চিত্রই আমাদেরকে তাগিদ দেয় গোটা পৃথিবীর খাদ্য-উৎপাদন, জীবকুলের বেঁচে থাকা, পরিবর্তিত জলবায়ুর নানামুখী প্রতিক্রিয়ার পানিসম্পদের প্রভাবের দিকে দৃষ্টি দেয়ার। পৃথিবীর দেশে দেশে পানি নিয়ে দিনের পর দিন এক হাহাকার ফুঁসে উঠছে। সেখানে আমরা কোথায় আছি? সুপেয় পানি আমাদের দেশেও এক জিজ্ঞাসাবোধক হয়ে উঠেছে। হাওড়ের কৃষিশ্রমিকরা ক্ষেতের নালার ভেতর প্রবাহিত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মেশানো পানিই অবলীলায় পান করছেন দিনের পর দিন। আবার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক কারণেই বরেন্দ্র অঞ্চলের একাংশের মানুষ শুষ্ক মৌসুমে এক কঠিন সময় অতিবাহিত করে। যখন ক্ষেতের মাটি ফেটে চৌচির, কৃষি আবাদ অসম্ভব, নলকূপগুলোতে পানি ওঠে না, এমনটি গভীর নলকূপের পাইপ মাটির গভীর তলদেশে গিয়েও পানির দেখা পায় না সেখানে মানুষগুলো অসহায় হয়ে পড়ে পানির জন্য।

পানিহীন শুষ্ক ও রুক্ষ প্রকৃতি মানুষ ও প্রকৃতিকে যেভাবে শাসন করে একইভাবে শাসন করে বন্যা-জলোচ্ছ্বাস। প্রতি বছর বন্যা আর নদীভাঙনে নদীর গর্ভে চলে যায় বহু কৃষিজমি। বিপন্ন হয় জানমাল। জলোচ্ছ্বাস আর প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় মানুষকে কতটা বিপন্ন করে তা এ দেশের মানুষ অক্ষরে অক্ষরে জানে। একইভাবে স্থায়ী জলাবদ্ধতাও সীমাহীন দুর্দশায় পতিত করে জনগোষ্ঠিকে। আমাদের সামনে জলন্ত উদাহরণ দক্ষিণাঞ্চলের জলমগ্ন জনপদ ভবদহ। যেখানে জলমগ্ন মানুষ হারিয়ে ফেলে জীবনের স্বাভাবিক সংজ্ঞা। এই ছোট্ট ভূখণ্ডের নদীমাতৃক দেশে পানি নিয়েই এমন কত শত যে দুর্ভোগের চিত্র আছে তা বলে শেষ করা যাবে না।

প্রশ্ন হল পানি নিয়ে এই দুর্দশা, এই দুর্ভোগ এর সবই কি প্রাকৃতিক ? নিশ্চয়ই নয়। এর বড় একটি অংশ মানুষসৃষ্ট। এর মধ্যে আছে দুঃশাসন, আছে বঞ্চিত করার কৌশল, আছে উদাসীনতার ছোটবড় চিত্র। বর্তমান সময়ে এসে আমাদের দেশের অধিকাংশ নদ-নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে পলিতে। পরিবর্তিত হয়ে গেছে অসংখ্য নদীর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ। তৈরি হয়েছে ফরিদপুরের বোয়ালমারি উপজেলার মরা বারাশিয়া পাড়ের ৫০ গ্রামের দুর্দশার মতো বহু আখ্যান।

বিশ্ব প্রেক্ষাপটেও রয়েছে এমন আখ্যান। নানা রকমের সংকেত ও পূর্বাভাস। একটি ভয়াবহ তথ্য না বললেই নয়– ২০২৫ সালের ভেতর অন্তত ১৮০ কোটি মানুষ পাবে না একফোঁটা পানির সুবিধা। তখন মানুষের জীবনধারণ সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। আর কৃষিকাজ? তা পরিণত হবে বহু দূরের এক রূপকথায় । একইসাথে, ২০২৫ সালের ভেতর বিশ্বের দুই-তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠিকে ফেলবে চরম সংকটে। এর পাশাপাশি অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গোপসাগর জনপদের দিকে ধেয়ে আসতে আসতে বাংলাদেশের বড় একটি অংশকে গ্রাস করে ফেলবে– এমন সংকেতও চরম উদ্বিগ্ন করে আমাদের।
আমাদের দেশের নদ-নদীগুলোর পানিশূন্য হয়ে পড়া, নাব্যতা হারানো, বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও সময়মতো সেচের উপযোগী পানি না পাওয়ার পেছনে প্রধান কারণ, ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে ভারতের এক তরফাভাবে পানি প্রত্যাহার।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত বহুবার গঙ্গার পানি বণ্টনের ব্যাপারে ভারতের সঙ্গে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। কিন্তু ভারতের বিরূপ আচরণের কারণে আমাদের দুর্দশার দিন শেষ হয়নি। শুষ্ক মৌসুমে এসে প্রতিবছরই আমাদের পড়তে হয় বিপাকে। এই বোরো মৌসুমের কথাই ধরা যাক না কেন, যখন কৃষকের ধান আবাদের প্রশ্নে ভূগর্ভস্থ পানি তুলে সেচ দেয়া ছাড়া আর উপায় থাকে না। এ ক্ষেত্রে টান পড়ে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দিকে। সব মিলিয়ে যার প্রভাব পড়ে খাদ্য উৎপাদনের ওপর।

গত ৬০ বছরে ৩০০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক পানি-চুক্তি হয়েছে। আর ৩৭টি রাষ্ট্রীয় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে পানি নিয়ে। এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে এই আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলো নিয়ে। বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যে দেশটিতে কৃষিকাজের সাথে সম্পৃক্ত এখানকার ৮০ভাগ মানুষ। অথচ পানি নিয়ে আন্তঃদেশীয় বৈষম্যের গ্যাড়াকলে পড়ে আমরা বঞ্চিত হচ্ছি পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে। সম্প্রতি পানি নিয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হল আন্তর্জাতিক সেমিনার। যেখানে উপস্থিত ছিলেন ১৪টি দেশের পানি বিশেষজ্ঞরা। তারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের বঞ্চনার ইস্যুতে। সেখানে খাদ্য মন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক অবশ্য বলেছেন বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে সরকার। গুরুত্বপূর্ণ এই ইস্যুটির সমাধানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

[লেখক: কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব। অশোকা ফেলো। পরিচালক ও বার্তা প্রধান, চ্যানেল আই।]

মানুষ কাজ হারাচ্ছে, সৃষ্টি হচ্ছে জলবায়ু-উদ্বাস্তু

শা র মি ন্দ নি লো র্মি

জলবায়ু পরিবর্তনে দেশের উপকূলীয় এলাকার ওপর কী প্রভাব পড়ছে?

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব তো আসলে একটি দীর্ঘমেয়াদি ব্যাপার। আমরা বিভিন্ন গবেষণায় মানুষের কাছে গিয়ে পরিবর্তনের বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করেছি। তাদের কাছ থেকে কিছু নির্দেশনা পাওয়া গেছে। আমরা জানতে চেয়েছি তাপমাত্রা বাড়ছে কিনা, গরমের স্থায়িত্ব বাড়ছে কিনা, শীতের স্থায়িত্ব কমছে কিনা, কুয়াশার কী পরিস্থিতি, অথবা বৃষ্টিপাতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ করছেন কিনা। মানুষের এই ধারণার সঙ্গে সব সময় যে মিল পাওয়া যাবে সেরকম নয়, তাদেরটা হচ্ছে জীবন-জীবিকা যেভাবে ব্যাহত হচ্ছে, দীর্ঘকালীন অভ্যাস যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে

তাদের একটা বিশ্লেষণ। এর ভিত্তিতে আমরা বুঝতে পারছি এখন গ্রীষ্মের পরিধি বেড়ে গেছে। তাপমাত্রা বেড়ে গেছে। বর্ষার সময়টা পরিবর্তিত হয়েছে। আগে যেমন আষাঢ়-শ্রাবণ জুড়ে নিবিড় একটা বর্ষাকাল যেত, এখন এই সময়ে বর্ষা কমে গেছে। দেখা যাচ্ছে আশ্বিন-কার্তিকে, বিশেষ করে আশ্বিনের নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে ব্যাপক বৃষ্টি হচ্ছে। আবার শীতকালটা যেমন অতটা বড় নেই। আর বিশেষ করে দুটো মৌসুম শরৎ এবং বসন্ত অনুপস্থিত। এই ধরনের পর্যক্ষেণগুলো আমরা মাঠ পর্যায় থেকে পাচ্ছি। এর ফলে মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে কৃষিকাজ, খাবার পানির প্রাপ্যতা, মাছ ধরা এ ধরনের জীবিকার প্রক্রিয়া হঠাৎ করে ব্যাহত হওয়ার প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। সাধারণ মানুষ এসবকে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে একদম যুক্ত করে বলতে পারছেন তা নয়। কিন্তু বাস্তবতার সঙ্গে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছেন।

উপকূলের কোন কোন সেক্টর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় আমাদের উপকূল এলাকা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাপমাত্রা যদি বৃদ্ধি পায় বা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা যদি বাড়ে, তাহলে আমাদের দেশের জনগণের ওপর ব্যাপক মাত্রায় প্রভাব পড়বে। আমাদের এত বেশি জমি নেই যে, ওই মানুষগুলোকে আমরা অন্য জায়গায় পুনর্বাসন করতে পারব। অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা– ফলে উপকূলের মানুষদের মূল জীবিকা হচ্ছে কৃষিকাজ এবং মাছ ধরা। কৃষিকাজের মধ্যে কিছু কিছু এলাকায় আছে লবণ চাষ। কক্সবাজারের মহেশখালীর দ্বীপগুলোতে ব্যাপক এলাকায় লবণ চাষ হয়। উপকূলীয় এলাকার জেলে সম্প্রদায়ের বারবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাঝ ধরা ব্যাহত হচ্ছে। আবার কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের চিরায়ত কৃষির অভ্যাসগুলোতে ব্যাপকভাবে পরিবর্তন এসেছে। নোয়াখালীর কৃষকরা আমাদের জানিয়েছেন, আমন শুরু হয় শ্রাবণ থেকে। ধানগুলো কিন্তু প্রাকৃতিক বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। আগ্রহায়ণে এসে আমনটা কেটে ফেলা হয়। কৃষকরা বলছেন আষাঢ়-শ্রাবণে আর বৃষ্টিটা হচ্ছে না। আশ্বিনে এসে ৪/৫ দিন এমন পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, পানিগুলো সরতে পারে না। তখন আমনগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আমন যখন নষ্ট হয়, উপকূলীয় অঞ্চলের একজন কৃষক কিন্তু লবণাক্ততার কারণে সেচ ব্যবহার করতে পারছে না। ফলে একমাত্র ভরসার জায়গা বৃষ্টির পানি। আমনটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার জীবিকা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে ব্যাহত হয়। তখন তাকে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে চলে যেতে হয়। রিকশা চালাচ্ছে, ভ্যান চালাচ্ছে। অধিকাংশ কৃষিজীবী পরিবারের মানুষ কিন্তু আগে এসব কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল না। এখন তাদের এগুলো করতে হচ্ছে। এসবের কারণে স্থানীয় পর্যায়ে বিরাট রকমের সমস্যা তৈরি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত আমরা এ ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন নই। এটা যে শুধু উপকূলীয় এলাকায় ঘটছে তা নয়, এটা দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘটছে। উপকূলীয় এলাকা বাদে অন্যান্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে

বন্যার কথাই যেমন ধরুন, বন্যায় কিন্তু আমাদের পুরো আমন শেষ হয়ে যায়। আমনের মৌসুমটাকে কোনো কোনো বছর আর উদ্ধার করা যায় না। এ ধরনের নানা সমস্যা আমাদের সামনে আসছে।

পানি যখন সরতে পারছে না, তখন মৎস্য সেক্টরের অনেক ক্ষতি হচ্ছে। মৎস্যজীবী তো দু'ধরনের। উপকূলীয় অঞ্চলের অনেকে আছেন যারা নিজেরা সাগরে যান। অনেকে আছেন যারা সাগরে যান না, কিন্তু মাছের ব্যবসা করেন। আবার অনেক উপকূলের জেলে সম্প্রদায় রয়েছেন যারা কালচার ফিশারিজে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সাগরে না গিয়ে তারা কালচার ফিশারিজে চলে যাচ্ছেন। তারা জানছেন এই মৌসুমে অতিরিক্ত বর্ষা হলে মাছ ভেসে যাবে। তাতে করে মাছ কিন্তু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। মাছ কোথাও না কোথাও থাকছে। কিন্তু যে ব্যক্তি বিনিয়োগ করেছেন, তিনি পাচ্ছেন না। তখন তিনি একটা ব্যবসায়িক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছেন। টাকার অভাবে বিনিয়োগকারী তার জলাশয়ের দু'পাশ উঁচু করতে পারেননি। দুর্যোগের খবর জেনেও তিনি এ খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে পারছেন না। ফলে এই পুরো বিনিয়োগটাই তার ভেসে যাচ্ছে। এ ধরনের সমস্যাগুলো কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছে।

আবার ধরুন উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে কৃষি সাংঘাতিকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। অভাব দেখা দিয়েছে খাবার পানির। আমাদের কৃষিতে বার্কের সাংঘাতিক রকমের ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। এখন পর্যন্ত যে ২/৩টি লবণ-সহিষ্ণু ধান উৎপাদন হয়েছে, সেগুলো কিন্তু বর্তমানের লবণের মাত্রার সঙ্গে মিলছে না। এ জাতগুলো এখন কার্যকর থাকছে না। ফলে এ গবেষণার জায়গাটা আরো শক্তিশালী না হলে ভবিষ্যতে এ উপকূলে জলবায়ু পরিবর্তন খাদ্য-নিরাপত্তার হুমকি হিসেবে কাজ করবে। খাদ্য-নিরাপত্তার হুমকি শুধু নয়, আমাদের অধিকাংশ মানুষ যেহেতু কৃষিজীবী, সে কারণে তাদের জীবনের নিরাপত্তার কথা বলি, তাহলে কোন মৌসুমে মানুষগুলোর হাতে কাজ থাকে, কোন মৌসুমে তার ঘরে ফসলটা ওঠে, তার সঙ্গে কিন্তু নির্ভরশীল আমাদের খাদ্য-নিরাপত্তা। সুতরাং জীবিকার নিরাপত্তা ও খাদ্য-নিরাপত্তা কিন্তু একই সঙ্গে একই ম্যাপিংয়ে করতে হবে। বিশেষ করে এবার যাদের আমন মার খেয়েছে, বোরো যারা করতে পারবেন না, সামনের আমন পর্যন্ত তাদের সাংঘাতিক রকম একটা খাদ্যঝুঁকির মধ্যে থাকতে হবে। যেহেতু বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা ততটা ব্যাপকভাবে নেই, বাজারে দ্রব্যমূল্যেও যে পরিস্থিতি তাতে করে মানুষের ভালো মাকার তেমন কোনো রাস্তা নেই।

উপকূলের নারীদের ওপর কী ধরনের প্রভাব পড়ছে?

একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে, খাদ্য-নিরাপত্তা নির্ভর করে জীবিকার ওপর। পুরুষ আয় করছে, নারী কিন্তু ম্যানেজ করছে। এখন খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতা কিন্তু সবাইকেই কম বেশি আঘাত করে। কিন্তু একজন নারী যখন ম্যানেজ করেন সংসারটা, তিনজনের জায়গায় যদি দু'জনের রান্না হয়, তাহলে আগে বাচ্চাকে

খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। তারপরে তিনি খাওয়ানোর চেষ্টা করেন সংসারের উপার্জনশীল ব্যক্তিকে। ফলে খাদ্যের ঝুঁকিটা নারীদের ওপর ব্যাপক মাত্রায় পড়ছে। আমি কখনোই বলছি না একজন পুরুষ খুব ভালো থাকেন বা শিশুটা অনেক পুষ্টি নিয়ে চলে। তারপরও একজন শিশু বা পুরুষ যতটুকু পাচ্ছেন সেটা নারী পাচ্ছেন না।

যেহেতু কর্মসংস্থানহীনতা ঘটছে, যেমন ধরুন যশোরের জলাবদ্ধ এলাকা। সাধারণত যেখানে পানির নিচে একটা এলাকা থাকে, সেখানে তেমন কোনো কিছু ঘটে না। কোনো ফসল হয় না। বিলের পরিস্থিতি এমন যে, আগে সেখানে যে মাছগুলো পাওয়া যেত, এখন তা পাওয়া যায় না। ফলে পুরুষ মানুষকে বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য স্থানান্তর করতেই হচ্ছে। বড় শহরে চলে আসতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নারীরা খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে যেমন থাকেন, তেমনি সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে থাকেন। একই সঙ্গে তাদের শারীরিক ঝুঁকি, মানসিক ঝুঁকি এবং খাদ্যের ঝুঁকি– সবগুলো ঝুঁকি কিন্তু একসঙ্গে বহন করতে হয়। এটা কিন্তু দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠছে। বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকায় কিছু বনায়ন কর্মসূচি আছে। সেখানে বেড়িবাঁধের ভেতরে বসবাসকারীরা যেভাবে প্রটেকশনের মধ্যে থাকেন, বাঁধের বাইরের নারীরা কিংবা চরাঞ্চলের নারীদের ওপর সাংঘাতিকভাবে নির্যাতন হয়। সেখানে ডাকাতি, জলদস্যুতা প্রকট। এসব এলাকার নারীরা কিন্তু সাংঘাতিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় থাকেন। তারা এমনকি স্থানীয় পুলিশকেও অবহিত করেন না। এলাকার মানুষ বিষয়গুলো জানেন। উপকূলের নারীদের যে অনেক বেশি কর্মসংস্থান রয়েছে এমন কিন্তু নয়। অন্যান্য এলাকার নারীদের চেয়ে এ এলাকার নারীরা পিছিয়ে আছেন। মূলত তারা ঘরের কাজ করেন এবং কিছু জ্বালানি সংগ্রহে জড়িত। খুলনা-সাতক্ষীরা অঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এমন খাবার পানির সংকট রয়েছে, এমনও নারী আমরা পেয়েছি, যারা প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার পথ হেঁটে এক কলস খাবার পানি সংগ্রহ করে আনেন। এটা পুরোপুরি নারীর কাজ। এখানে পুরুষরা অংশ নেন না। যখনই লবণের পরিমাণ বড়ে যাচ্ছে, তখনই খাবার পানির দুষ্প্রাপ্যতা বেড়ে যাচ্ছে। বাধ্য হয়ে লবণ-পানি খাওয়ায় অনেক সময় গর্ভপাতের মতো ঘটনাও ঘটে। নারীর বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যায়। শরীর কালো হয়ে যায়। মেয়েদের বিয়ের সমস্যা দেখা দেয়। যশোরে আমরা দেখেছি গলা পর্যন্ত পানির নিচে দাঁড়িয়ে মেয়েরা মাছ চাষ করছে। বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে তাদের। এইসব প্রবণতা আরো বেড়েছে।

উপকূলীয় এলাকার জলবায়ু-উদ্বাস্তুদের অবস্থা কী?

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জীবিকা যখন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে পড়ে তখন পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তিরা চলে আসেন শহরে। নদীভাঙন ছাড়া অন্যান্য সমস্যায় কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে নিজ এলাকায় থাকার জন্য। পুরো পরিবার নিয়ে স্থানান্তর খুব কম করে। একমাত্র নদীভাঙনে যখন সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তখনই পুরো

পরিবার স্থানান্তরিত হয়। বন্যা, লবণাক্ততা, সাইক্লোনের কারণে অস্থায়ী মাইগ্রেশন হয়।

জলবায়ু-উদ্বাস্তু মূলত আমি যদি পুরুষ সদস্যদের ধরে থাকি, এরা শহরে এসে শহরের ভিড় বাড়ান এবং অস্থায়ী দিনমজুর হিসেবে কাজ করেন। রিকশার কাজ করেন, রাস্তার শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন। আবার সব ধরনের শহরে যে একই মাত্রায় কাজ থাকে এমন নয়। অনেকে বিশেষ করে কোনো কাজ পাচ্ছে না। ফরমাল সেক্টরে এদের কাজের কোনো সুযোগ তৈরি হয়নি। আমাদের সেফটি নেট কর্মসূচিগুলো এমনভাবে তৈরি হয়নি যে, আমার এ সময়টাতে আমন ধান নষ্ট হতে পারে, তাহলে এই সময়টাতে খাদ্য-নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেবে। তাহলে আমি এই সময়টার জন্য সেফটি নেট প্রোগ্রাম চালু রাখব। উপকূলের সাইক্লোনে গাছপালা ধ্বংস হয়ে যায়। এখন ঘরবাড়ি নির্মাণ করার প্রয়োজন হবে। আমাদের কোনো উদ্যোগ নেই। আমরা নতুন ডিজাইনে কম খরচে স্থানীয় দক্ষ নির্মাণশিল্পী তৈরি করে তাদের কাজে লাগাতে পারছি না। এরকম কোনো কর্মসূচি তৈরি করছি না। বহু মানুষ কাজ না পেয়ে বাইরে চলে আসছে। আবার বাইরেও যে তাদের জন্য আমরা কোনো কাজ তৈরি করব, তা পারছি না।

আমরা যদি স্থানীয় পর্যায়ের মানুষদের জন্য সেফটি নেট কর্মসূচি তৈরি করতে পারতাম বা স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের দুঃসময়ে যদি কাজ তৈরি করতে পারতাম, বিশেষ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু তারা পরিবেশ-উদ্বাস্তু হতে পারত না। অথবা তারা যখন চলেই আসছে, তখন শহরে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছি না। ফলে অপরাধ বাড়ছে, বস্তির সংখ্যা বাড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূলে স্থানীয় মানুষের কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে কিনা?

ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূলের মানুষের নিজেদের অনেক উদ্যোগ রয়েছে। যেগুলো তারা প্রকৃতির কাছ থেকে শিখেছে। আমরা যখন মানুষের কাছে যাই, তখন তারা নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। এক্ষেত্রে আমরা দুটো কথা বলি। একটা হচ্ছে কোপিং, আরেকটি এডাপটেশন। কোপিং হচ্ছে মানিয়ে নেওয়া আর এডাপটেশন হচ্ছে অভিযোজন। আমরা বিভিন্ন এলাকায় দেখেছি বাড়ি তৈরি হয়েছে মাচার ওপর। একটা নির্দিষ্ট উঁচুতে মাচা তৈরি করে তার ওপর বাড়িটি তৈরি করছে। কারণ হচ্ছে ওই এলাকার মানুষ জানে, প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় বন্যার পানি আসবে। ফলে ওই পানি যাতে বাড়ির নিচ দিয়ে চলে যায় সেজন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বন্যা কিন্তু আমাদের সমস্যা ছিল না কোনো সময়ে। আমরা এর মধ্যেই বসবাস করছি। এখন কেন এমন হচ্ছে, কারণ এর তীব্রতা বেড়েছে। আমাদের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা কমেছে। নিয়মিত উচ্চতার চেয়ে যখন আরো ওপরে পানি ওঠে তখন আমাদের ঘরের মধ্যে চলে আসছে। তখনই আবার সমস্যা শুরু হচ্ছে। তারপরও মানুষ কীভাবে

মানাচ্ছে, ঘরের মধ্যেও কিন্তু তিনি একটা মাচা তৈরি করেছেন। যেখানে মূল্যবান কাগজপত্র, খাবার ইত্যাদি রাখা হয়। এগুলো কিন্তু তাদের কেউ শিখিয়ে দিয়ে আসেনি। উপকূলীয় এলাকায় দেখা যায় প্রচুর নতুন ধরনের সবজি, বিভিন্ন ধরনের ডাল ও তেলের চাষ তারা করার চেষ্টা করছেন। এগুলো কৃষি বিভাগের লোকজন করে দিয়েছেন তা নয়। আরো দেখেছি উপকূলের মানুষ একটা স্থানে উঁচু জমি একটু নিচু করে কেটে দেন। যখন পানিটা আসে তখন পানিটা ফসলের ওখানে না দাঁড়িয়ে যেন নিচের দিকে জমা হতে পারে, সে জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্যোগকালীন আলাদা চুলা বানিয়ে রাখে। তারাই চেষ্টা করছেন কারো আশায় বসে না থেকে কীভাবে নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধ-পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করতে পারেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকারি-বেসরকারি কী কর্মসূচি রয়েছে?

সরকারি পর্যায় থেকে তো এখন বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিডি এমপি রয়েছে। আমাদের নাপা ডকুমেন্ট রয়েছে। আমাদের এখানে পরিবেশ অধিদফতরের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কাজ করছে। বিভিন্ন ডোনাররা কাজ করছে। আগের চেয়ে সরকারি মহলেও কিন্তু সচেতনতা অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে আমরা যখন মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্কশপ করি, জেলা প্রশাসকসহ সরকারি পর্যায়ের লোকজনকে যখন দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসি, তখন বুঝতে পারি। ৪/৫ বছর আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি, আগে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি ফোকাসে ছিল না। দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের ফোকাস ছিল। কিন্তু এখন আমরা বুঝি সরকারি লোকজনও কিন্তু এখন অনেক সচেতন। নিজেরাই বলছেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জীবন-জীবিকার সংকট দেখা দিচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য দূর করাটা সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে বিষয় দুটোকে আলাদা বিষয় হিসেবে দেখার কোনো কারণ নেই। দুটোকে যদি আমি একভাবে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমাকে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা বাড়াতে হবে। আমার অভিযোজন ক্ষমতা বাড়াতে হবে। আমাকে বিরুদ্ধ-পরিস্থিতিকেই পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। সরকারি পর্যায় থেকেই এখন এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবা হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন আগের চেয়ে অনেক বেশি সংবেদনশীল ও সচেতন হয়ে উঠেছে।

আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে প্ল্যানিংয়ের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারপরেও আস্তে আস্তে কিন্তু সচেতনতার মাত্রা অনেক বেড়েছে। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এখন ডিজাস্টার কম্পোনেন্ট রয়েছে। যারা ঝুঁকি প্রশমনে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে কী করা যেতে পারে?

মানুষের মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতাটা বাড়াতে হলে তাকে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়ন করতে হবে। বন্যার মধ্যে যদি কৃষকের আমনটা নষ্ট হয়, তাহলে বিকল্প হিসেবে অন্য একটা

কিছু যেন সে করতে পারে, সে ব্যবস্থা নিতে হবে বা সাইক্লোনে তার ঘরটা নষ্ট হয়েছে, গরুটা চলে গেছে, ঘরটা যেন সে করতে পারে, জীবিকার পথ যেন সে করে নিতে পারে। তাহলে সহজ শর্তে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি ব্যাংকসহ সরকারি অনেক ব্যাংকে মানুষ যেতে ভয় পায়। ১০০ শতাংশের ওপরে সুদ দিয়েও জেলেরা বহদ্দারের কাছ থেকে লোন নিতে যেভাবে স্বচ্ছন্দবোধ করেন কিন্তু সুদের হার ৩০ শতাংশের মতো হওয়া সত্ত্বেও এনজিওদের কাছে তারা যেতে চায় না। কারণ এনজিওদের কাছ থেকে নেওয়া লোন পরিশোধ করতে হয় পরের সপ্তাহ থেকে। কিন্তু বহদ্দারের লোন পরিশোধ করা যাবে ভাদ্র মাসে, যখন নদীতে নামতে পারব। আমরা কেন তাদের আস্থাভাজন হতে পারছি না, এটা দেখার বিষয় রয়েছে। সরকার, স্থানীয় প্রশাসন, এনজিও এবং কমিউনিটি বেজড অর্গানাইজেশনগুলোর সমন্বয়ে জনগণের আস্থাটা অর্জন করতে হবে। আমাদের স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে, স্থানীয় পরিকল্পনার ভিত্তি বিবেচনায় পরিকল্পনা করতে হবে কারণ একই বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে। সুতরাং একটি কৌশল দিয়ে সব সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

[লেখক: গবেষক। শিক্ষক, অর্থনীতি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।]

জলবায়ু-ঝুঁকি: মোকাবিলায় আমাদের প্রস্তুতি

ধরিত্রী সরকার সবুজ

মানবজাতির জন্য যে বড় দুর্যোগটি এখন সামনে চলে এসেছে, তা হল জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। আইপিসিসি'র ধারণা অনুযায়ী, জলবায়ু-ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে একেবারেই সামনে। আগামী ৫০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ এলাকা পানির নিচে চলে যাবে। তখন অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়বে

লবণাক্ততা। একদিকে এক-তৃতীয়াংশ জায়গা কমে যাবে, অন্যদিকে বাকি অংশ কৃষির জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। বন্যা, জলোচ্ছাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে। এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও মানবজাতির জানা। শুধু প্রয়োজন বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সঠিক উপলব্ধি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

জলবায়ু ঝুঁকির কুফল আমরা ইতোমধ্যেই ভোগ করতে শুরু করেছি। অল্প সময়ের ব্যবধানে সিডর, আইলা বা নার্গিসের মতো দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার বিষয়টিকে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণ বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। ভবিষ্যতে এগুলোর পরিমাণ আরো বাড়বে বলেই ধারণা। আইপিসিসি'র মতে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, চীন, জার্মানির মতো অতিমাত্রায় জ্বালানিনির্ভর শিল্পোন্নত দেশগুলোই এর জন্যে দায়ী। ধনীদেশগুলোর বিলাসী জীবনযাপন এবং পরিবেশ ধ্বংশকারী কার্যক্রমের খেসারত দিতে হচ্ছে মালদ্বীপ, বাংলাদেশ-এর মতো দরিদ্র দেশগুলোকে। চীন, ভারত-এর মতো দেশগুলোও শিল্পের প্রসার ঘটাতে গিয়ে আজ কার্বন নিঃসরণ করছে অনেক বেশি। অর্থাৎ কার্বন নিঃসরণের তালিকায় আমরা যেসব দেশের নাম দেখি, তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে, এসব দেশের সদিচ্ছার উদয় হওয়া ছাড়া এ গভীর সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব নয়।

তবে, একথা আজ স্পষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তনের যে বিপদাশংকা, বাংলাদেশকে তার মধ্যেই বসবাস করতে হবে। সেজন্য আমাদের হাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে টিকে থাকার কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে, তা মোকাবিলায় কার্যকর কৌশল গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আমাদের প্রধান সমস্যা হবে, উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবেশ করা। বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যেই জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় বেশকিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে উপকূলীয় বাঁধ মেরামতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে। দেশের এগার হাজার কিলোমিটার ক্ষতিগ্রস্ত উপকূলীয় বাধ পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ বাঁধের দু'ধারে বনায়নের পরিকল্পনাও নেয়া হয়েছে। এ কাজের জন্য অর্থ এবং শ্রম উভয়েরই প্রয়োজন হবে অনেক বেশি।

জলবায়ু বিপর্যয়ের ফলে সবচেয়ে বেশি হুমকির মুখে আছে আমাদের উপকূলীয় অঞ্চল। এসব এলাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ এবং তীব্রতাও বাড়বে। সেটি মোকাবিলায় ঘূর্ণিঝড়ের সময় উপকূলীয় জনগণের আশ্রয়স্থলের সংস্থান করতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মানুষকে উঁচু এবং শক্ত করে বাড়ি নির্মাণে উৎসাহিত করতে পারলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় প্রতিবেশীরা সেখানে আশ্রয় পেতে পারেন। উপকূলীয় এলাকার অবস্থাপন্ন মানুষকে এখন থেকেই এ বিষয়ে উৎসাহিত করা দরকার। প্রয়োজনবোধে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য বা নিম্নসুদে ঋণ দিয়ে উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে। দেশে গৃহনির্মাণ ঋণ দেয়ার কাজ করছে যেসব এনজিও, তারা এ বিষয়ে

কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে সেখানকার কৃষিতে ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে। লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন জাতের ধান উপকূলীয় জলাকায় জনপ্রিয় করতে হবে এবং স্বল্প সময়ে উৎপাদনক্ষম জাতের ধান উদ্ভাবন করতে হবে। যেসব ফল ও কাঠের গাছ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে সেগুলো এখন থেকেই উপকূলীয় এলাকায় রোপণ করা উচিত হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বন্যার প্রকোপ বাড়বে। আবার শীতকালে খরার প্রকোপও বাড়বে। সময়মতো বৃষ্টি না হওয়ার কারণে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হবে। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন্যা ও খরা দুটোই বেড়ে যাবে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের কৃষিকে বাঁচাতে ফসল বোনার দিনপঞ্জিতে পরিবর্তন আনতে হবে। একই জমিতে বিভিন্ন ফসল চাষের পরিক্রমণও পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে পরিবর্তন করতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ যে বাড়ছে, এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখন মোটামুটি নিশ্চিত। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আমরা দেখেছি সিডর, নার্গিস ও আইলা। সারাদেশ ঘূণিঝড়ের হুমকির মুখে থাকলেও উপকূলীয় অঞ্চলের ঝুঁকি অনেক বেশি। সেজন্য উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতির মাত্রা যাতে কম হয়, সেভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। উপকূলীয় এলাকায় কৃত্রিম বন বা প্রাকৃতিক দেয়াল সৃষ্টি করে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের ব্যাপকতা হ্রাস করা যায়। কক্সবাজার থেকে সাতক্ষীরা পর্যন্ত উপকূল জুড়ে সুপারি ও নারিকেল বাগান তৈরি করে প্রাকৃতিক দেয়াল সৃষ্টি করতে হবে। দেশের বন বিভাগ এবং উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের উদ্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃত্রিম বন সৃজনের মাধ্যমে ঝড়ের তীব্রতা কমিয়ে লোকালয়ের ক্ষতির পরিমাণ কমানো যেতে পারে।

আরো আশংকার বিষয়, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের ধারণা, তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ডায়রিয়া রোগের মাত্রা ২.৪ ও ম্যালেরিয়া ৬.৪ শতাংশ বেড়েছে। ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ডেঙ্গু রোগের বিস্তার আগামীতে আরো বাড়বে। ফলে পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্যোগ নিতে হবে এখন থেকেই। উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে কৃষিজমির পরিমাণ কমবে, মাটির উর্বরতা কমবে এবং কৃষি-উৎপাদন কম হবে। উৎপাদিত খাদ্যের গুণগতমানও খারাপ হওয়ার আশংকা। ফলে উক্ত এলাকার মানুষ পুষ্টিহীনতায় ভুগবে। পুষ্টি সংকটের পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানিরও সংকট দেখা দেবে। জনজীবনের পুষ্টির অভাব পূরণ এবং অল্পখরচে লবণাক্ত পানিকে বিশুদ্ধ করার উপায় বের করতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মানুষ ত্বকের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হবে। ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার প্রকোপ বেড়ে যাওয়ায় পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটবে। এসব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য আমাদের এখনই প্রস্তুত হতে হবে। দেশের ঔষধশিল্পকে প্রয়োজন উপযোগী করে

গড়ে তুলতে হবে। সরকারি-বেসরকারি যেসব স্বাস্থ্যকর্মী সচেতনতা ও রোগ নিরাময়ে কাজ করেন, তাদেরকে জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য-ঝুঁকি ও তার প্রতিকারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বিষয়ে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কৃষি বাধাগ্রস্ত হবে, মানুষের অপুষ্টি বাড়বে এবং স্বাস্থ্যের অবনতি হবে। দারিদ্র্য বাড়বে, ঘনঘন ও বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সে দারিদ্র্যকে আরো বাড়িয়ে দিবে। তাই আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমরা এখন যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করছি, সেগুলোও তৈরি করতে হবে আগামী দিনের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই। জলবায়ু-ঝুঁকি মোকাবিলায় পূর্ব প্রস্তুতির কোনো বিকল্প নেই।

[লেখক : প্রকৌশলী। বিজ্ঞান ও পরিবেশ বিষয়ক লেখক।]

জলবায়ু পরিবর্তন: বিপর্যয়ের সরল পাঠ

আশরাফ সিকান্দার মোহ

পৃথিবীনামক গ্রহটির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কাহত মানুষ আর তাদের সমোচ্চারিত কণ্ঠস্বর এই গ্রহেই বসবাসরত স্বার্থান্বেষী মহলের চেতনায় কম্পন সৃষ্টি করে দিতে পেরেছে– পরিবেশবাদী আন্দোলনের এই ফললাভ নিঃসন্দেহে একটি বড় বিজয় হিসেবে পরিগণিত। এই গ্রহটি কোনো কারণে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হোক কিংবা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হোক এটা কারো কাম্য হতে পারে না। পৃথিবী ও তার পরিবেশ মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ও সম্পর্কিত, ফলত এই বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করার দায় মানুষের ওপরই বর্তায়। প্রশ্ন সৃষ্টি হতে পারে, এই বিশ্ব-পরিবেশ বিনষ্ট হওয়ায় একমাত্র মানুষের কার্যাবলি দায়ী নয়, প্রকৃতিগতভাবে প্রাকৃতিক কারণাদি কি দায়ী নয়?

প্রাকৃতিক কারণ আছে কিন্তু এর ওপর তো মানুষের হাত নেই; পক্ষান্তরে মানুষ-সৃষ্ট কারণের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব।

জলবায়ু শব্দটি একটি যৌগিক শব্দ, যা জল ও বায়ু নামক শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে কাঠামোপ্রাপ্ত হয়েছে। জল ও বায়ু= জলবায়ু ব্যাকরণিক ভাষায় সমাসবদ্ধ পদ। জল বলতে জীবনকেই বোঝায়, বায়ু অর্থ প্রাণ বা জীবন। জলও হচ্ছে জীবনের উৎস ও প্রবাহক; আর বায়ু হচ্ছে জীবনের প্রভাবক ও প্রবাহক। দুটি শব্দে সৃষ্ট শব্দ জলবায়ু, জলবায়ুই হচ্ছে জীবন, সকল জীবনের উৎস ও প্রভাবক, প্রবাহক জলবায়ুকে ঘিরে বিশ্বের সকল জীবন ও সত্তার আবর্তন চলছে। জলহীন, বায়ুহীন জীবন ও সত্তা একমাত্র ভাববাদীদের বিশ্বাস। ভাববাদে একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া গণ-অস্তিত্ব কল্পনাতীত। জলবায়ুকে জীবনের উৎস ও প্রবাহক নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিলেও বলতে হয় জড় বস্তুসকলও এর আওতাভুক্ত। ধাতব পদার্থ ও শক্ত পাথরের ওপর জলবায়ুর প্রভাব কি কম, জলজভাব ছাড়া পদার্থের জমাটবাঁধা সম্ভব কি? জলবায়ুর প্রভাবে ধাতব পদার্থের রূপান্তর হয় শুষ্কতার ফলে, মৃত্তিকার ভঙ্গুরতাও লক্ষণীয়।

বিশ্ব পরিবেশ উষ্ণায়ন, কল-কারখানার কার্বন নির্গমন, ওজোন স্তরের ফাটল, গ্রিন-হাউস গ্যাস নির্গমন, অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব, সমুদ্রবক্ষের উচ্চতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তন– পরস্পর সম্পর্কিত এই বিষয়গুলো বিশ্ব-পরিবেশ বিপন্ন হওয়াকে শিরোনামযুক্ত করে মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে যে শঙ্কা তৈরি করে দিয়েছে তাতে মানুষ উদ্বিগ্ন। ফলস্বরূপ দেশে দেশে পরিবেশবাদী সংগঠন সৃষ্টি হয়ে আন্দোলন সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্দোলন-সংগ্রাম আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করার ফলশ্রুতিতে শিল্পোন্নত দেশগুলো কল-কারখানার কার্বন-নির্গমনের মাত্রা কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কিছু কিছু দেশ ইতোমধ্যে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তা শামুকশ্লথ গতিপ্রাপ্ত যা পরিবেশ বিপন্নতার প্রতিকারের যে পরিমাণ মানুষের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ছিল তা ন্যূনতম প্রাপ্তির সম্ভাবনার কাছাকাছিও হতে অপারগতা প্রকাশ করে চলছে। আর এক্ষেত্রে ধনীদেশগুলোর রামায়ণের কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় সংকট ও তার সামাধানকে ভ্রুকুটি প্রদর্শন করে চলছে যা ছোট ও মাঝারী উন্নতির দেশগুলোর শঙ্কা বৃদ্ধি করে চলছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে জলবায়ু নামক প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ডটি খেয়ালিখেলায় মত্ত হয়ে চিরাচরিত জলবায়ুগত প্রাকৃতিক ও মানব-জীবজগতের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করে দুর্দশা সৃষ্টি করছে। সে দুর্দশা দারিদ্র্যপীড়িত দেশগুলোকে আরো দারিদ্র্যতার কবলে নিপতিত করছে, দরিদ্র দেশগুলোর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার অবস্থানকে শিল্পোন্নত দেশগুলো বিবেচনায় না নিয়ে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনে তাদের যথেচ্ছ বৈজ্ঞানিকে অগ্রগতির কারণগুলো দূরীকরণ ও নিরাময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার উদ্যোগকে শামুকশ্লথ গতি থেকে অশ্বগতিপ্রাপ্তিতে উন্নীত করার দিকটিকে মোটেও বিবেচনায় আনছে না। দরিদ্র দেশের জনগণের দুর্ভোগ দুর্দশাতে তাদের মাথা-ব্যথার কারণ না থাকতে পারে কিন্তু পরিবেশ বিপন্নতার ক্ষেত্র থেকে কি তারা আলাদা ভৌগোলিক অবস্থানে অবস্থান করছে? নিশ্চয়ই তা নয়।

বিশ্ব-উষ্ণায়নের ফলে সংঘটিত ক্ষতি থেকে তারা কখনো মুক্ত নয়, ক্ষতিকর ফলগুলো সমগ্র বিশ্বে একইসাথে সমানভাবেই কার্যকর। সমগ্র বিশ্বই বিশ্ব-উষ্ণায়নের শিকার। জলবায়ুর পরিবর্তনসহ প্রাকৃতিক অঘটনগুলোর শিকার এই বিষয়গুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে এনে সমগ্র মানবজাতির স্বার্থেই– শামুকগতিকে অশ্বগতিতে রূপান্তরিত করা আবশ্যক। কেননা প্রকৃতিতে বড় ধরনের অঘটন ঘটলে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বেরই ক্ষতিসাধন ঘটবে।

জলবায়ুর ওপর পৃথিবীর নির্ভরতা, জলবায়ুর যে কোনো বড় ধরনের পরিবর্তনে মহাবন্যা বা মহাপ্লাবন যেমন সৃষ্টি হতে পারে তেমনি সাহারা মরুভূমির মতো মরুময় অবস্থাপ্রাপ্ত হতে পারে। এ সকল প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করার মতো বৈজ্ঞানিক অর্জন সাধিত হয়েছে কি না সেটিও প্রধান বিবেচ্য। পৌরাণিক মিথানুযায়ী নুহ কিংবা দ্রাবিড়রাজকে ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদপ্রাপ্ত ঘটনাকে যদি বিজ্ঞানের ধারণা দিয়ে বিবেচনা করি, তাহলে উক্ত ব্যক্তি একজন পরিবেশবিদ ছিলেন, যারা প্রকৃতির কার্যকলাপাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখতেন, যার সাহায্যে বিপর্যয়কর মহাপ্লাবন থেকে নিজ গোষ্ঠী বা গণের লোকজনকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। তাদের সময়কার বিজ্ঞানের বিকশিত অধ্যায় যতখানি ছিল ততখানি সুবিধাপ্রাপ্ত তারা হয়েছেন, তাদের সুবিধাটুকুর তুলনায় ধ্বংসলীলা সহস্রগুণ বেশি এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। মহাপ্লাবনের মতো মিথ যদি মহামরুকরণে পরিণত হয় তাহলে ব্যবস্থা কী হবে? হয়তো এরকম কাহিনী প্রচলিত ছিল যা অযত্নে মিথে পরিণত হয়নি, সাহারা, গোবি কি উদাহরণ হিসেবে ছিল না? যা হোক এই মহামরুকরণের দিকটি অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত যদি হয়, অধুনা যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে যা আবার ধনী দেশগুলোর মুঠোর মধ্যে তা দিয়েই কি আমরা মহাপ্লাবন, মহামরুকরণ-এর মতো অবস্থা সামাল দিতে সক্ষম হব? এরকম বৈজ্ঞানিক অর্জন আমরা নিজেরা কতটুকু অর্জন করেছি? আমাদের বিজ্ঞানযুগে জনসংখ্যার বিস্ফোরণে যে সংখ্যাধিক্য কত সময়ের মধ্যে দ্রাবিড়রাজের মৎস্যরূপী জাহাজ নির্মাণে সক্ষম হতে পারব সেটা এক বিরাট চিন্তার বিষয়। আর এ দুইয়ের অন্যরূপ প্রাকৃতিক আকস্মিক কোনো অঘটনের কাছে আমরা আদিকালের মতোই অসহায়। এক্ষেত্রে আমাদের যত বড় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি অর্জিত হোক না কেন, সুবিধা পাওয়ার ব্যাপার নয়, আর এসব ঘটনার ব্যবস্থাগ্রহণ কষ্টকল্পনার সমতুল্য।

খেসারত শুধু বাংলাদেশকেই দিতে হবে না, ভারতের সমগ্র জনগোষ্ঠীকেও বহন করতে হবে এর দায়। বিশ্ব-উষ্ণায়নের মতো, ভূ-ত্বকের শুষ্কতাবৃদ্ধি নদীপথের স্বাভাবিক প্রবাহ বিনষ্ট হলেই দেখা দেবে এটা প্রকৃতিগত সত্য। ফারাক্কা বাঁধের ও অন্যান্য নদীশাসনের প্রভাব ভারত-বাংলাদেশের জলবায়ুতে ক্রিয়াশীল এ তথ্য আজ সর্বজনবিদিত। বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব অনেক দেশের জলবায়ুতে মারাত্মক প্রভাব ফেলেছে। যার খেসারত দিতে হচ্ছে পৃথিবীর সমগ্র জনগোষ্ঠীকে।

খরার প্রভাব ইথিওপিয়া-সুদান-সোমালিয়ার বিগত চিত্র থেকে মানুষ ওয়াকিবহাল, অস্থিচর্মসার শুটকি সমতুল্য মানুষগুলো যে ভূত-প্রেত বনে ঠাহর করা যায় নিঃসন্দেহে, এর জন্য অনেকেই বনাঞ্চল নিধনকে দায়ী করে যা যুক্তিসঙ্গত স্বীকৃত। আফ্রিকার একযুগের খরা যদি সমস্ত পৃথিবীতে খরার সৃষ্টি করে দেয়, কিংবা প্রকৃতির অন্যরকম পরিবর্তন যা মানবকুলকে বিনষ্ট করবে একে রুখবার মতো বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কী হয়েছে? জীবন-পরিবেশের যে কোনো একটি উদ্ভিদকুলের এক্ষেত্রে সম্ভাবনা বেশি, আর উদ্ভিদকুলের ধ্বংস সাধন সকল জীবনের বিনাশ সাধন– এ মহাসত্যতে সবারই গুরত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

প্রকৃতি কি বৈজ্ঞানিকভাবে অগ্রসর দেশগুলোকে বিপর্যয় থেকে রক্ষার সুবিধা দেবে? বিজ্ঞানের অতি অগ্রসরতাকে ব্যবহার করে তারা নিজ দেশের অবকাঠামো নির্মাণ করলেও প্রকৃতি বড়ই নির্মম। সমগ্র বিশ্ব পরিবেশকে লণ্ড-ভণ্ড করে দিয়ে একরূপ বিপদ পৃথিবীর সর্বত্র সৃষ্টি করে দিলে সব হিসাব নিকাশের যবনিকা ঘটবে। সময় থাকতে সাধু সাবধান॥

[লেখক: কৃষক। হালখাতার পাঠক ও বিক্রয় প্রতিনিধি, পাকের হাট, রানী বাজার, দিনাজপুর।]

বিশ্বজলবায়ুর পরিবর্তন: বিপর্যয়ের মুখে কৃষিব্যবস্থা

নূরুর রহমান

অধিক মুনাফার জন্য লোভী পুঁজিপতিরা পরিবেশের ক্ষতির চিন্তা না করে, অপরিকল্পিতভাবে নগরায়নের বিস্তার ঘটাচ্ছে, গাছ-পালা কেটে বন-জঙ্গল ধ্বংস করছে, ধ্বংস করছে প্রাণীকুলের আবাসস্থল। অপরিকল্পিতভাবে কল-কারখানা নির্মাণ করছে। উন্নয়নের নামে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে জ্বালানি হিসেবে পোড়ানো হচ্ছে কাঠ, খনিজ তেল, গ্যাস ও কয়লা। কলকারখানার ধোঁয়া, তেল-গ্যাস-কয়লা প্রভৃতি

পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট ধোঁয়া ও প্রাণীকুলের নিঃশ্বাস থেকে বায়ুমণ্ডলে নির্গত হচ্ছে ক্ষতিকর কার্বন গ্যাস। এই কার্বন গ্যাসের রয়েছে প্রচুর পরিমাণ তাপ শোষণ ও ধারণ করার ক্ষমতা। এই গ্যাসের অতিরিক্ত তাপ শোষণ করার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়ছে। ফলে নষ্ট হচ্ছে প্রকৃতির ভারসাম্য। গাছ এই কার্বন গ্যাস শোষণ করে, এ কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বাড়তে পারে না, প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় থাকে।

কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে গাছ কেটে বন-জঙ্গল ধ্বংস করার কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বন গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে, ফলে বাড়ছে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ুর ভারসাম্য বিনষ্ট হয়ে তার পরিবর্তন ঘটছে; ফলে ঐ অঞ্চলের ঋতুচক্রের পরিবর্তনসহ অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, তীব্রশীত, প্রচণ্ড গরম, খরা, বন্যা, ভূমিক্ষয়, জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটছে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত দেশগুলো। বাংলাদেশ এরকমই একটি দেশ। জলবায়ুর পরিবর্তনে বিপর্যস্ত হচ্ছে আমাদের কৃষিব্যবস্থা ও জীবিকার কারণে এর ওপর নির্ভরশীল কৃষক জনগণ। কারণ আমাদের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেকাংশেই প্রকৃতিনির্ভর। নিম্নলিখিত আলোচনা দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হবে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ

বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যদি আর ২ ডিগ্রি বেড়ে যায় তবে আমাদের ছয় ঋতু থেকে হেমন্ত আর বসন্ত চিরতরে হারিয়ে যাবে। এখনই এই দুটি ঋতুর অস্তিত্ব প্রায় বোঝা যায় না। ফুল ফোটার সময় তাপমাত্রা যদি ৩৫ ডিগ্রি বেশি হয় তবে ধানে চিটা বাড়বে। তাপমাত্রা বাড়লে উফশি ধানের ফলন কমে যাবে, গম গাছ রোগাক্রান্ত হবে। তাপমাত্রা যদি আর ২ ডিগ্রি বেড়ে যায় তবে গম চাষ সম্ভব হবে না। ধানে প্রোটিনের পরিমাণ কমে যাবে এবং নাইট্রোজেন কম গ্রহণ করবে। ধানের ছত্রাক রোগ দেখা দেবে, নতুন নতুন রোগ-বালাইয়ের বিস্তার হবে, পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়বে। গাছ প্রচুর পানি গ্রহণ করবে, এতে ভূ-গর্ভে পানির পরিমাণ কমে যাবে ফলে প্রচুর সেচের দরকার হবে। এই সব কারণে ইতিমধ্যেই চাষাবাদের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাপমাত্রা কমে গেলে ফসলের বৃদ্ধি ব্যাহত হবে, ধান গাছ হলুদ হয়ে যাবে, চারা দুর্বল হবে। ফসলের জীবনকাল বেড়ে যাবে। ফলে দেরিতে ফসল উঠবে। এ বৎসরই প্রচণ্ড শীতে বোরো ধানের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

অনাবৃষ্টি ও খরার প্রভাবঃ

দেশে নিয়মিতভাবে বছরে ৪০ লাখ হেক্টর জমি খরায় আক্রান্ত হচ্ছে এবং প্রতি বছর এর পরিমাণ বাড়ছে। মে-জুন মাসের খরা আমন, আউশ ও পাট চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আগস্টের অল্প-বৃষ্টি রোপা আমন চাষকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের অল্প-বৃষ্টি আলু প্রভৃতির চাষকে দেরি করিয়ে দেয়। কাঁঠাল, লিচু, কলা,

খরার কারণে মারা যায়। এই সময়ে বৃষ্টিতে দেশের খাল, বিল, নদী, নালা, ডোবা, পুকুর পানিতে থৈ থৈ করত, অথচ আজ অল্প-বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণে শুধুই খরা।

এ বছর প্রচণ্ড খরার কারণে উত্তরাঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এত বেশি নিচে নেমে যায় যে টিউবওয়েল ও পাম্প দিয়ে পানি তোলা যায়নি ফলে লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ সম্ভব হয়নি। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অনেক জেলাতেও একই দৃশ্য দেখা গেছে।

এদেশের কৃষক খরার সাথে ভালোভাবেই পরিচিত, তাই নতুন করে আর কিছু বলার নেই।

অতিবৃষ্টি ও বন্যার প্রভাবঃ

প্রতি বছরই দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে বন্যা হচ্ছে। স্বাভাবিক বন্যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর নয় কিন্তু হঠাৎ করে অতিবৃষ্টি ও তা থেকে সৃষ্ট বন্যা ক্ষতিকর। এ বছর সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে পাহাড়ি ঢল থেকে সৃষ্ট হঠাৎ বন্যায় বাঁধ ভেঙে কয়েক লক্ষ হেক্টর জমির ধান ও অন্যান্য ফসল তলিয়ে গেছে। বন্যা উঠতি ও পাকা ফসলের জন্য যে কী ধ্বংসাত্মক হতে পারে কৃষক তার সাথে ভালোভাবেই পরিচিত।

জমির উর্বরতা হ্রাসঃ

তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ছে। ফলে সৃষ্ট বন্যায় আবাদি জমি লবণাক্ত হয়ে উর্বরতা হারাচ্ছে। আবার বৃষ্টি কম হলে মাটির নিচের লবণাক্ত পানি উপরে উঠে এসে জমির উর্বরতা নষ্ট করছে। তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি বাড়লে সমুদ্রের পানির উচ্চতা ১ মিটার বাড়বে ফলে দেশের ২০% জমি চিরতরে ডুবে যাবে ও লক্ষ লক্ষ হেক্টর জমি লবণাক্ত হবে। বর্তমানে প্রায় ৩০ লাখ হেক্টর জমি স্থায়ীভাবে লবণাক্ততায় আক্রান্ত হয়েছে।

কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণী সেই অঞ্চলের জলবায়ুর সাথে দীর্ঘদিনের খাপ খেয়ে বেঁচে থাকে। তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটলে ঐ সকল উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব হারিয়ে যেতে পারে। যেমন: মরুভূমিতে ক্যাকটাস গাছ ও উট বাঁচতে পারে। সেই বিরূপ পরিবেশে টিকে থাকার ক্ষমতা বিবর্তনের মাধ্যমে তারা অর্জন করে কিন্তু সেখানে আম-কাঁঠাল গাছ লাগালে বা গরু-ছাগল নিয়ে গেলে তারা বাঁচবে না, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত পরিবেশে অনেক ফসলের চাষ সম্ভব হবে না বা সেগুলো চিরকালের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পরবর্তীতে কৃষিতে এর প্রভাব বাড়বে সরাসরি ও দীর্ঘমেয়াদি। এই সকল কারণে কৃষককে জমিতে প্রচুর পরিমাণ সার, কীটনাশক ও সেচ দিতে হবে ফলে চাষাবাদ ব্যয়বহুল হবে। কৃষক চাষে আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে বা সমর্থ থাকবে না।

জলবায়ুর এই পরিবর্তনের জন্য দায়ী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা। কারণ তারা মুনাফার জন্য পরিবেশ দূষণ ঘটাচ্ছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার জন্য তাদের

ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গরিব দেশগুলোর সাধারণ জনগণ বিশেষত কৃষক জনগণ কারণ তারা জীবন ধারণের জন্য কৃষি ও জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল।

পুঁজিবাদী দেশগুলো কার্বন গ্যাস কমানোর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না বরং এটা অব্যাহত রেখে তারা পরামর্শ দিচ্ছে পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে খাপ খেয়ে চলার। পুঁজিবাদীরা আজ পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাদের হাতে জলবায়ুর পরিবর্তন রোধ করার কোনো কার্যকর সমাধান নেই কারণ এটা করতে হলে, দূষণ ও ধোঁয়া সৃষ্টিকারী লক্ষ লক্ষ কল-কারখানা বন্ধ করতে হবে। বন-জঙ্গল ধ্বংস করা রোধ করতে হবে। কাঠ-কয়লা-তেল-গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। কিন্তু এটা তাদের জন্য সম্ভব নয় কারণ এতে তাদের মুনাফা কমে যাবে।

একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষেই এই বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব কারণ তারা মুনাফার জন্য প্রকৃতিকে ধ্বংস করে না। মানবজাতির অস্তিত্বকে হুমকির মুখে দাঁড় করায় না। প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ ধ্বংসকারী পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের জন্যই তারা সংগ্রাম করে। তারা সংগ্রাম করে একটি সবুজ পৃথিবীর জন্য।

কৃষিব্যবস্থাটাকে রক্ষা করা ও নিজে বাঁচার জন্য কৃষককেও এই পুঁজিবাদী সম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। এ জন্য অবশ্যই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। এর কোনো বিকল্প পথ নেই। অন্যথায় এ পৃথিবীকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না।

প্রগতিশীল মধ্যবিত্তেরা পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন করছে। এ জন্য তারা যে সব কর্মসূচি নিয়ে আসছে তা হাতুড়ে চিকিৎসার মতো বা সংস্কারবাদী, চূড়ান্ত কোনো সমাধান নয়। চূড়ান্ত সমাধান হল লোভ আর মুনাফার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাকে ধ্বংস করা। তারা এ-কথা বুঝতে অক্ষম যে, বিদ্যমান ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস না করে বা শ্রেণীসংগ্রামের অধীনস্থ না করে বিচ্ছিন্নভাবে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন সফল হতে পারে না।

অদৃষ্টবাদী বা বিশ্বাসীদেরও এটা বোঝার সময় হয়েছে যে, পরিবেশ বিপর্যয় বা খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এসব সৃষ্টিকর্তার অভিশাপ নয়। সম্পূর্ণ মনুষ্য-সৃষ্ট কারণ। এজন্য এটা প্রতিরোধ করা ও থামানো সম্ভব। এখনও সময় আছে সেই নতুন পৃথিবী গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার।

[লেখক: সংগঠক। সংবাদ কর্মী, দৈনিক ভোরের কাগজ।]